বাংলা সাহিত্যে
লঘুনাট্যের ধারা

আমাদের প্রকাশিত রবীন্দ্র-অর্ঘ্য

—:০:—

ডঃ শ্রীক্ষুদিরাম দাশ প্রণীত

প্রগতি-পথিক রবীন্দ্রনাথ

● ●

ডঃ শ্রীবৈদ্যনাথ শীল প্রণীত

রবীন্দ্রকাব্যে নারী

● ●

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী প্রণীত

রবির আলো

প্রভাত রবি

রবীন্দ্র-জীবন-প্রভাত

রবি-কথিকা

বাংলা সাহিত্যে

লঘুনাট্যের ধারা

অধ্যাপক

শ্রীবৈদ্যনাথ শীল

এম. এ., ডি. ফিল্

ইউ. এন. ধর অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীযামিনীভূষণ উকিল
দি মুকুল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৭এ, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

পরম পূজ্যপাদ

অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী

শ্রীচরণেষু—

প্রতিষ্ঠা চাও নি তুমি, প্রতিষ্ঠাই চেয়েছে তোমায়।
মাতৃভাষা-অধ্যাপনা মহনীয়া তোমার চেষ্টায়।
শিক্ষাব্রত নিয়েছিলে অর্থ-যশ-মান উপেক্ষিয়া,
যশের মন্দিরে তাই আরাত্রিক তোমারে ঘিরিয়া।

আচরণসিদ্ধ তুমি, শিক্ষাচার্য, প্রকৃত ব্রাহ্মণ,
শুধু জ্ঞান দান করি গড়ো নাই ছাত্রের জীবন;
পুত্রবৎ স্নেহধন্য, মোরা সব তোমারি সন্তান,
তোমারি চরিত্রাদর্শে শিক্ষাব্রত করেছি গ্রহণ।

পঙ্কিল, কুটিল, হীন স্বার্থক্ষুব্ধ জগতের মাঝে
কেমনে চলিতে হয় দৃঢ়চিত্তে আপনার কাজে,
তুমিই শিখালে তাহা। দুর্বলতা, ক্রোধ, লোভ, ভয়,
তোমার চরিত্রে, গুরু, কোনো দিন পায়নি আশ্রয়।

কর্তব্যকঠোর মূর্তি কী মধুর বিনয়-কোমল,
ভর্ৎসনা-ভ্রূকুটিপূর্ণ চক্ষু কত স্নেহসমুজ্জ্বল,
বেদনাব্যথিত চিত্ত আচ্ছাদিত প্রশান্ত হাসিতে,
একাধারে তব মাঝে নিত্য মোরা পেয়েছি দেখিতে।

আমি দীন শিষ্য তব, অন্য কিছু নাহি তো সম্বল,—
আনিয়াছি ভক্তি আর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অশ্রুজল।
জনচিত্তরাজ্যজয়ী চক্রবর্তী তুমি, জনার্দন,
এই ক্ষুদ্র অর্ঘ্যাঞ্জলি তব পদে করিনু অর্পণ।

শ্রীবৈদ্যনাথ শীল

লেখকের নিবেদন

'বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা' গ্রন্থখানি আমার 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' গ্রন্থের পরিপূরক। বাংলা সাহিত্যে, 'সিরিয়াস্' নাটকের (ট্রাজেডী ও কমেডীর) বিবর্তন কি ভাবে হইল, তাহারই ধারাবাহিক আলোচনা আমি উক্ত গ্রন্থে করিয়াছিলাম। প্রসঙ্গতঃ কমেডী ও প্রহসনের কিছু কিছু আলোচনা আমি উক্ত গ্রন্থে করিলেও বাংলা সাহিত্যে কমেডী-প্রহসনের ধারা লইয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আলোচনা করিবার বাসনা মনে মনে পোষণ করিতাম। বর্তমান গ্রন্থে সেই ইচ্ছাটির রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছি। এখানে একটি আপত্তি উঠিতে পারে এই বলিয়া যে, লঘুনাট্যের ধারা বলিতে শুধু হাল্‌কা কমেডী ও প্রহসন বুঝাইবে কেন? এক শ্রেণীর গীতিনাট্যও এই লঘুনাট্যের ধারার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। সেকথা সত্য।

বাংলা সাহিত্যে গীতিনাট্যেরও একটি বিশেষ ধারা রহিয়াছে। বাংলা যাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য পর্যন্ত এই ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নাট্য ও গীতিনাট্যাদির সম্বন্ধে একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করিবার বাসনা রহিয়াছে। ঐ প্রসঙ্গে এই গীতিনাট্যের ধারাটির আলোচনা করিব। প্রহসন-কমেডীর বিবর্তনে এই গীতিনাট্য এবং গীতাভিনয়ের আলোচনা একান্ত অপরিহার্য নহে। আমার বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়বস্তু বাংলা নাট্য-সাহিত্যে কমেডী ও প্রহসনের ধারা-নির্ণয়। সুতরাং গ্রন্থের নামসংজ্ঞাটিকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ না করিতে অনুরোধ করি।

আলোচনাটিকে আমি কয়েকটি বিশেষ অধ্যায়ে ভাগ করিয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে আমি কমেডী ও ট্রাজেডীর জীবনধর্ম বা জীবনবোধের পার্থক্য নির্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ, ইংরেজ সমালোচক মেরিডিথ, পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ম্যাক্‌ডুগাল এবং প্রাচ্যদেশের মহামনীষী কবিসমালোচক রবীন্দ্রনাথের মতবাদ আলোচনা করিয়াছি। এই অধ্যায়ে আমি যে বিশেষ কথাটি বলিতে চেষ্টা করিয়াছি, তাহা হইল এই যে, হাস্যরসের উৎপত্তি ও গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে ইউরোপীয় দার্শনিক, সমালোচক ও সাহিত্যিকবর্গ যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহা ভারতীয় মনীষীদের নিকটও আদৌ অপরিজ্ঞাত ছিল না। সংস্কৃত নাট্যকার ও প্রহসন-রচয়িতৃগণ সেই মৌলিক নীতিগুলির অপূর্ব প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বাংলা প্রহসন কমেডীর উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে যে সংস্কৃত

প্রহসন কমেডীর আলোচনা অপরিহার্য হইয়া উঠে, একথা আমি বেশ জোর দিয়াই বলিয়াছি। আমার বিবেচনায় সংস্কৃত কমেডী প্রহসনগুলির যতখানি গভীর আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, দেশীবিদেশী কোনো মনীষীর দ্বারা তাহা হয় নাই। বরং দুঃখের বিষয়, উহা উপেক্ষিত হইয়াছে অনেকখানি। প্রথম অধ্যায়ে তাই 'লটকমেলকম্', 'হাস্যার্ণবম্', 'ভগবদজ্জুকীয়ম্', 'মত্তবিলাসম্' প্রভৃতি কয়েকখানি প্রহসনের পর্যাপ্ত আলোচনা আমাকে করিতে হইয়াছে। উহাদের মধ্যকার সমাজদৃষ্টি ও জীবনদৃষ্টি-সম্বন্ধে তাই যথাসাধ্য আলোকপাত করিয়া আমাকে দেখাইতে হইয়াছে, আবহমানকাল হইতে মানুষের জীবনবোধ ও রসবোধের নিবিড় ঐক্য কি বা কোথায় এবং যুগবিবর্তনের ফলে পার্থক্য বা হয় কতটুকু। আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে প্লটাস্, টেরেন্স্, শেক্স্পীয়ার, মলিয়ারের মধ্য দিয়া হাস্যরস-সৃষ্টির যে বিবর্তন হইয়াছিল, কালিদাস-শূদ্রক-মহেন্দ্রবিক্রম-বোধায়নকবি-শঙ্খধরের মধ্যে সেই একই প্রেরণার রূপায়ণ ও বিবর্তন হইতেছিল। দেশ-কাল পাত্রভেদে তাহার প্রকাশভঙ্গী ও অবলম্বনের পার্থক্য থাকিলেও জীবনবোধে নিবিড় ঐক্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

ইউরোপীয় ও ভারতীয় জীবনধর্ম এবং সমাজনীতির মধ্যে অবশ্য যে নিগূঢ় পার্থক্যটুকু রহিয়াছে, তাহার জন্য সংস্কৃত কমেডী প্রহসন ও ইউরোপীয় কমেডী-প্রহসনের রচনায় পার্থক্য হইয়াছে অনেকখানি। উভয় দেশীয় সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আমি কথাটি স্পষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমি বলিয়াছি, শেক্স্পীয়ার ও কালিদাস উভয়ের শৈলী ও জীবনবোধ উন্নত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ হইলেও উহাদের মধ্যে দেশকালগত পার্থক্য অনিবার্য। কমেডীর উপজীব্য যে প্রেম, সেই প্রেমের গতি-প্রকৃতি-সম্বন্ধে ভারতীয় ও ইউরোপীয় ধারণা-ভাবনা অনেকখানি পৃথক থাকায় জন্য শকুন্তলা, মৃচ্ছকটিক এবং As you like it, Twelfth Night প্রভৃতিরও শৈলীগত এবং ভাবগত পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে।

বাংলা প্রহসন-কমেডী সাহিত্যে শেক্স্পীয়ার ও কালিদাসাদির প্রভাব চরম না হইয়া ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারের প্রভাব কেন বেশি করিয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ নির্দেশ করিতেও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। মলিয়ারের সঙ্গে বোধায়ন কবি ও মহেন্দ্র বর্মার জীবনদৃষ্টির মিল কেন এবং কতখানি, তাহার কারণও আমি নির্দেশ করিয়াছি। মলিয়ার গণজীবনের প্রতিনিধি। তিনি একদিকে যেমন সমাজের উচ্চ ও অভিজাতগণের আচরণের দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতা উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তেমনি সমাজের অবরগণ

যখন অভিজাতদের বহিরঙ্গ আচার-আচরণের অনুকরণ করিয়া ময়ূরপুচ্ছধারী কাক সাজিতে চেষ্টা করিয়াছে, তখনও তাহাদিগকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। মলিয়ার সমাজে সাম্য, শৃঙ্খলা এবং স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে চাহিয়াছিলেন। জাতীয়জীবন যখন কৃত্রিমতা ও অন্ধ অনুকরণের মোহে আচ্ছন্ন হয়, যখন ধীরে ধীরে সমাজ-জীবন ও ব্যষ্টি-জীবন হইতে সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ অবলুপ্ত হইয়া জাতীয়-জীবন ভণ্ডামি ও কপটাচারে ভরিয়া যায়, তখন সমাজের অভ্যন্তরে তাহার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বুদ্ধিমান সাহিত্যিক ও শিল্পিগণ তখনই ব্যঙ্গ-রচনার মধ্য দিয়া সমাজের স্বাস্থ্য ও সুবুদ্ধি ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করেন। তখন শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবনের অসঙ্গতি, দুর্বলতাই সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, সাহিত্যিকগণও তখন ঐ ব্যক্তিকে দেখেন সমাজের প্রতিনিধিরূপে। 'মত্তবিলাসম্' প্রহসনের কাপালিক এবং 'টার্টুফ' নাটকের টার্টুফ (Tartuffe) তাই একই ধরণের জীবনবোধ ও সমাজচেতনা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শেকস্‌পীয়ারের ফলষ্টাফ্ (Falstuff) ও ম্যালভোলিও (Malvolio) তাহাদের ব্যক্তিজীবন দ্বারা আমাদের দৃষ্টি যতখানি আকর্ষণ করে, ঠিক ততখানি মাত্রায় তাহারা সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণীর চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে না। কিন্তু মলিয়ারের সৃষ্ট চরিত্রগুলি ব্যক্তিজীবনের এক একটি বিশিষ্ট চিত্র হইয়াও সমাজের এক একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে। 'লটকমেলকম্' এবং 'ধূর্তসমাগমম্' নাটকের চরিত্রগুলিও এই একই স্তরের। মলিয়ারের নাটকগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, একটি বিশেষ যুগের ভাঙাগড়ার বা যুগপরিবর্তনের দ্বন্দ্বীভূত ইতিহাস তাহার মধ্যে ধরা পড়িয়াছে। অতীতের কুসংস্কার যেমন মানুষ অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, তেমনি এক ধরনের উগ্র আধুনিকতাপন্থী সভ্যতা ও প্রগতির নামে যাহা অবলম্বন করিতেছিল, তাহাও এক রকম অন্ধত্ব ও কুসংস্কারের নামান্তর। মলিয়ার এই দুই উৎক্রান্তিচরদের জীবনে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। মলিয়ারের নিকট 'Nature is an ordered and rhythmic assemblage of good and evil forces, and in the society of his day Moliere seemed to see an admirable reflection of this cosmic harmony.' [Moliere Comedies, Introduction by F. C. Green, pp. XVI—XVII.] এই বিশ্বজাগতিক সঙ্গতির যেখানে যেখানে ব্যত্যয় দেখা গিয়াছে, মলিয়ার সেইখানেই ব্যঙ্গের অস্ত্রোপচার করিয়া সমাজকে সুস্থ করিয়াছেন। বাংলা

সাহিত্যে প্রহসনের যখন সত্যকার জন্ম হইল, তখন বাংলার জাতীয়জীবনেও দেখা দিল একটি বিরাট পরিবর্তনের যুগ। ইংরেজী সাহিত্য ও সভ্যতার আগমনে বাংলার জাতীয় জীবনে প্রবল দ্বন্দ্বময় প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। পুরাতন বোধবিশ্বাসে একদিকে যখন জীর্ণতা ও মৃত্যুর লক্ষণ প্রকট হইয়া উঠিল, ঠিক সেই সময়েই ইংরেজী সাহিত্য ও সভ্যতা তাহার ঔজ্জ্বল্যময় সম্ভাবনা লইয়া বাঙালীর চক্ষু ঝল্সাইয়া দিল। এই যুগসন্ধিক্ষণে একদিকে নূতন জীবনবোধ গড়িয়া উঠাও যেমন স্বাভাবিক হইল, তেমনি প্রাচীনতার ও আধুনিকতার যুগপৎ অন্ধ অনুকরণ এবং অনুসরণও মানব-চরিত্রের এক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যরূপে দেখা দিল। এই উৎক্রান্তির যুগে সমাজে, জাতীয় জীবনে, অর্থাৎ ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনে ভারসাম্য-আনয়নের জন্য শক্তিমান সাহিত্যিকদের আবির্ভাব অনিবার্য হইয়া উঠিল। এই সকল সাহিত্যিকদের পক্ষে যুগপ্রয়োজনে মলিয়ারীয় দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু প্রত্যক্ষভাবে মলিয়ারের অনুকরণ এবং অনুসরণ না করিলেও ভাবের দিক দিয়া তাঁহারা ছিলেন মলিয়ারের অনুপন্থী বা সগোত্র। রামনারায়ণ 'লটকমেলকম্', 'ধূর্তসমাগমম্' প্রভৃতি সংস্কৃত প্রহসনের শৈলীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও ঐ ধরণের সংস্কৃত প্রহসন যে শেষ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না, তাহার কারণ, মলিয়ারের নাটকে সংলাপের যে সূক্ষ্ম চাতুর্য, ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-সৃষ্টির যে জটিলতা এবং বাস্তবানুগামিতা ছিল, ঐ সকল সংস্কৃত প্রহসনে তাহা সেইভাবে ছিল না। বাংলা সাহিত্যে মলিয়ারের অনুকরণের এইটিই প্রধান কারণ নয় যে, যাঁহারা বাংলা প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যের অপেক্ষা ইংরেজী-ফরাসী-সাহিত্যের সঙ্গে অধিক পরিচিত ছিলেন। বাংলার উনবিংশ শতকের যুগপ্রেরণার মধ্যে মলিয়ার স্বীয় আন্তরধর্মে সমপ্রাণ সখার আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। ইহাই মলিয়ারের অনুকরণের প্রধান কারণ।

কেমন করিয়া অনুবাদ ও অনুকরণের মধ্য দিয়া মলিয়ারীয় নাট্যাদর্শ বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা পাইতেছিল, তৃতীয় অধ্যায়ে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথই প্রকৃত পক্ষে বাংলা সাহিত্যে মলিয়ারীয় ভঙ্গির বুদ্ধিপ্রধানব্যঙ্গমূলক প্রহসনের রচয়িতা। অমৃতলালে এই ধারার পরিণতি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও অমৃতলালের রচনার মূল্যায়নে সমালোচকেরা একমত

নহেন। আমিও কাহারও কাহারও সঙ্গে একমত হইতে পারি নাই। আমি মনে করি, রসরাজ অমৃতলাল বসু বাংলা সাহিত্যে একজন মৌলিক প্রতিভা-সম্পন্ন জীবন-দ্রষ্টা ও সাহিত্য-স্রষ্টা। গ্রন্থ-মধ্যে আমার এই মন্তব্যকে যথাযোগ্য যুক্তিপ্রমাণ-সহযোগে আমি উপস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার গণতান্ত্রিক অধিকার সকলেরই আছে। আমি সেই অধিকারের আশ্রয় লইলেও ব্যক্তিগত বিশেষ কোনো সংস্কারের বশবর্তী হইয়া সে অধিকারের অবমাননা করি নাই। সমালোচনা যাহাতে নিছক স্তুতি বা নিন্দার সমষ্টি না হইয়া ভালমন্দ-দোষগুণের সম্যক আলোচনা হয়, সেদিকে যথাসাধ্য দৃষ্টি রাখিয়াছি।

অমৃতলালের পরবর্তী কয়েকজন নাট্যকারের রচনার আলোচনাও করিয়াছি। ইঁহারা নিজ নিজ রচনার দ্বারা বাংলা সাহিত্যে কোনো যুগসৃষ্টি করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু ইঁহাদের কাহারও কাহারও রচনার প্রতি পাঠক ও সমালোচকবর্গের প্রীতি ও মমতা আছে। তাই আলোচনা করিতে হইল।

গিরিশচন্দ্রের নাটকের হাস্যরস, বিশেষতঃ বিদূষকচরিত্রের মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কারণ, গিরিশচন্দ্রের বিদূষকজাতীয় চরিত্র বাংলা সাহিত্যের এক অভিনব সৃষ্টি ; বাংলা যাত্রা-সাহিত্যের সঙ্গে এবং সংস্কৃত-সাহিত্যের সহিত উহার নাড়ীর যোগ রহিয়াছে। সেই যোগসূত্রটি আমি যথাসাধ্য পরিষ্কার করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

নরনারীর প্রেম শাশ্বত ও অনন্ত। প্রেম অনেক সময়ে সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি বা অন্যান্য নীতির বন্ধন অস্বীকার করিয়া নিজের মধ্যে নিজে দুরন্ত, দুর্বার হইয়া উঠে। ইহার জন্য যুগে যুগে বিয়োগান্ত নাটক যেমন রচিত হইয়াছে, তেমনি প্রেমৈকসর্বস্ব রোমান্টিক কমেডীরও সৃষ্টি হইয়াছে। বাংলার নাট্যকারগণ প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক্ কমেডীর ভাণ্ডার হাতের কাছে পাইয়াও তাহার প্রভাবে বা আদর্শে বাংলার রোমান্টিক কমেডীর একটি বিশেষ শক্তিশালী ধারা সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেন না কেন, ইহা নিশ্চয়ই কৌতূহলী জিজ্ঞাসার বস্তু হইবে। শেক্স্পীয়ার বা কালিদাস কাহারও ধারাবাহিক অনুসরণ বাংলা কমেডী রচনায় হয় নাই, যেমন হইয়াছে মলিয়ারের। মধুসূদনের 'পদ্মাবতী', দীনবন্ধুর 'নবীনতপস্বিনী', 'লীলাবতী' প্রভৃতিকে কেহই কালিদাসীয় বা শেক্স্পীয়রীয় রোমান্টিক কমেডী বলিয়া স্বীকার করিবেন না। এমন কি গিরিশচন্দ্রের 'মুকুল-মঞ্জরা'কেও নয়।

বাংলা সাহিত্যে যে একধরণের প্রেমৈকসর্বস্ব রোমান্টিক নাটক রচিত হইতেছিল না, তাহা নয়। নবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিচিত্রবিচার নাটক', মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিচিত্র মিলন' নাটক প্রভৃতির মধ্যে রোমান্টিক উপকথা-অবলম্বনে হাসি ও আনন্দ মিশ্রিত লঘুনাট্য-রচনার যে ধারা লক্ষ্য করা যায়, তাহারই সর্বোত্তম পরিণতি দেখিতে পাই ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা', 'বরুণা' প্রভৃতি নাটকে। অতুলকৃষ্ণ মিত্র, রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও ক্ষীরোদপ্রসাদের রচনার মধ্য দিয়া এই শাখার একটা ক্রমবিকাশের সূত্র আবিষ্কার করা যায় সত্য, কিন্তু তাহা রোমান্টিক কমেডীর ধারা না হইয়া উপকথাসম্বল গীতিনাট্যের ধারাই হইবে। শেক্‌স্‌পীরীয় ও কালিদাসীয় রোমান্টিক নাট্যশৈলীর সগোত্র, তাহা মোটেই নয়। ইহার একটা বড় কারণ আমার মনে হয় বাংলার কমেডী-প্রহসন-রচনার মূলে ছিল সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনবোধ। উনবিংশ শতকের বাঙালী নাট্যকারগণ এই প্রয়োজনবোধকে ব্রতহিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহাদের দৃষ্টি সাধারণতঃ পড়িয়াছিল মলিয়ারীয় ভঙ্গীর সংস্কারমূলক নাটক-রচনায়। এই প্রচেষ্টার ফলে একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্য নাটক-প্রহসনের নামে রাশি রাশি প্রচারাত্মক রচনায় ছাইয়া গিয়াছিল, তেমনি উহার মধ্যেই দুই-চারিজন শক্তিমান নাট্যকারের রচনা বাংলা সাহিত্যে কালজয়ী হইয়া রহিয়াছে এবং বাংলা প্রহসন-কমেডীর মূলধারার নির্দেশ করিতেছে। ঠিক এমনি ধরণের ধারাবাহিক ভাবে রোমান্টিক কমেডী বাংলা সাহিত্যে রচিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথের 'বশীকরণ', রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল', জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক' একজাতীয় শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কমেডীর নিদর্শন হইলেও ইহারা কোন বিশেষ ধারার ক্রমবিকাশের নির্দেশ করে না। তাই বর্তমান প্রবন্ধে রোমান্টিক কমেডীর ধারা অনুসরণের চেষ্টা করি নাই

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমৃতলাল বসু উভয়েই যখন প্রহসন রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতিভার দান যখনও নিঃশেষ হয় নাই, তখন হইতেই রবীন্দ্রনাথ স্বীয় প্রতিভার বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রহসন-কমেডী-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। [রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২ খৃষ্টাব্দে), চিরকুমার সভা (১৯০৪); জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬); অমৃতলালের 'খাসদখল' (১৯১২)।] কিন্তু কাব্যের ন্যায় নাটকেও রবীন্দ্রপ্রতিভা একক। তাঁহার অনুসারী নাট্যকার-গোষ্ঠী রচিত হয় নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত কমেডী-প্রহসনের ধারা বলিয়া বাংলা সাহিত্যে কিছু নাই।

রামনারায়ণ-মধু-দীনবন্ধুর যুগ হইতে অমৃতলাল পর্যন্ত বাংলা কমেডী-প্রহসনের যে বিশিষ্ট ধারা চলিয়া আসিতেছিল, বাংলার নিজস্ব জাতীয়তাবোধ এবং সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি তাহার মধ্যে প্রধানভাবে কাজ করিয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ বিশ্বের দূর-দুরান্তের দেশগুলির ব্যবধানই দূরীভূত করে নাই, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বর্তমান যুগের অর্থ-রাজনীতি-প্রভাবিত সমাজ-নৈতিক জীবনেও রূপান্তর আনয়ন করিয়াছে। কোন দেশই আজ আর যেমন একান্ত করিয়া আপন দেশ ও জাতির কথা ভাবিতে পারিতেছে না, তেমনি বিশ্বমানবতার সম্মুখে আজ সমূহ সঙ্কট এবং অস্থির স্নায়ুযুদ্ধ দেখা দিয়াছে। 'কোথা যাত্রী কোথা পথ কোথায় রে দিশা' বলিয়া সমস্ত জগৎ আজ পর্যাকুল। ফ্রয়েডীয় এবং মার্ক্সীয় মতবাদ চিন্তার জগতে ও সমাজজীবনে প্রবল প্রতিক্রিয়া সুরু করিয়াছে। এই দ্বন্দ্বীভূত যুগসমস্যা শুধু কবিতাকেই পাইয়া বসে নাই, নাটক-প্রহসনকেও অধিকার করিয়াছে। ইউরোপখণ্ডে এই ভাবধারা-সঞ্জাত যে সাহিত্য সৃষ্টি হইতেছে তাহার প্রভাব হইতে বাংলা সাহিত্যও আজ মুক্ত নহে। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়ায় বাংলা দেশে যে নাটক-প্রহসনাবলী রচিত হইতেছে তাহার বিশেষ কোনো ধারা নির্ণয় করা এখন সম্ভব নয়। এই কারণে বাংলা প্রহসন-সাহিত্যের ক্রমবিকাশে ইব্‌সেন্‌-বার্নার্ড্‌ শ'র প্রভাব কতখানি, সে আলোচনার মধ্যে আমি প্রবেশ করি নাই। এখন এই ধারা-সম্বন্ধে ভালমন্দ কোন কথা বলাই উচিত হইবে না বলিয়া রামনারায়ণ হইতে অমৃতলাল পর্যন্ত যে ধারা চলিয়া আসিয়াছে, তাহারই যথাসাধ্য আলোচনা করিয়া বর্তমান গ্রন্থ শেষ করিলাম।

গ্রন্থখানির রচনার প্রেরণা আসিয়াছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন, এম্‌-এ, পি-এচ্‌-ডি মহাশয়ের নিকট হইতে। তাঁহার নির্দেশ ও উপদেশাবলী বর্তমান গবেষণার প্রধান সহায়ক। বহু ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি ধৈর্য সহকারে গ্রন্থখানির পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাকে আমার সভক্তি প্রণাম জানাই।

আমার পরমবন্ধু শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ধর মহাশয় অতি যত্ন-সহকারে গ্রন্থখানির প্রকাশনে ও মুদ্রণে নানাভাবে সহায়তা করিয়া আমায় চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

গ্রন্থখানি 'Evolution of Light Drama in Bengali' নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৬২ সালে D. Phil (Arts) ডিগ্রির জন্য অনুমোদিত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেন, এম্‌-এ,

পি-এইচ্.-ডি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার কবি শ্রীঅজিত দত্ত মহাশয় এবং শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই গবেষণা-গ্রন্থের পরীক্ষক ছিলেন। তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইতেছি।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের গবেষণা-সম্বলিত গ্রন্থ অনেকই রচিত হইয়াছে এবং হইবে। আমার এই গ্রন্থখানি যদি সেই ধারা এতটুকুও পুষ্ট করে, তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

পরিশেষে নিবেদন জানাইতেছি, গ্রন্থখানির দোষত্রুটি-দীনতা-অপূর্ণতা সম্বন্ধে সহৃদয় পাঠকবর্গ দয়া করিয়া গ্রন্থকারকে সজাগ করিয়া দিলে পরবর্তী সংস্করণে তাঁহাদের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে গ্রন্থখানি পরিমার্জিত, পরিশোধিত বা পরিবর্তিত করিতে চেষ্টা করিব। নিবেদন ইতি—

অক্ষয়তৃতীয়া
সন ১৩৬৬ সাল

বিনীত
শ্রীবৈদ্যনাথ শীল

সূচীপত্র

(বিষয়-বস্তুর দক্ষিণে পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া হইল)

প্রথম অধ্যায় :

(সূচনা)

দ্বিতীয় অধ্যায় :
(বাংলা প্রহসনের উৎপত্তির যুগ)

তৃতীয় অধ্যায় :
(বুদ্ধিপ্রধান ব্যঙ্গমূলক প্রহসন-রচনায় মলিয়ারের অনুসরণ)

চতুর্থ অধ্যায় :
(অমৃতলাল বসু)

পঞ্চম অধ্যায় :
(দ্বিজেন্দ্রলাল রায়)

ষষ্ঠ অধ্যায় :

(রাজকৃষ্ণ রায়, উপেন্দ্রনাথ দাস ও গিরীশচন্দ্র ঘোষ)

সপ্তম অধ্যায় :

(ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত)

বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা

প্রথম অধ্যায়

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের একটি বিশেষ দিক্-সম্বন্ধে এই গ্রন্থে আলোচনা করিব। ইহা বাংলা সাহিত্যে প্রহসন ও কমেডির ক্রমবিকাশের দিক্, ইহাকেই আমি লঘুনাট্যের ধারা বলিতে চাই। সব দিক্ বিচার করিয়া পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্নকে যদি বাংলা নাটকের সত্যকার স্রষ্টা বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিব, সমাজসংস্কারের প্রয়োজনে রচিত প্রহসনেই বাংলা নাটকের সত্যকার আরম্ভ, আর বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাটকখানি হইল রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'। রামনারায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে এই প্রহসনের ধারা চলিয়া আসিয়াছে এবং এ-ধারা এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

জীবন চলনার দুইটি দিক্—সমাহিত জীবন এবং অসমাহিত জীবন

নাটক মানুষের জীবন অনুকরণ করে। জীবনকে মোটামুটি দুই ভাবে আস্বাদন করা যায়। নিজের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কার, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি লইয়া আমরা জীবন-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি। হয় উহা হইতে রত্ন সংগ্রহ করিয়া সাফল্যের আনন্দে ভাসিয়া উঠিব, না-হয় এই অগাধ, অতল অম্বুধিকে আলোড়িত করিয়া তাহার তলদেশে ডুবিয়া মরিব। মরি কি বাঁচি, রত্ন তুলিতে পারি আর না পারি, ফিরিব না; শেষ চেষ্টা করিবই। অর্থাৎ এক কথায় জীবনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত হইব। আর একটি হইল জীবনের নির্লিপ্তির দিক্। জীবনকে আস্বাদন করিব, কিন্তু তাহার মধ্যে ডুবিয়া মরিব না। মরণ যেখানে আছে, সেখানে অগ্রসর হইব না; বিজ্ঞের মতো তাহাকে এড়াইয়া চলিব। গুটিপোকা-ধর্মী যে মানুষগুলি নিজের সৃষ্ট তন্তুজালে সংসারের গুটির মধ্যে আটকাইয়া যায়, তাহাদিগকে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার দ্বারা মৃদু খোঁচা দিয়া সাবধান করিতে চেষ্টা করিব। জীবনে এমন সুব্যবস্থিত হইয়া চলিব যাহাতে চলার পথে ভুলভ্রান্তি না আসিতে পারে। হৃদয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তির কোনটিকেই এমন একমুখী প্রাবল্যে ঢলিয়া পড়িতে দিব না যাহার জন্য জীবনতরী ভারসাম্য হারাইয়া মহাকালের খরস্রোতে ডুবিয়া যাইতে পারে। বরঞ্চ মানুষের জীবনের এই ভারসাম্য-হীনতা এবং বুদ্ধিভ্রংশ বা প্রমাদগুলিকে ব্যঙ্গের দ্বারা ধরাইয়া দিয়া জগৎ ও

জীবনকে সংশোধনের দিকে পরিচালিত করিয়া ব্যক্তি-দম্পতি-সমাজ-রাষ্ট্র-জীবনের, এককথায় গোটা জীবনের, সামঞ্জস্যের বিধান করিব। এজন্য 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' নীতির প্রয়োজন। সত্তার সামগ্রিক ঝোঁক বা অন্ধভাবাবেগের বশে যদি জীবনের আস্বাদের জন্য মরিয়া হইয়া ছুটি, তাহা হইলে বিচার-বুদ্ধি হারাইয়া ফেলা সম্ভবপর। তাই 'নদীজলে পড়া আলোকের মতো' 'ঝলকে ঝলকে' ছুটিয়া যাইতে হইবে। এই নির্লিপ্তি-নিয়ন্ত্রিত সম্ভোগ জীবনকে আনন্দোচ্ছল, মধুময় করিয়া তোলে। তখন 'যেদিক্ পানে নয়ন মেলি' সবই 'ভাল' বলিয়া মনে হয়। অন্তরের পরিতৃপ্তি মুখে স্মিতহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠে। জীবনের এই হাস্য-তরল, আনন্দোচ্ছল, সম্ভোগমধুর দিক্‌টিই প্রহসন ও কমেডীর উপজীব্য।

নাটককে আমরা 'বিষাদান্ত' এবং 'হর্ষাপ্লুত' এই দুই শ্রেণীতে মোটামুটি ভাগ করিয়া থাকি। ইহার মূলে আছে আমাদের জীবনদর্শনের ভিন্নতা।

নাটকের শ্রেণী-বিভাগ,– হর্ষাপ্লুত ও বিষাদান্ত

কোনো কোনো মানুষের মন বুদ্ধিপ্রধান; কেহ কেহ আবার ভাবালুতায় বিভোর। সুতরাং এই দুই ধরনের মানুষের জীবন-চালনা ও অদৃষ্ট এক হইবে না। বুদ্ধিপ্রধান মানুষ যতখানি 'নিরাশীর্নির্মম' হইতে পারে, ভাবালু মানুষ তাহা পারে না। আবার, ফ্রয়েড সাহেবের মতে, কোনো মানুষই নিছক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় না। মানুষের সত্তার বিশেষ বিশেষ ঝোঁকের প্রাধান্যই তাহার সমগ্র জীবনের নিয়ামক। সত্তার এই একমুখী ঝোঁককে সে যে ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করে, তাহার ধারণা-ভাবনা, জীবন-চালনা ঠিক তদনুপাতে নিয়ন্ত্রিত হইয়া যায়। মানুষের জীবনের এই সত্তার ঝোঁকের খেলা আমরা অনুধাবন করিতে পারিলে আমরা অন্য মানুষ হইতে তাহার পার্থক্য বুঝিতে পারিব। আমরা তাহার জীবন যতই অনুসরণ করিব, ততই তাহার ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য আমাদের নিকট ধরা পড়িবে।

কতকগুলি মানুষ আছে যাহারা অতিমাত্র আত্ম-সচেতন। সমগ্র জগতের বিনিময়েও তাহারা নিজেদের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিতে চাহে না। তাহারা

ট্রাজেডির নায়কের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

যাহা জানে, যাহা বোঝে বা যাহা মানে, তাহাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলে পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবনের সঙ্গে তাহারা সামঞ্জস্য করিয়া বা মানাইয়া চলিতে পারে না। এই স্বতন্ত্রতাপ্রবণ, অতিমাত্র আত্মসচেতন, এক কথায় নিতান্ত একক মানুষগুলির জীবনে নামিয়া আসে নিয়তির অভিশাপ। তাহারা যাহা

ভাবে, তাহাই শেষ সিদ্ধান্ত; যাহা করে, তাহার বাহিরে তাহাদের কর্তব্য বলিয়া কিছুই নাই। নিজেদের বোধ-কর্মের জন্য তাহারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত, তবুও তাহারা নত হইয়া চলিবে না। লঙ্কেশ্বর রাবণের বিদ্যাবুদ্ধি, নীতিজ্ঞান, শক্তিমত্তা কিছুই কম ছিল না, কিন্তু নারীর রূপলোলুপতা দুরারোগ্য ব্যাধির মতো তাঁহার সমগ্র সত্তাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। তাই মাতামহ মাল্যবানের উপদেশ, কুম্ভকর্ণের ভৎর্সনা, বিভীষণের নীতিপূর্ণ অনুনয় কিছুই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিল না। রাবণ বলিলেন, তিনি দুই ভাগে বিভক্ত হইবেন, তবু নত হইবেন না।

আমরা শুধু ভাবি, এই মানুষগুলির চরিত্রে এত মাহাত্ম্য, এত গুণ থাকিতেও এক একটি বিশেষ দোষ তাহাদিগকে ভূতের মতো পাইয়া বসে কেন? ঐ গুণগুলির জন্য আমরা তাহাদিগকে ভাল না বাসিয়া পারি না। রাবণের তপস্যা, রাবণের মনীষা, শক্তি ও কৌশল হেতি-প্রহেতি-বংশীয় রাক্ষসসভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর পৌলস্ত্যবংশীয় রাক্ষসদের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিল; হৃতগৌরব লঙ্কাকে কুবেরের নিকট হইতে পুনরুদ্ধার করিয়া সত্যকার স্বর্ণলঙ্কায় পরিণত করিয়াছিল। কিন্তু রাক্ষসের জাতিগত ব্যভিচার-প্রবণতা মজ্জাগত ঘুণের মতো রাবণের সমস্ত সত্তাই জর্জরিত করিয়া দিল। একটিমাত্র সংগতি-ও-সামঞ্জস্যহীন চরিত্র নিজেকে ছিন্নভিন্ন করিয়া সমস্ত জাতিকে ধ্বংস করিল। ইহার কারণ কি?

গ্রীক নাট্যকারগণ ইহার একরকম ব্যাখ্যা দিয়াছেন। মহৎ চরিত্রের শোচনীয় পতনের জন্য তাঁহারা ঐ চরিত্রকে যতখানি দায়ী না করিয়াছেন, তাহা হইতে বেশি দায়ী করিয়াছেন তাঁহারা মানুষের ভাগ্যনিয়ামক দেবতাকে। নিষ্ঠুরা নিয়তির সব সময়ে লক্ষ্য থাকে, কোনো মানুষ যেন সাধারণের থেকে অনেকখানি উঁচুতে মাথা তুলিতে না পারে, তাহা হইলেই বিশ্ববিধানের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে না। তাই মানুষ যখন সৌভাগ্যের শিখরে উঠিতে উঠিতে অনেকখানি নাগালের বাহিরে চলিয়া যায়, তখন নিয়তি হয় তাহার একটা দৈব-দুর্বিপাক সৃষ্টি করিয়া দেয়, না-হয় তাহার জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত পাপের সূত্র ধরিয়া কলির মতো কৌশলে তাহার দেহ-মন আবিষ্ট করিয়া তাহাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলিয়া দেয়। তখন সেই বিপন্ন-ব্যথিত মানবাত্মা নিজের সমস্ত শক্তি ও কর্মের দ্বারা ঐ মহৎ বিপৎপাত হইতে নিজেকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে। সেই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া তাহার কর্মশক্তির বিকাশ হয়

গ্রীক্ ট্রাজেডির নায়কের বৈশিষ্ট্য

সত্য; কিন্তু নিয়তির কৌশলে তাহার সমস্ত চেষ্টা ও কর্ম ব্যাধের মতো তাহারই মৃত্যুর জাল বিস্তার করে। জীবনযুদ্ধের উপযোগী সমস্ত দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ-সংহারের মন্ত্রগুলি যেন কোন্ দেবতার অভিশাপে তাহার স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়; তাহার শেষ আশ্রয়স্থল বসুমতীও ক্ষুধার্ত রাক্ষসের মতো তাহার রথচক্র গ্রাস করে; দানবীর, জ্ঞানবীর, মহাশক্তিমান্, অর্জুনপ্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধা কর্ণের মতো এই ট্রাজেডীর নায়ক 'মগ্নরথে পৃষ্ঠ দিয়া' মহিমান্বিত মরণের কোলে চিরশান্তি লাভ করে। অস্ত্রশিক্ষা-সমাপ্তির দিনে কর্ণ নিজের অজ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণের হোমধেনু বধ করিয়াছিল, সেই নিতান্ত অনিচ্ছাকৃত অপরাধ, তাহার শাস্তি কি এতই গুরুতর?

শেক্স্‌পীয়ার বলিবেন, নিয়তি তো বাহিরে নয়, নিয়তি বাসা বাঁধিয়াছে কর্ণের অন্তরে। কর্ণেব অত্যধিক উচ্চাশা তাহাকে সমাজশৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে দিল না। অধিরথ-সূতপুত্র কর্ণ কেন অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে চাহিল? এই গগনস্পর্ধী উচ্চাশাই তো কর্ণের পতনের মূল। এই উচ্চাশার জন্য সে যেদিন সরল-বিশ্বাসী পরশুরামকে মিথ্যা-বাক্যে প্রতারিত করিয়াছিল, সেই দিন হইতে তাহার ভাগ্যভূমিতে ধ্বংসের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। ট্রাজেডীর নায়কের চরিত্রই তাহার নিয়তি। রামপ্রসাদের কথায় 'দোষ কারও নয়' নায়ক নিজেই 'স্বখাত সলিলে' ডুবিয়া মরে।

শেক্স্‌পীরীয় ট্রাজেডীর বৈশিষ্ট্য

শেক্স্‌পীয়ার ট্রাজেডীর নায়ক-চরিত্রের আরও একটু গভীরে তলাইয়া গিয়া বলিলেন, চরিত্রের দোষের জন্যই যে নায়কের পতন হয়, তাহাই নহে। চরিত্রের কতকগুলি গুণই শেষ পর্যন্ত 'মারাত্মক ত্রুটি'-হিসাবে নায়ককে পতনোন্মুখ করিয়া তোলে। ইহা চরিত্রের গুরুতর অসংগতির পরিচায়ক। দার্শনিক ব্রুটাস উদারচরিত্র, মহান্, নীতিজ্ঞান-সম্পন্ন। তাঁহার নীতিজ্ঞান অন্তরঙ্গ বন্ধু সীজারের অপরাধ মার্জনা করে নাই, শাণিত অস্ত্রে ব্রুটাসই বন্ধুর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছেন। আর, এই নীতিজ্ঞান তাঁহাকে রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এ্যাণ্টনিকে সীজারের সঙ্গে হত্যা করিলে তাহা বিনা-অপরাধে নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু ভবিষ্যতের যে বিপ্লবে ব্রুটাস ভাসিয়া গেলেন, তাহার সম্ভাবনাই কোনদিন দেখা দিত না। ব্রুটাস এ্যাণ্টনির হত্যা-ব্যাপারে ক্যাসিয়াসের সঙ্গে কিছুতেই একমত হইতে পারিলেন না।

হেগেল বলিলেন, ট্রাজেডী পাপ ও পুণ্যের দ্বন্দ্বে একতরের জয়-পরাজয়ের ফলাফল নহে। দুই সমান নীতিজ্ঞানের মধ্যেও অনেক সময়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত

হয়। নায়ক যদি একটি নীতিকে গুরুত্ব দিয়া আর একটিকে অস্বীকার করে, তাহা হইলে বিশ্ববিধান বিক্ষুব্ধ হইয়া নায়কের সমর্থিত ঐ নীতিজ্ঞানের মধ্য দিয়াই তাহার জীবনের বিষময়ী পরিণতি ঘটাইয়া তোলে। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'নর-নারায়ণ' নাটকে কর্ণের মনে মাতৃভক্তি ও আত্মপৌরুষের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু পুরুষকারের অভিমানে কর্ণ যে মাতৃভক্তির আহ্বানে সাড়া দিতে পারিলেন না, সেই সংক্ষুব্ধ মাতৃভক্তিই নিষ্ঠুরা নিয়তির মতো কর্ণকে অভিভূত করিল। 'মৃত্যুরূপা' মাতার চরণের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া কর্ণ শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

হেগেলীয় ট্রাজেডির বৈশিষ্ট্য

দুর্দমনীয় বাসনার অতিচারী অভিব্যক্তিই যে ট্রাজেডীর মূল প্রেরণা একথা স্বীকার করিতেই হইবে। ট্রাজেডীর নায়ক ঐ বাসনার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করিয়া ফেলে; যেমন চতুর্দশ লুই ভাবিতেন, 'রাজ্য, সে তো আমি।' তাই ট্রাজেডী একেবারে নায়কসর্বস্ব। ট্রাজেডীর জগৎ এই নায়কের ব্যক্তিত্বের দ্বারা সৃষ্ট, আলোড়িত ও নিয়ন্ত্রিত। এই ব্যক্তিত্বকে সংঘাতে বা সাহচর্যে বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্যই অন্যান্য চরিত্রের আগমন।

এইখানে কমেডীর সঙ্গে ট্রাজেডীর একটা বড় রকম পার্থক্য রহিয়াছে। ট্রাজেডী ব্যক্তিকেন্দ্রী, আর কমেডী ও প্রহসন গণকেন্দ্রী বা সমাজকেন্দ্রী। কমেডীর কোনো চরিত্রই 'দশের কোঠায় একাদশ জন' নয়। তাহারা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর, জাতির বা সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয়। কমেডী-প্রহসনের পাত্রপাত্রী জীবন লইয়া খেলা করে; ট্রাজেডীর নায়ক জীবনের জন্য পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যুদ্ধ করে। খেলায় বুদ্ধির মার-প্যাচ আছে, দৈহিক ও মানসিক উত্তেজনাও কম নয়, কিন্তু হারিয়া গেলে ভাঙিয়া পড়িবার কারণ নাই। পরাজয়ের মধ্যেও দেখা যাইবে, সত্তাবিধ্বংসী কিছুই হয় নাই। ট্রাজেডীর নায়ক হারিলে দেখিবে, তাহার সমস্ত অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইয়াছে; তাহার সত্তাই পরাজিত হইয়াছে! মরিলে সে বাঁচিয়া যায়, বাঁচিয়া থাকিলেই বরং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে, তাই ট্রাজেডীতে মাঝে মাঝে হাসির প্রবেশাধিকার থাকিলেও চরমে নামিয়া আসে দুরপনেয় বিষণ্ণতা। তখন মনে হয়, পরিণতির পূর্বকার হর্ষাপ্লুত মুহূর্তগুলিও চরমের এই বিষণ্ণতা ঘনীভূত করিবার জন্য প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করিয়াছিল। কিন্তু কমেডীর শেষ পরিণতি আনন্দের। কমেডীর মধ্যে ব্যথা-বেদনা-হতাশ্বাস যে থাকিতে পারে না, তাহা নয়, উহা

ট্রাজেডী ও কমেডীর পার্থক্য

থাকে বরং চরমের আনন্দকে উচ্ছলিত করিবার জন্য ; উহা প্রেমিকা নায়িকার কপট মানের মতো, সাধিলেও কথা বলিবে না, কারণ, সে প্রতীক্ষায় আছে, নায়ক এতটুকু বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইবার জন্য এক পা বাড়াইলেই হয়, তখন সে প্রেমাস্পদকে ঠকাইতে পারিয়াছে বলিয়া বিজয়ের আনন্দে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিবে। পূর্বকার ইচ্ছাকৃত মৌন মুহূর্ত-মধ্যে একরাশি প্রগল্ভ সংলাপ সৃষ্টি করিবে যাহার মধ্যে দুই-চারিটা অর্থহীন প্রলাপ থাকিলেও ক্ষতি হইবে না।

হাস্যরস কমেডী-প্রহসনের উপজীব্য একথা আমরা গোড়ায়ই ধরিয়া লই। এই হাসির উৎপত্তির হেতু এবং প্রয়োজন কি? প্রয়োজনের দিক্ বিচার করিতে গিয়া সমালোচকগণ বলিয়াছেন, হাসির পশ্চাতে একটি সংশোধনী মনোবৃত্তি রহিয়াছে। একান্ত করিয়া বর্তমান মুহূর্তের নিছক বাস্তব জগৎ ও জীবনই কমেডী-প্রহসনের অবলম্বন। এই বর্তমানের বাস্তব জীবনটিকেই কি করিয়া সুন্দর, সংগত ও নির্ভুল করিয়া উপভোগ করা যায়, কমেডীর লক্ষ্য তাই। ইহা আমাদের সীমায়িত, খণ্ডক্ষুদ্র জীবনের উপর হাসির আলোক ছড়াইয়া তাহাকেই উজ্জ্বল করিতে চায়। বলিতে চায়, 'পান ক'রে নাও রাজা, যে-কয়টা দিন এই জগতে প্রাণটা আছে তাজা।' বৃহত্তর কোনো অপ্রাপ্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ইহাতে নাই। জীবলোকের অপূর্ণতা আর কল্পলোকের অতিপূর্ণতার মধ্যে সোনার সেতু রচনা করিবার মোহময় বেদনাবিধুর স্বপ্নপ্রয়াস কমেডীর নহে; উহা ট্রাজেডীর। কমেডীর মধ্যে যে জগৎ-চেতনা ও জীবনবেদনা আছে তাহা একান্ত করিয়া ধূলির ধরণীর। "ধূলি ছাড়ি ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে" সে উড়িতে চাহে না, ট্রাজেডী চায় সীমা ও অসীমের মিলন ঘটাইতে। ব্যক্তির ক্ষুদ্রতম জীবনকে সমষ্টির বিশাল ব্যাপ্তির মধ্যে প্রসারিত করিয়া ভূমায়িত করিবার চেষ্টা করে ট্রাজেডী। একসঙ্গে সে সৃষ্টি ও স্রষ্টার রহস্য ভেদ করিতে চায়। কমেডী 'আদার ব্যাপারী', জাহাজের খবর লইতে যায় না। সে বুদ্ধিমান্, অতিপ্রাপ্তি বা অতিভোজনের খেয়ালে বা মোহে সে 'বুদ্ধিনাশা' হইতে চায় না। বর্তমানের এই জীবনটাকে ভোগ করিবার পথে যে বাধাবিঘ্ন আসিয়া দেখা দেয়, কমেডীর পাত্রপাত্রী চায় বুদ্ধিকৌশলে ও সুষ্ঠু চলনে, পরিস্থিতি-পরিবেশ-নিয়মনের মাধ্যমে তাহা অতিক্রম করিয়া সাফল্যের হাসি হাসিতে।*

হাসির উৎপত্তির কারণ

---

* Comedy is concerned with life as a thing to be **lived.** It has no direct cognisance of thoughts which

মানুষ যে জীবনটাকে সহজে সুন্দর করিয়া ভোগ করিতে পারে না তাহার কারণ আছে। কতকগুলি মানুষ আছে, যাহারা অনুদার, নিজেদের ব্যক্তিত্বকে প্রসারিত করিতে পারে না, নিজের মতামত, চাল-চলনে আর দশজনের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে পারে না। ইহাদের এই যে সংকুচিত ব্যক্তিত্ব, ইহা আবার এমন দৃঢ় নয় বা এতখানি অসংগত নয় যাহাতে পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবনের সঙ্গে একটা বড় রকমের সংঘাত তুলিয়া সমস্যার ঝড় বহাইয়া দিতে পারে। ইহাদের চরিত্রের এই অসংগত দিকটা সহনীয়, আর সহনীয় বলিয়াই পরিবেশ তাহাকে খোঁচা দিয়া একটু আনন্দ পাইতে চায়। পরিবেশ চায় যে, ঐ লোকগুলি সংশোধিত হইয়া তাহাদের দলে মিশুক, স্বাভাবিক, সাধারণ মানুষ হউক। কিন্তু মজা হইল এই যে, পরিবেশ ও পরিস্থিতি উহাদের চরিত্রের যে দিক্‌টা লইয়া ব্যঙ্গ করে, সে দিক্‌টি সম্বন্ধে ঐ হাস্যাস্পদ ব্যক্তিগণ মোটেই সচেতন নয়, সচেতন থাকিলে আর তাহাদের লইয়া হাসা গেল না। এই অসংগতি বা ভুলটা যে অভ্যাসগত অনপনেয় ত্রুটিই হইবে, এমন কোনো কথা নাই, অনেক সময়ে ইহা অনবধানতা বা খেয়াল প্রসূতও হইতে পারে।

কলেজের ঘণ্টা পড়ো-পড়ো, অধ্যাপক মহাশয় কলেজের পাশের বাড়িতেই বাস করেন, তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তিনি ক্লাশে ঢুকিলেন।

(*Contd. from Page 6*)

wander through eternity. It is exclusively concerned with the problems of mortality. Conjectures of immortality are values beyond its competence to assess. "What time of the day it is, lad?" That is the immediate concern of comedy. Unless hours were cups of sack, and minutes capons, or other things no less necessary to the continued existence of man in the world in which he lives, comedy could indeed be superfluous. If time were but a moment of eternity, there would be no more reason to ask for comedy than to demand the time of the day. For tragedy, time is the eternal now; for comedy, it is the conditions of present existence. Comedy is immerged in time, in the here and now. Its heroes, to overcome, to end happily without end, must be endowed with the temperament and the arts to triumph over the stresses of circumstance. They are not concerned with what man and life might have been. They take it as it is and seek a way to turn it to their purpose. For them, the world is an oyster. Their primary object is to attain a mastery of circumstance.—H. B. Charlton, Shakespearian Comedy, p. 176.

ছাত্রছাত্রী হাসি চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াও পারিতেছে না। অধ্যাপক গম্ভীরভাবে তাহাদিগকে শান্ত ও মনোযোগী হইতে বলিতেছেন। সেই গুরুগম্ভীর উপদেশে ছাত্রছাত্রীর হাসি উথলিয়া উঠিতেছে। ব্যাপার কি? হঠাৎ কখন্ অধ্যাপক মহাশয়ের দৃষ্টি নিজের পা দুইখানির দিকে পড়িল। এবার কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের হাসি থামিয়া গেল। অধ্যাপক দেখিলেন, পাদুকাবিপর্যয়ই এই হাসির খোরাক যোগাইয়াছে। তাড়াতাড়ি আসিতে গিয়া তিনি নিজের একখানি ও স্ত্রীর একখানি স্যাণ্ডাল্ পরিয়া আসিয়াছেন। এই অসংগতিই হাসির কারণ।

অসংগতি থেকেই যে আমরা হাসিয়া থাকি একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মূলে প্রেরণা-হিসাবে আমাদের মননশক্তি কতটা কাজ করে এবং অনুভূতি বা সমবেদনা কি পরিমাণ আছে, দ্বন্দ্ব চলিয়াছে তাহা লইয়া। হাস্যরস-সম্বন্ধে বিশ্ববিখ্যাত মত ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ-এর। তিনি বলিতে চান, আমাদের হাসির সঙ্গে সমবেদনার যোগ একটুও নাই। যে-কোনো প্রকার সহনযোগ্য অসংগতি দেখিলেই আমরা নিছক স্নায়বিক প্রেরণাবশেই হাসিয়া উঠি। ইহা স্বাভাবিক এবং অতি ক্ষিপ্র জৈব প্রতিক্রিয়া। ভাবিয়া-চিন্তিয়া, রহিয়া-বসিয়া আমরা হাসিতে পারি না। বর্ষার রাস্তায় তাড়াতাড়ি চলিতে গিয়া একটি লোক ধপাস্ করিয়া পড়িয়া গেল, অন্যান্য যাত্রীর সঙ্গে তাল রাখিয়া সে চলিতে পারিল না দেখিয়া পথযাত্রী অপরাপর লোক হাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা যদি বিচার-বুদ্ধি করিয়া হাসিতে যাইত, তাহা হইলে মোটেই হাসিতে পারিত না। তখন নিশ্চয়ই ভাবিতে হইত, পিচ্ছল পথে পা ফস্কিয়া যাওয়া স্বাভাবিক, ইহার জন্য হাসিবার কি আছে? অথবা যদি পতন-জনিত আঘাত গুরুতর হইত, তাহা হইলেও অন্যরা হাসিতে পারিত না, বরং সমবেদনাই জানাইত।*

বার্গসঁএর অভিমত

হাসির পিছনে যে অনুভূতির যোগাযোগ আদৌ নাই, বার্গসঁর এই মত সকলে স্বীকার করিতে চাহেন না। ম্যাক্‌ডুগাল সাহেব মনে করেন, হাসিও

* The comic demands something like a momentary anesthesia of the heart. Its appeal is to intelligence, pure and simple......The comic is......, accidental : it remains so to speak, in superficial contact with the person.—Laughter, by Henri Bergson, trans. by C. Brereton and Fred Rothwell, Chap. 1.

একপ্রকার অনুভূতি থেকে জাত হয়। এই অনুভূতি সমবেদনার ঠিক বিপরীত একটা কিছু।* মানুষের স্বল্পতম দুঃখ বা বেদনা আমাদিগের হাসির উদ্রেক করে। মানুষের দুঃখে মানুষ যদি শুধু সমবেদনাই জানাইত, তাহা হইলে মনুষ্যজীবন চিরবেদনাময় হইয়া থাকিত। এই বেদনাময়তা হইতে মুক্তি দেয় হাসি। হাসি একপ্রকার শারীর-মানস প্রতিক্রিয়া। হাসির উত্তেজনায় শ্বাস-প্রশ্বাস এবং রক্ত-সঞ্চালনের ফলে আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পুষ্ট ও নিয়মিত হয়, সুতরাং হাসি আমাদের জীবনবৃদ্ধির সহায়ক। যে স্বল্পপীড়ায় আমাদের প্রত্যক্ষ সহানুভূতির উদ্রেক করে না, তাহাই হাসির উদ্রেক করিয়া থাকে। ম্যাক্‌ডুগাল্ সাহেবের এই মতটিকেই রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করিয়াছেন তাঁহার 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের অন্তর্গত 'কৌতুকহাস্য'-প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ বলেন, কমেডীর হাস্য আর ট্রাজেডীর বেদনার মধ্যে জাতিগত পার্থক্য নাই; পার্থক্যটুকু নিছক মাত্রাগত। যে স্বল্পবেদনা আমরা সহ্য করিতে পারি, অন্যকে ততটুকু বেদনা দিয়া আমরা একপ্রকার আনন্দই পাইয়া থাকি। এই পীড়াজনক আনন্দ হইতেই কৌতুক-হাস্যের উৎপত্তি। কিন্তু এই অসংগতিজনিত পীড়া যখন মাত্রা ছাড়াইয়া যায়, তখন আমরা আর সহ্য করিতে পারি না; কাঁদিয়া ফেলি। তখনই যাহা হাসির উদ্রেক করিয়াছিল, তাহাই বেদনাবিধুর সহানুভূতির কারণ হইয়া পড়ে।

ম্যাক্‌ডুগালের অভিমত

উদাহরণ-হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ছোট একটি কবিতা আমরা বিশ্লেষণ করিতে পারি। পালোয়ানের বিবাহ। 'বর' 'বীরের সাজে' সাজিয়া আসিয়াছেন। 'শালীর সাথে ক্রমে ক্রমে' তাঁহার আলাপ জমিয়া উঠিল। এতটুকু কৌতুক করিবার জন্য বর 'রায়বেঁশে নাচ নাচের ঝোঁকে' শালীর মাথায় এক ঘা বসাইয়া দিয়াছেন। পালোয়ান বুঝিতে পারেন নাই যে, তাঁহার এই কৌতুকের আঘাত মাত্রা ছাড়াইয়া যাইবে, হাসিতে গিয়া কান্নার উৎপত্তি হইল, মূর্ছিতা কন্যা হয়তো মরিতেছে, 'শ্বশুর' মেয়ের শোকে' কাঁদিয়া উঠিলেন। বর হাসিয়া বলিলেন, 'আমি একটু ঠাট্টা করিয়া-ছিলাম মাত্র।'

---

* McDougall holds that laughter is the antidote to sympathy. Nature has implanted in us two antagonistic tendencies, the sympathetic tendency which makes us share in the thousand and one misfortunes of our fellowmen, and the opposite tendency to laugh at those minor mishaps

আবার এই অসংগতি আমাদের অন্তরে সযত্নে লালিত কোনো প্রিয় সংস্কারে আঘাত দিয়া অন্তরকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিলে আমরা কিন্তু হাসিতে পারিব না। কোনো স্থরসিক গায়ক যদি গান ধরেন :

'একদা শ্রীহরি হুক্কা হাতে করি
আসিলা রাইয়ের ঘরে।
বলে, রাধে, একটু আগুন দিবি ?'

তাহাতে বংশীধারী মুরারকে হুক্কাধারী কৃষকরূপে আবির্ভূত দেখিয়া অসংগতির জন্য আমরা অবশ্যই হাসিয়া উঠিব, কিন্তু যে ভক্ত বৈষ্ণব রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন কিছুই জানেন না, তিনি উপাস্য দেবতার এই ব্যঙ্গে না হাসিয়া লঙ্কাকাণ্ড বাধাইয়া তুলিবেন সন্দেহ নাই।

বার্গসঁ চারি প্রকার অসংগতি থেকে হাস্যরসের উৎপত্তি হয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যেমন (১) বেশভূষা ও প্রচেষ্টার অসংগতি, (২) বাক্যগত অসংগতি, (৩) ঘটনা-বা-পরিস্থিতি-সঞ্জাত অসংগতি এবং সর্বশেষে (৪) চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত অসংগতি। পরপর এই চারি প্রকার অসংগতি বুঝাইতে গিয়া তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ 'Laughter' গ্রন্থখানির তিনটি অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। আমি দুই-একটি উদাহরণ দিয়া এই চারি প্রকার অসংগতি বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

চারি প্রকার অসঙ্গতি হইতে হাসির উৎপত্তি

দেহটাকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিয়া মানুষ অতি সহজে, বিনা বেদনায় যে অঙ্গবিকৃতির অনুকরণ করিতে পারে, তাহা হইতে হাস্যরসের উৎপত্তি হয়।

(*Contd. from Page 9*)

of other men, which call for no practical help. Without sympathy social existence would have been impossible; but unmitigated sympathy spreading a contagion of suffering would have made social life equally impossible. Laughter renders the much-needed relief. Its beneficial effect is mental as well as physical. It directs the mind from depressing thoughts and stimulates the vital functions of respiration and circulation. Thus laughter has a biological utility. Mc-Dougall holds that there is a distinct instinct of laughter in man and its excitant is mild distress, not calling for active sympathy.—S. C. Dutta, Psychology, p. 260.

কোনো বাঙালী ব্যঙ্গাভিনেতা যদি মাদ্রাজের ভিখারীদের ভিক্ষাকালীন অঙ্গপ্রচেষ্টা অনুকরণ করেন, আমরা তাহা হাসির মধ্য দিয়া উপভোগ করিব। কারণ, ঐ আঙ্গিক প্রচেষ্টার অনুকরণে তাঁহার নিজেরও কোনো কষ্ট হইতেছে না, বা উহা আমাদেরও কোনো সমবেদনার উদ্রেক করিতেছে না। কিন্তু সত্য সত্যই যদি মাদ্রাজী কেহ ভিক্ষা করিতে আসিত, তাহা হইলে তাহার ভিক্ষাকালীন অনুনয়-বিনয়-সঞ্জাত অঙ্গভঙ্গীতে আমরা কি হাসিতে পারিতাম?

বিকৃত বেশজাত হাসির উদাহরণ সুপ্রচুর। কোনো ব্যক্তি যদি প্যাণ্টালুন পরিয়া গেঞ্জীর উপর নামাবলি চড়াইয়া মাথায় একটি গান্ধীটুপি পরিয়া বিদ্যাসাগরী চটি পায়ে রাস্তায় বাহির হয়, তাহাকে দেখিয়া কে না হাসিবে?

উপরিলিখিত দুই প্রকার অসংগতি খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। বাক্যগত এবং চরিত্রগত অসংগতিই সাহিত্যিক বিচারে মুখ্যতঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বাক্যগত অসংগতিকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—ইংরাজীতে যাহাকে বলা হইয়াছে 'satire' এবং 'humour'। 'Satire'-কে আমরা 'বিদ্রূপ' বলিতে পারি। 'Humour'-এর কোনো পরিভাষা হয় কি না আমার জানা নাই। 'Satire' নির্মম, নিষ্ঠুর, প্রখরবুদ্ধিদীপ্ত; মানুষের দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতার সুযোগ লইয়া সে তীব্র কশাঘাত করে, আঘাত দিয়া খান খান করিয়া ভাঙে, বেদনা দিযাই তাহার আনন্দ, আর 'humour' এক চোখে হাসায়, অন্য চোখে কাঁদায়। যে অসংগতি আমাদের সহজাত-দুর্বলতাপ্রসূত, হাজার চেষ্টা করিলেও আমরা যাহার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিব না, যে দুর্বলতা শিকড় গাড়িয়াছে আমাদের অস্তিত্বের মর্মমূলে, 'humour' হাসির মধ্য দিয়া জীবনের সেই দুরপনেয় দুর্বলতার দিকেই ইংগিত করে, সেই ইংগিতে আমরা মানবজীবনের শাশ্বত দৌর্বল্যের চিত্র দেখিয়া শুধু হাসিই না, বেদনায় অভিভূত হইয়া পড়ি। 'Humour' এই ট্রাজেডীধর্মী হাস্যরস, যাহার মধ্যে হাসি ও বেদনা অভিন্নহৃদয় দম্পতীর মতো মিলিত হইয়াছে।* ডাঃ সুবোধকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'The Art of Bernard Shaw' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে অতি সংক্ষিপ্ত অথচ সুনির্বাচিত কথায় 'wit' এবং

* The stroke of the great humourist is world-wide, with lights of Tragedy in his laughter.—George Gordon, Shakespearian Comedy, p. 5.

'humour'-এর পার্থক্যটুকু বুঝাইয়া দিয়াছেন।* বুদ্ধিদীপ্ত 'wit' মানুষের বাক্য, বাগ্-ধারা বা বিশেষ বিশেষ বাচনভংগিমা, ধারণা-ভাবনা বা মতামতের মধ্যে যে বিরোধ বা অসংগতি থাকে, তাহা লইয়াই কারবার করে, কিন্তু 'humour'-এর ক্ষেত্র আরো একটু গভীর। Humourist মানব-জীবনকে ভালবাসেন, তাই তিনি জীবনকে সুস্থ, স্বস্থ ও সংগত করিবার জন্য সমবেদনায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়াই বিশেষ বিশেষ চরিত্রের ভাবালুতার অতিচারিতা ও অসংগতি এবং চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য মেজাজ-মর্জি প্রাতিস্বিকতা লইয়া ব্যঙ্গ করেন, তাই 'humour' অপেক্ষাকৃত গভীর ও গম্ভীর। 'satire' বুদ্ধ্যাশ্রয়ী, 'humour' বুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া মর্মস্পর্শ করে, ভাবধর্মী হইয়া উঠে।

সুতরাং চরিত্রগত অসংগতি লইয়া ব্যঙ্গ করিতে গেলেই আমাদের এই 'humour'-এর আশ্রয় লইতে হইবে। তাই পৃথিবীর সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কমেডী-রচয়িতৃগণ সকলেই শ্রেষ্ঠ 'humourist'।

বাংলা সাহিত্যে কমেডী-প্রহসনের বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করিতে হইলে আমাদের আলোচনাকে মোটামুটি তিনটি অংশে ভাগ করিয়া লইতে হইবে। প্লটাস্-টেরেন্স্ হইতে আরম্ভ করিয়া শেক্‌স্পীয়ার-মলিয়ার পর্যন্ত ইউরোপীয় কমেডী-প্রহসন-সাহিত্যের যে বিবর্তন হইয়াছে, বাংলা কমেডী-প্রহসনের উদ্ভব পুরাপুরি তাহা হইতে হইয়াছিল কি? সংস্কৃত প্রহসন-সাহিত্য বাংলা-সাহিত্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে? আমাদের দেশীয় যাত্রা-সাহিত্যে যে হাস্যরসের যোগান চলিতেছিল, পরবর্তী কালের কমেডী-প্রহসনের ক্রমবিকাশে তাহার দান কতটুকু?

* Wit is concerned with the incongruity and opposition between words, phrases, fancies and opinions, while humour delights in abnormalities of sentiments and idiosyncracies of character. Humour, in contemplating eccentricities, often falls in love with the object of its derision. Humour and wit are both related to intellectual judgments, but humour is allied to sentiment, while wit is a pure intetellectual exercise. Then, again, there is a tone of seriousness in humour that distinguishes it from wit, which delights only in the combination of words and fancies, as seen apart from character.—Dr. S. C. Sengupta, The Art of Bernard Shaw, p. 137.

রোমক কমেডী হইতে শেক্‌স্‌পীরীয় রোমান্টিক কমেডী পর্যন্ত বিবর্তনের ইতিহাস রচনা করিতে গিয়া সমালোচকগণ যে প্রধান প্রধান কথাগুলি বলিয়াছেন, সেগুলি মোটামুটি এই :

ল্যাটিন্ কমেডী প্রধানতঃ বাস্তবপন্থী ও ব্যঙ্গপূর্ণ। ধূলির ধরণী অতিক্রম করিয়া ইহা কোনো কল্পলোকের দিকে ধাবিত হয় না। ঘটনার মধ্যে চাতুর্যপূর্ণ জটিলতা আছে। এই সকল নাটকে নরনারীর লালসার কৌতুককর চিত্র মিলে; কিন্তু প্রেমের নিবিড়তা নাই। শেক্‌স্‌পীরীয় কমেডীর সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, শেক্‌স্‌পীয়ার হাসিয়াছেন সমবেদনায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া। তিনি জীবনকে ভালবাসিয়াছেন বলিয়া হাসিতে হাসিতে গম্ভীর হইয়াছেন, তাঁহার হাসি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। নরনারীর সম্পর্ক লইয়া তামাসা করিতে গিয়া তিনি সত্যকার প্রেমের চিত্র অংকন করিয়াছেন।

ল্যাটিন্ ও শেক্‌স্‌পীরীয় কমেডীর বৈশিষ্ট্য

শেক্‌স্‌পীরীয় কমেডীর বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, মধ্যযুগীয় বীরধর্মের আদর্শে তিনি নারীকে মহনীয়া দেবীর দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং নারীপ্রেমের মহনীয় চিত্র অংকন করিয়াছেন। স্থূল ভোগমুখিতার ঊর্ধ্বে উঠিয়া তিনি ধূলির ধরণীতে প্রেমের আদর্শ স্বর্গলোক রচনা করিয়াছেন। ভোগের সঙ্গে ত্যাগের মিশ্রণ হইয়াছে শেক্‌স্‌পীরীয় কমেডীতে। শেক্‌স্‌পীয়ার শুধু বিজ্ঞের হাসি হাসিয়া জীবনের ভুলভ্রান্তি এড়াইয়া চলেন নাই, জীবনকে ভালবাসিয়া তাহার মধ্যে ডুবিয়াছেন। সুধু মজা করিবার জন্য হাসেন নাই, জীবনের মধুমত্ততার পরিতৃপ্তির জন্য হাসিয়াছেন। অর্ল্যাণ্ডো রোজালিণ্ডের জন্য পাগল হইয়া আর্ডেনের বনে গাছে গাছে প্রেমলিপি লিখিয়া চলিয়াছে, রোজালিণ্ড আর সিলিয়া তাহা লইয়া যে ব্যঙ্গ করিতেছে, তাহার মূলে রহিয়াছে অর্ল্যাণ্ডোর প্রতি রোজালিণ্ডের গভীর অনুরাগ। মধ্যযুগীয় অন্ধবিশ্বাস-প্রণোদিত ইহুদী-বিদ্বেষ শাইলকের চরিত্র লইয়া তীব্র ব্যঙ্গ করিলেও শাইলকের মনুষ্যত্বের চিত্র-অংকনে শেক্‌স্‌পীয়ার কিন্তু এতটুকুও ত্রুটি করেন নাই। আসলে শেক্‌স্‌পীয়ার ছিলেন এমন একটি জীবন-রসিক নাট্যকার, যিনি জীবনকে খণ্ড-ক্ষুদ্র ভাবে না দেখিয়া সামগ্রিকভাবে দেখিতে সব সময়ই চেষ্টা করিয়াছেন। তাই তাঁহার কমেডী-প্রহসনের মধ্যেও জীবনের একটা সামগ্রিকতার চিত্র দিতে তিনি চেষ্টা করিয়াছেন।

শেক্‌স্‌পীরীয় নাট্যরচনার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, তাঁহার ট্রাজেডীগুলি মূলতঃ পুরুষপ্রধান, আর কমেডীগুলি প্রধানতঃ নারীপ্রধান।

বুদ্ধিমতী তরুণীদের হাতে শেক্‌স্‌পীরীয় কমেডীর ঘটনার রশ্মি সম্পূর্ণভাবে চলিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, শেক্‌স্‌পীয়ারের সময়ে ইংরেজ নারী অনেকখানি সামাজিক মুক্তি লাভ করিয়াছিল। কমেডীর মধ্যে সেই মুক্তির স্পন্দন অনুভব করা যায়। এ-ব্যাপারে আমার কিন্তু আর একটা বড় কথা মনে হয়। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে নারীদের অতখানি বুদ্ধিমতী ও কৌশলপূর্ণা করিয়া আঁকিবার পিছনেও একটি প্রচ্ছন্ন কৌতুকপ্রিয়তা ছিল। শেক্‌স্‌পীয়ারের আমলেও নারী-পুরুষের মধ্যে বেশ খানিক ভেদাভেদ মানিয়া লওয়া হইত। নারীকে স্বভাবতঃ কোমলস্বভাবা, পুরুষের চেয়ে শারীরিক, মানসিক শক্তিতে দুর্বলা এবং মন্ত্রগুপ্তি-ব্যাপারে অক্ষমা করিয়া দেখিবার প্রেরণা শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকেও আছে। ব্রুটাসের পত্নী পোর্‌শিয়ার চরিত্র ইহার প্রমাণ। সেই নারীকেই যদি পুরুষের বুদ্ধি ও ভাগ্য লইয়া খেলা করিতে দেখা যায়, তাহা হইলে তাহা কি কম অসংগতির পরিচয় বহন করে এবং কম কৌতুকের উপাদান হয়?

ফরাসী নাট্যকার মলিয়ার শেক্‌স্‌পীয়ারের পরে আবির্ভূত হন। মলিয়ারের নাটকে বুদ্ধির দীপ্তি বেশি। মানুষের চরিত্রগত দুর্বলতা লইয়া মলিয়ার তীব্র ব্যঙ্গ করিয়াছেন। মলিয়ার শাসনের কশা হাতে তুলিয়া লইয়াছিলেন, তিনি ক্ষমা করেন নাই, নির্মমভাবে আঘাত করিয়াছেন। চরিত্রের যে সমস্ত দুর্বলতা মানুষকে অন্ধ করে, অসামাজিক করে, মলিয়ার খোঁচা দিয়া সে সমস্ত দুর্বলতা-সম্বন্ধে মানুষকে সজাগ করিয়াছেন। বুদ্ধিমান্ বোকাদের কান মলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন।

মলিয়ারের কমেডীর বৈশিষ্ট্য

বার্ণাড শ'-এর শনিদৃষ্টি তীব্রতীক্ষ্ণভাবে পতিত হইয়াছে ব্যক্তি, দম্পতী, সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের সর্বস্তরে। যুগ-যুগান্তরের অনাচার-অবিচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রূপের বিষবাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন নির্মমভাবে। আমাদের রীতি-নীতি-চাল-চলনের মধ্যে যে কতখানি অসংগতি রহিয়াছে, সত্যের নামে আমরা যে কতখানি মিথ্যার অনুসরণ করিতেছি, শ তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। শ'-এর হাসি তাই কাষ্ঠ হাসি, করুণার লেশমাত্রও তাহার মধ্যে নাই। আমাদের পূজিত আদর্শের অনেক দেবতার আবরণ শ'-এর আক্রমণের ঝড়ে উড়িয়া গিয়াছে। সেই পুরাতন জরাজীর্ণ দেবতা যে মিথ্যার আবরণে সজ্জিত অপদেবতা-মাত্র, শ' তাহা দেখাইতে

বার্নার্ড্‌ শ'য়ের কমেডীর বৈশিষ্ট্য

কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। আমাদের বহুদিনের ভক্তিপ্লুত দেবমন্দিরকে শ' দেখাইয়াছেন প্রেতের লীলাভূমিরূপে। তাই শ'-এর নাটকে হাসি থাকিলেও আমরা কিছুতেই উহাকে লঘুনাট্য বলিতে পারি না। শ' আমাদের লইয়া হাসিয়াছেন আমরা তাঁহার সংহত হাসিবার মতো সবলতা অর্জন করি নাই।

ইউরোপীয় নাটকের কতখানি আদর্শ বাংলা নাটক গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বিচার করিবার পূর্বে সংস্কৃত প্রহসন ও দেশী যাত্রায় হাস্যরসের কতখানি অবতারণা হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন।

সংস্কৃত প্রহসন ও কমেডীর বৈশিষ্ট্য

সংস্কৃত অন্যান্য নাট্যগ্রন্থের ন্যায় প্রহসনও স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাশ্চাত্য সমালোচকগণের অনেকেই, বিশেষ করিয়া ইংরেজ সমালোচকগণ, সংস্কৃত নাটক-প্রহসনের সুবিচার করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত সাহিত্যের বিচার করিতে হইলে ভারতীয় জীবনবোধ যতখানি থাকা প্রয়োজন, ইঁহাদের ততখানি ছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। ইঁহারা 'ধানের ক্ষেতে বেগুন খুঁজিতে গিয়াছেন' এবং না পাইয়া হতাশ হইয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের একজন প্রধান সমালোচক এ. বি. কীথ্। তিনি কালিদাসের নাটকে 'জীবন' খুঁজিয়া পান নাই, সংস্কৃত প্রহসনে উৎকর্ষ বিশেষ কিছুই দেখেন নাই।* আমাদের দেশীয় অনেক সমালোচক এই দলে ভোট দিয়াছেন, কিন্তু এই মতগুলি নির্বিচারে মানিয়া লওয়া যায় না। দেশী-বিদেশী সমস্ত সমালোচকই একবাক্যে বলিয়াছেন সংস্কৃত প্রহসনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইতেছে 'ভগবদজ্জুকীয়ম্'।† 'মত্তবিলাসম্' প্রহসনখানির স্থান

* The Prahasanas and Bhanas are hopelessly coarse from any modern European stand-point, but they are certainly often in a sense artistic productions. The writers have not the slightest desire to be simple; in the Prahasanas their tendency to run riot is checked, as verse is confined to erotic stanzas and descriptions, and some action exists.—A. B. Keith, The Sanskrit Drama, p. 264.

† Of the few Prahasanas in Sanskrit that have been published so far Bhagavadajjukiyam is one of the best. It is called "Prahasana-ratnam'—"The gem among Prahasanas." The play abounds throughout in a wealth of wit and humour. The language is quite clear and simple, and the ideas are refined and expressed beautifully. The characters are very typical; and in presenting them on

তাহার পরে। কীথ্ সাহেব অন্যান্ত প্রহসনের মত 'মত্তবিলাসম্'কেও উড়াইয়া দিয়াছেন।*

অবশ্য সংস্কৃত প্রহসনমাত্রই ভাল, এমন কথা আমিও বলিতে চাহি না। 'হাস্যার্ণব'-এর মতো অশ্লীল, গ্রাম্যতাদুষ্ট কুরুচিপূর্ণ প্রহসনের আলোচনা না করাই ভাল। 'ধূর্তসমাগমম্'ও খুব উন্নত রুচির নহে, যদিও 'ধূর্তসমাগমম্'-এর মধ্যে স্থানে স্থানে রচনা-কৌশল অপূর্ব, তবুও 'মত্তবিলাসম্' এবং 'ভগবদজ্জুকীয়ম্'-এর আলোচনা যিনিই করিবেন, তিনিই বুঝিবেন, ভারতীয় সাহিত্যিকের হাস্যরস-সর্জনপ্রতিভা কত উন্নত ছিল।

হাস্যরস ও প্রহসন কমেডী-সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ সমালোচনাগ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ কিছুই রচিত হয় নাই। কিন্তু বার্গ্সঁ, মেরিডিথ, ম্যাক্‌ডুগাল প্রভৃতি হাস্যরসের উৎপত্তি ও গতিপ্রকৃতি-সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, সংস্কৃত নাটকে এবং প্রহসনে সেই সূত্রগুলিরই বাস্তব প্রয়োগ হইয়াছে।

সংস্কৃত নাটকে হাস্যরসের মূর্তপ্রতীক এবং প্রধান অবলম্বন হইল 'বিদূষক'। ইনি ব্রাহ্মণ নহেন,—মহাব্রাহ্মণ। এই চরিত্রটি হইতেছে সামাজিক ব্যঙ্গের মূল উৎস। ব্রাহ্মণ শুদ্ধাচারী, ধৌতধবল, শুভ্রশুচি, ব্রাহ্মণের আকৃতি সৌম্যসুন্দর, তিনি ভূমিদেব, দেহ-মনঃ-প্রাণে তিনি মর্ত্যভূমিতে দেবতার প্রতীক, জগতের কল্যাণের জন্য তিনি মিতাহারী, মিতাচারী, সৃষ্টির মূল রহস্যানুসন্ধান, অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তাই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন, যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় তাঁহার জন্মগত অধিকার। ব্রাহ্মণ আর যাহাই করুন না কেন, উদর-চিন্তা তিনি করিবেন না, জগৎকে জ্ঞান-কর্ম-সেবায় নন্দিত করিয়া তিনি সমাজের সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন। সেই শ্রদ্ধানত জগৎ তাঁহাকে ভরণপোষণের জন্য কৃতজ্ঞতা-সহকারে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। ব্রাহ্মণ তাহা হইতে সহজ সরলভাবে উদরান্ন-সংস্থানের

সংস্কৃত নাটকে বিদূষক

(Contd. from Page 15)

the stage the author has shown an admirable dramatic skill. It is on the whole clear that though his name has not been given to us, the author of Bhagavadajjukiyam must rank among the great poets.—Bhagavadajjukiyam—A Prahasana of Bodhayana Kavi, by P. Anujar Achan, p. Introduction, XVI.

* The play is not unamusing, though the subject is much too trivial for the pains taken to deal with it.—A. B. Keith, The Sanskrit Drama, p. 184-85.

জন্য দৈনন্দিন যেটুকু লাগিবে, তাহাই গ্রহণ করিবেন, তিনি নিত্যভিক্ষু; তাঁহার না আছে উদরের চিন্তা বা ভোজনলোলুপতা, না আছে সঞ্চয়ের প্রশ্ন। ব্রাহ্মণ কাহারও প্রজা নহেন, তিনি রাজশাসনের বাহিরে, কেননা, তিনি নিজেকে শাসন করিতে জানেন, নিজের অপরাধের শাস্তির জন্য হাসিতে হাসিতে তিনি অগ্নিপ্রবেশ করেন। এই যে ব্রাহ্মণের আদর্শ বিদূষকাখ্য মহাব্রাহ্মণটি তাহা হইতে কতখানি পতিত হইয়াছে! প্রথমতঃ, তাহার আকৃতির বিকৃতি বা ন্যুব্জতা হাসির উদ্রেক করে। দ্বিতীয়তঃ, যজন-যাজন-অধ্যয়নাদির বাড়ির কাছেও সে যায় না, প্রতিটি কথাই তাহার মূর্খতা ধরাইয়া দেয়। আবার, এই মূর্খের মুখেও ব্রাহ্মণজনোচিত উচ্চ দার্শনিকতার বাণী মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়, তাহাই চরম অসঙ্গতির পরিচায়ক বলিয়া হাসির কারণ হয়; অসংবদ্ধ প্রলাপের মত শুনায়। তৃতীয়তঃ, সে রাজার স্তাবক, রাজমনস্তুষ্টির জন্য হাসির অবতারণা করা তাহার কাজ। তবে এই কাজের মধ্যে তাহার হীনতা বা উদ্দেশ্যপ্রবণতা নাই, তাই ইহা ঠিক তোষামোদ নয়। উদরান্নের জন্য বা কাহারও মনস্তুষ্টির জন্য তোষামোদ করিলে নিজের আত্মাই সংকুচিত হয়, এই মহাব্রাহ্মণটি রাজাকে ভালবাসিয়া তাঁহার বয়স্য-হিসাবেই রাজসঙ্গ করে। রাজা তাঁহার ব্রাহ্মণমর্যাদা মানিয়াই চলেন। সরল বিশ্বাসী এই ব্রাহ্মণ রাজাকে ভালবাসিয়া যাহা করে তাহার মধ্যেই অসংগতিজনিত হাসির উপাদান মিলে। এ-হাসি বিদ্রূপের হাসি নয়, ইহা বিশুদ্ধ এবং সূক্ষ্ম সমবেদনা-মিশ্রিত। ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের উদরপরায়ণতার মধ্যে সমাজের প্রতি ভালবাসা-মিশ্রিত ব্যঙ্গ নিহিত রহিয়াছে। বিদূষক-চরিত্রের মধ্য দিয়া সমাজের প্রতি যে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে, তাহা অতি উন্নত স্তরের এবং সংস্কৃত নাট্যকারগণের সংগতি ও শালীনতাবোধের পরিচায়ক। মৃচ্ছকটিক নাটকে বিদূষক-চরিত্র হাস্যরসের অবতারণা না করিয়া উদারহৃদয়, পরোপকারী, দুর্দিনের বন্ধু, সুহৃৎপ্রিয়, সত্যকার ব্রাহ্মণরূপে চিত্রিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের হাতে পড়িয়া বাংলা নাটকে এই বিদূষক-চরিত্রই ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের আদর্শে বিদ্যাহীন, সরলমতি, সহজভক্ত, স্বতঃস্ফূর্ত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহামানবরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও তিনি জগতের ধূলিজালের ঊর্ধ্বে। সংসারের দুর্ভেদ্য মায়া ভেদ করিয়া তিনি সত্যকার নির্মল শান্তির আলো দেখেন ও দেখাইয়া জগৎকে শান্তি দান করেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই সখা বলিয়া আলিঙ্গন দেন।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া মানুষকে আঘাত করিয়া তাহার তুচ্ছতা ও দুর্বলতা তুলিয়া ধরিবার যে প্রয়াস, বিদূষক-চরিত্রে তাহা নাই। বিদূষক মূর্খ হইতে পারে, তাহার ক্রিয়াকলাপ হাসির উদ্রেক করিতে পারে, কিন্তু চরিত্রগত হীনতা বা নীচতা তাহার নাই। ব্রাহ্মণের মর্যাদা রক্ষা করিয়াও যে তাঁহাকে লইয়া কতখানি বিশুদ্ধ আমোদ করা যায়, ভারতীয় সংস্কৃত নাট্যকারগণ তাহা দেখাইয়াছেন। আবার, সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রেণীতে জাত লোককে লইয়া ব্যঙ্গ যে সমাজ সহ্য করিয়াছে, সে সমাজের উদারতাও লক্ষ্য করিবার মতো।

তবে সমাজের নীচস্তরের লোকের চরিত্রগত অসংগতি বা দুর্বলতা লইয়া আমোদমিশ্রিত ব্যঙ্গ সংস্কৃত নাট্যকারগণ করিয়াছেন। রাজপুরুষদের চারিত্রিক অধঃপতনের চিত্রও তাহারা আঁকিয়াছেন। ধর্মের নাম করিয়া নৃশংসভাবে পশুবধ করেন যে শ্রোত্রিয়গণ, তাঁহারাও এই নাট্যকারদের ব্যঙ্গের বস্তু হইয়াছেন। মলিয়ার-ইব্‌সেন-বার্ণার্ড শ-এর নাটকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের প্রতি যে তীব্র ব্যঙ্গবাণ বর্ষিত হইয়াছে, সংস্কৃত নাটকেও তাহার সন্ধান কিছু-না-কিছু অবশ্যই মিলে, তবে তাহা যুগোপযোগী বা পাত্রোপযোগী রকমে।

সংস্কৃত নাটকে নীচস্তরের লোকের চরিত্র-অবলম্বনে হাস্যরস সৃষ্টি

'শকুন্তলা' নাটকের ষষ্ঠ অঙ্ক। মামার জোরে, ভগিনীপতির জোরে চাকুরী, শুধু বর্তমান যুগেই হইতেছে এমন নহে, বোধ হয় আবহমানকাল হইতে কিছু-না-কিছু পক্ষপাতিত্ব চলিয়া আসিতেছে। "দাদার 'ভাই' না হইয়া যদি 'শালা' হইতাম, তবে কপাল ফিরিত," এই অনুযোগ কালিদাসের যুগের লোকেরা করিয়াছেন কিনা জানি না, তবে 'নাগরিক' অর্থাৎ 'নগররক্ষীদের প্রধান'-হিসাবে রাজশ্যালককে আমরা কালিদাসের নাটকে দেখিতেছি! শাসন-ব্যবস্থার প্রতি ইহা কটাক্ষপাত সন্দেহ নাই। ইহার শিক্ষাদীক্ষা, বিদ্যাবুদ্ধিও 'তথৈব চ'। ইতর-জনের ন্যায় এই রাজশ্যালকও প্রাকৃতভাষী, শুধু রাজার স্ত্রীর ভাই হইলেই মূর্খকেও উচ্চপদ দেওয়া যায়। ইনি আবার চরিত্রবান্ কম নন, চক্ষুলজ্জাহীনও ঠিক ততখানি। যে ধীবরটিকে তিনি বাঁধিয়া আনিয়াছেন, নানাপ্রকার ব্যঙ্গ করিয়াছেন, সে-ই যখন রাজার নিকট হইতে অনেক অর্থ পাইতেছে, তখন নাগরিক তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়া তাহার নিকট হইতে অবাধে ঘুষ গ্রহণ করিতেছেন। পুলিশী চরিত্রকে কালিদাস কী অপূর্ব দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন! ইহার

ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। মলিয়ারের নাটকে ব্যঙ্গও এই রাজপুরুষদের লইয়া অনেকখানি চলিয়াছে। রাজপুরুষদের তাহাতে গাত্রদাহ কম হয় নাই। 'শকুন্তলা' নাটকের এই অঙ্কে ব্যঙ্গ জমিয়াছে চমৎকার ভাবে। যিনি ঘুষ খাওয়াকে অপকৃষ্ট কর্ম বলিয়া মনে করেন না, তিনিই আবার ধীবরের বৃত্তির নিন্দা করিতেছেন—'তোর জীবনোপায় অতি বিশুদ্ধ!'—একটি অপকর্মকারী যখন অন্য ব্যক্তির ভাল কাজেরও নিন্দা করে, তখন নিজের গায়ের দিকে তাকাইয়া কথা বলে না—ইহাই একটি চরিত্রগত শ্রেষ্ঠ humour। ধীবরটি ইহার উত্তর দিল আরো চমৎকার হিউমারের দ্বারা। 'কোনো কাজ স্বভাবতঃ বিনিন্দিত হইলেও তাহা ত্যাগ করিতে হইবে—এমন কথা নাই। কারণ, পশু-মারণ কর্মটি নিদারুণ হইলেও শ্রোত্রিয়গণ নির্মমভাবে তাহা করিয়া থাকেন।' যে ধর্মের মধ্যে সর্বজীবে মমত্ববোধ প্রসারিত, সেই ধর্মেই শুধু চিরাচরিত প্রথা-হিসাবে নির্মম আচরণ করা হয়। নীতিবোধের এবং প্রথার মধ্যে ইহা কি চরম অসংগতির পরিচায়ক নয়? আর এই অসংগতিকে আমরা মানিয়া লইতেছি আমাদের ভারতীয় মনের মর্মমূলে আবদ্ধ ধর্মীয় সংস্কারের বশে। তাহা হইলে তথাকথিত প্রথা মানুষকে কতখানি বিচারহীন এবং নির্মম করিয়াছে।

ইংরেজী কমেডীর বহু বিচিত্র বিভাগ থাকিলেও আমরা ইউরোপের দুই প্রধান নাট্যকারের শৈলীর মানদণ্ডে কমেডী-প্রহসনকে দুইটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। রোমক ও ইতালীয় কমেডী এবং খাস ইংলণ্ডীয় হাস্যরসাত্মক নাটকের ধারা শেক্সপীয়ারের কমেডীতে আসিয়া মিলিয়াছে। শেক্সপীয়ার নিপুণ শিল্পী, তিনি প্রাচীন ধারাগুলি হইতে গ্রহণযোগ্য যাহা পাইয়াছেন, তাহা লইয়াছেন, তারপর এলিজাবেথীয় জীবনাদর্শে স্বকীয় অভিনব সৃজনী-প্রতিভার স্পর্শে অনবদ্য রোমাণ্টিক কমেডী রচনা করিয়াছেন। শেক্সপীয়ারের সৃষ্টি তিল তিল আহরণের দ্বারা রচিত তিলোত্তমা। ইহা উপকরণ উপচাইয়া স্রষ্টার সর্জন-মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

ফরাসী নাট্যকার মলিয়ার নাটকে হৃদয়বত্তা অপেক্ষা বুদ্ধিমত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন বেশি। তাই তাঁহার ব্যঙ্গ—তীব্র তীক্ষ্ণ মননশীলতার ব্যঙ্গ। শেক্সপীয়ারের পরবর্তী কালের restoration comedy-র উপর তাই মলিয়ারের প্রভাব বেশি। তাই অতি সংক্ষেপে আমরা যদি বলিতে চাই, তাহা হইলে বলিব, কমেডীকে স্থূলভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়,—শেক্সপীরীয় এবং মলিয়ারীয়।

সংস্কৃত কমেডীগুলির মধ্যে বুদ্ধিপ্রধান ব্যঙ্গ এবং ভাবাবেগমিশ্র কৌতুক পাশাপাশি মিশিয়া রহিয়াছে। কারণ, ভারতবর্ষ চিরদিনই চিন্তা ও অনুভূতির ক্ষেত্রে সমন্বয়বাদী এবং তাহার দৃষ্টিভঙ্গী সামগ্রিক। যে রোমাণ্টিক প্রেমাদর্শ শেক্সপীয়ারের অনেক কমেডীর উপজীব্য, সংস্কৃতের বহু নাটকের অবলম্বন তাহাই। শেক্সপীয়ারের রোমাণ্টিক নাটকের নায়কের মতো সংস্কৃত নাটকের নায়কগণও অনঙ্গ দেবতাকে মহাপ্রভাব বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। শেক্সপীয়ারের রোমিও জুলিয়েটের জন্য প্রাণ দিয়াছে, শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী'র নায়ক রাজা সাগরিকার জন্য নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া জ্বলন্ত অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকের কোনো নায়ক গাছে গাছে নিজের প্রেমপত্র ঝুলাইয়া রাখেন নাই, কিন্তু সব কাজ ভুলিয়া প্রিয়ার চিত্রকলায় নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়াছেন। শেক্সপীয়ারের নাটকে একজনের পরিবর্তে আর একজনকে ধরিয়া লওয়ার (false identity র) জন্য ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত যেমন সৃষ্ট হইয়াছে এবং কৌতুকরস জমিয়াছে, সংস্কৃত নাটকেও তাহার অভাব নাই। 'রত্নাবলী' নাটকে 'বাসবদত্তা'কে রত্নাবলী বলিয়া ভুল করায় নাট্যকাহিনী উলট-পালট হইয়া গেল। 'মৃচ্ছকটিকে'র সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব বলিয়া এখানে প্রসঙ্গতঃ উহার উল্লেখ করিলাম না।

শেক্স্‌পীরীয় কমেডী ও সংস্কৃত কমেডীর সাদৃশ্য

তবে একটা কথা আমরা স্বীকার করিব। ইংরেজী নাট্যাদর্শে আমরা যাহাকে 'কর্ম' বলি, তেমনি ধরনের 'কর্ম' সংস্কৃত নাটকে কম। আর কম বলিয়াই কর্ম-সম্ভাবিত 'চরিত্র'ও সংস্কৃত নাটকে সাধারণতঃ চিত্রিত হয় নাই। এজন্য সংস্কৃত নাটকের দোষ না-দিয়া, আমার মনে হয়, উহাকে উহার নিজের আদর্শেই বিচার করা ভাল। সংস্কৃত আলংকারিকগণ 'রূপক'কেও কাব্য বলিয়াছেন, উহা 'দৃশ্য কাব্য'। ঘটনার জটিলতাকে এড়াইয়া বা 'বিষ্কম্ভক' 'প্রবেশক'-এর মধ্য দিয়া প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়া সংস্কৃত নাট্যকারগণ এমন কতকগুলি নির্বাচিত মুহূর্ত বাছিয়া লইয়াছেন, যাহার মাধ্যমে স্থান-কাল-প্রসঙ্গের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় পাত্রপাত্রীর অন্তরের স্থায়ী ভাব উৎসারিত হইয়া রসাত্মক বাক্যে প্রকাশিত হইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে অক্ষম বা অল্প-ক্ষমতাসম্পন্ন নাট্যকারের রচনায় এই রসস্ফুরণ-ব্যাপারটি নিতান্ত গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হইয়াছে। বাহিরের ঘটনার আঘাতে পাত্রপাত্রীর অন্তরের ভাব উৎসারিত করিতে না পারিয়া তাহারা বহিরঙ্গ শৈলীর এবং ব্যপ্রসিদ্ধ আনুষঙ্গিকের উপর জোর দিয়াছেন বেশি। কোকিল ডাকিলেই

বিরহিণীর প্রাণ ফাটিয়া গিয়াছে। হয়তো ঘটনাপুঞ্জ এবং চরিত্রের সংঘাতে তজ্জন্য পূর্ব-প্রস্তুতি হয় নাই, তাই অনেক সময়ে চরিত্রগুলি নিষ্প্রাণ খেলার পুতুলের সামিল হইয়াছে।

অবশ্য একথাও মনে রাখিতে হইবে যে, সংস্কৃত সাহিত্যে এমন নাটকও আছে, যাহার মধ্যে মানুষের কর্ম চিন্তা-অনুভূতির প্রকাশ অপূর্ব শিল্প-মহিমা লাভ করিয়াছে। কর্মের সংজ্ঞা দিতে গিয়া আয়ুর্বেদাচার্য চরক যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে সংক্ষেপে সুন্দর করিয়া আর কিছু বলা যায় না। তিনি বলিয়াছেন, 'শরীর, বাক্য এবং মনের প্রবৃত্তিই হইল কর্ম'।* বাহিরের কোনো প্রেরণায় অন্তরের সুপ্ত বাসনা-সংস্কার জাগরিত হইল। তাহার ফলে আমার বাহিরের পরিবেশ এবং অন্তরের ধারণা-বাসনা-সংস্কাররাজির মধ্যে আলোড়ন বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। সেইজন্য আমি কিছু বলিলাম বা করিলাম। এই অন্তর-বাহিরের সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং তাহার ফল, এই সবটুকুর সামগ্রিক প্রকাশই হইল নাটকীয় 'কর্ম'। সংস্কৃত নাটকে আমরা কর্মকে সাধারণতঃ পাই 'ফল'-হিসাবে, 'প্রক্রিয়া'-হিসাবে নয়। তাই প্রক্রিয়া হইতে ফলে পৌঁছাইবার সময়ে পাত্রপাত্রীর যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নাটকে আমরা আশা করি, সংস্কৃত নাটকে তাহা পাওয়া যাইবে না। ইহার কারণও আছে। সংস্কৃত নাটক একটা সুনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থার অলংকার-শাস্ত্রের আবেষ্টনীতে জন্মলাভ করিয়াছিল। সমষ্টি-জীবন হইতে ব্যষ্টি-জীবন, রাজার জীবন হইতে দীন ভিখারীর জীবনও সমাজের এই ন্যায়-অন্যায় বা কর্তব্যাকর্তব্যের নীতিকে স্বীকার করিয়া ছিল। চোর চুরি করিতে গেলেও এই নীতিজ্ঞান বিসর্জন দিতে চায় নাই। কার্তিকের পুত্রগণ নিজেদের কার্য সমর্থন করিবার জন্য সব সময়েই 'চৌরধর্মনীতি'র দোহাই দিয়াছে। আর 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যম্' নীতি অনুসরণের ফলে নায়ক-নায়িকাগণ সব সময়েই সমাজের আদর্শস্থানীয় নরনারী হইয়াছেন। ভারতীয় জীবনাদর্শে তাঁহারাই সমাজের আদর্শ নরনারী, যাঁহাদের চরিত্র সুনিয়ন্ত্রিত বা বৃত্তি-প্রবৃত্তিগুলি বশীভূত। কোনো বিশেষ প্রবৃত্তির আবেগে ভাসিয়া গিয়া ন্যায়-নীতি লঙ্ঘন করা বা বিভিন্ন নীতিবোধের মধ্যে ভারসাম্য হারাইয়া ফেলা ইহাদের পক্ষে অসম্ভব এবং অবাঞ্ছিত। এইজন্য সংস্কৃত নাটকে ট্রাজেডীর আবির্ভাব হইতে পারে নাই। প্রবৃত্তি-সংক্ষুব্ধ যে মহাজীবনে

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে ট্রাজেডী নাই কেন?

* কর্ম বাঙ্‌মনঃ-শরীর-প্রবৃত্তিঃ।—চরক সংহিতা, সূত্রস্থানম্‌, ১১।৩৩।

জিজ্ঞাসা অসমাহিত থাকিয়া যায়, সংস্কৃত নাটকে তাহার স্থান নাই। আবার, দৈব-দুর্বিপাকের মাধ্যমে জীবনের যে বিষাদময়ী পরিণতি আসিতে পারে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যে গ্রীক্ ট্রাজেডীর মতো বিয়োগান্ত-নাটক রচিত হইতে পারিত। কিন্তু ভারতীয় জীবনবোধে ইহকাল-পরকাল সাময়িক বিচ্ছিন্ন ঘটনা, এবং মহাকালের অনন্ত লীলা এমনই এক অখণ্ড ঐক্যসূত্রে জড়িত যে, তাহার মধ্যে কিছুই অমীমাংসিত থাকে নাই, তাই ভারতবর্ষে গ্রীক্ ট্রাজেডী সম্ভবপর হয় নাই।

অবশ্য মানবজীবনের বিষাদময়ী পরিণতি-সম্বন্ধে ভারতীয় মনীষিগণ যে অবহিত ছিলেন না, তাহা নহে। তবে জীবনে তাঁহারা ট্রাজেডী চান নাই কিংবা ট্রাজিক চরিত্রকে মহীয়ান্ বা শ্রদ্ধেয় বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাই সাহিত্যেও তেমন ধরনের চরিত্র মর্যাদা পায় নাই। কারণ, ভারতীয় সাহিত্য রসপরিবেশনকে যতই গুরুত্ব দিক না কেন, 'স-হিতত্ব' অর্থাৎ সাহিত্যের মধ্য দিয়া সমাজের কল্যাণ করার দিক্‌টা কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারে নাই। ভারতীয় সাহিত্যিকগণ দেখিয়াছেন, ট্রাজিক চরিত্রগুলি ধূমকেতুর মতো গগন আলোকিত করিয়া উদিত হইয়া বিশ্বজনের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও উহারা নিজেদের আবির্ভাব ও তিরোধানের দ্বারা নিজেদের এবং পারিপার্শ্বিক জগতের কোনো কল্যাণ তো করিতে পারেই নাই, বরং অকল্যাণই করিয়া গিয়াছে। ভারতীয় সাহিত্যিক তাই দুর্যোধন, কংস, জরাসন্ধ, শিশুপালকে দেখিয়াছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে চাহিয়াছেন; রাবণকে আঁকিয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্রকে পূজা করিয়াছেন। কিন্তু কি করিয়া কংস, শিশুপাল, রাবণের উৎপত্তি হয় তাহা তাঁহারা জানিতেন। ইহাদিগকে নায়ক করিলে উৎকৃষ্ট ট্রাজেডী রচিত হইতে পারিত, ভারতীয় সাহিত্যিকগণ সে পথে যানই নাই। 'মণিভূষিত' ফণীর মতো এই শক্তিমান্, বিদ্যালংকৃত দুর্জনদের 'ভয়ংকর' বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ঠিকই জানিতেন, কোনো বিশেষ প্রবৃত্তির বশে, বিশেষ বাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া মানুষ এমনভাবে মরিয়া হইয়া উঠিতে পারে যে, শেষ পর্যন্ত সে নিজের ধ্বংসের পথ নিজেই প্রশস্ত করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "কোনো কিছুর ধ্যান করিতে করিতে পুরুষের তৎপ্রতি 'সঙ্গ' 'সম্যক্ গমনের ইচ্ছা' বা 'পরিপূর্ণভাবে উহা পাইবার বাসনা' হয়," যেমন সীতার রূপমাধুর্য ধ্যান করিতে করিতে রাবণের মনে সীতার সৌন্দর্য-ভোগের বাসনা জাগিয়াছিল। এই 'সঙ্গ' হইতে 'সম্মোহ' বা 'কর্তব্যাকর্তব্য-জ্ঞানহীনতা' দেখা দেয়, সে অবিমৃষ্যকারী হইয়া উঠে। অন্তে উপদেশ দিতে

বা নিষেধ করিলেও সে শোনে না। সীতার রূপলোলুপ রাবণ মারীচের নিষেধ, মাল্যবানের উপদেশ, বিভীষণের অনুনয়, সমস্তই উপেক্ষা করিয়া নিজের বিপদ্ ডাকিয়া আনিল। আর এই সম্মোহ হইতে তাহার চিন্তাজগতে এমন আলোড়নের সৃষ্টি হয় যে, সে আর মাথা ঠিক রাখিয়া, গুছাইয়া কাজ করিতে পারে না, স্মৃতিভ্রংশ এবং বুদ্ধিনাশ তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। সে চলিতে চলিতে হঠাৎ ভুল করিয়া বসে, ভাল করিতে মন্দ করে, তাহা হইতে তাহার বিনাশ সূচিত হয়। এই প্রবৃত্তিতাড়িত চরিত্রগুলি যত জটিল এবং দ্বন্দ্ববহুলই হউক না কেন, ভারতবর্ষে তাহারা শ্রদ্ধা পায় নাই। ইহাদের কর্মকে 'অকর্ম' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, ইহাদের কর্মের 'দিবা'কে অজ্ঞতার অন্ধ-তমসাবৃতা 'নিশা' বলা হইয়াছে।

এই একই কারণে ভারতীয় 'কমেডী' এবং ইউরোপীয় 'কমেডী'র জীবন-বোধে পার্থক্যও রহিয়াছে অনেকখানি। ভারতবর্ষে ফল্স্টাফের সৃষ্টি হয় নাই। দুষ্মন্ত, অগ্নিমিত্র, উদয়ন, চারুদত্ত যে জগতের অধিবাসী, অর্ল্যাণ্ডো, এণ্টনিও, ব্যাসানিও, ফার্ডিন্যাণ্ড্ প্রভৃতি সে রাজ্যের লোক নহেন। সমাজের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের আচরণে এমন কিছু থাকিবে না, যাহার দ্বারা অবর জনগণ অপকৃত হইতে পারে। তাই শ্রেষ্ঠগণের আমোদ-প্রমোদ, হাসি-তামাসা, সব কিছুই নিয়ন্ত্রণের সীমা অতিক্রম করিবে না, সমাজশৃঙ্খলা ভাঙিবে না। কৌতুকমিশ্র অপহ্নব বা বুদ্ধিবিকাশী সুকৌশল প্রতারণা প্রভৃতির মধ্য দিয়া এমন-কিছু তাঁহারা করিবেন না যাহা আদর্শ-হিসাবে গ্রহণ করিয়া অবর জনগণ বিভ্রান্ত বা বিপথে চালিত হইতে পারে। নায়ক-চরিত্রে তাই এমন ভুল বা ছলনা-প্রতারণার আরোপ করা যাইবে না যাহা সত্য-সত্যই তাহাকে দুর্বল প্রতিপন্ন করে। সুতরাং শ্রেষ্ঠ চরিত্রকে অবলম্বন করিয়া ব্যঙ্গ বা হাস্যরস-সৃষ্টির অবকাশ সংস্কৃত নাটকে নাই। সংস্কৃতে রোমান্টিক কমেডীর সৃষ্টি হইতে পারে নায়ক-নায়িকার প্রেম-অবলম্বনে, হইয়াছেও তাই।

শেক্স্পীরীয় কমেডী ও সংস্কৃত কমেডীর জীবনবোধের পার্থক্য

কিন্তু এই প্রেমেরও বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা সংযমহারা প্রেমের উচ্ছ্বসিত বন্যা নয়। নায়ক-নায়িকা প্রেমকেই জীবনের যথাসর্বস্ব করিয়া লয় নাই। সমাজনীতি ধর্মনীতি প্রভৃতিকে মানিয়া লইয়াই তাহারা প্রেমদেবতার পূজা করিয়াছে। এই প্রেমদেবতা অন্ধ কিউপিড্ নন্; রতি-সনাথ 'ভগবান্' অনঙ্গ।

সংস্কৃত সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কমেডী হইতেছে 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্।'

এই নাটকের শৈলী ও প্রেমের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করিব। নাটকের বিষয়বস্তু হইল—তাপস-কন্যার সহিত রাজার প্রেম। রাজ-চরিত্রের গাম্ভীর্য এবং তাপস-কন্যাজনোচিত সংযম উভয়ই আমরা নাটকে আশা করি। নাট্যকার আদ্যন্ত এই দুইটিকে বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মনসিজ দেবতা নায়ক-নায়িকার অন্তরে চাঞ্চল্য জাগাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের আচরণে চাপল্য বা তারল্যের সৃষ্টি করেন নাই, প্রেম লালসায় পর্যবসিত হয় নাই।

নাটকের আরম্ভটি অতি সুন্দর। 'পরিণাম-রমণীয়' সুখকর বিষয়-সমন্বিত কোনো নাট্যের অভিনয় হইতে যাইতেছে, সূত্রধারের উক্তি হইতে আমরা তাহা বুঝিতে পারি। এখনকার দিনগুলি ভাল। অতি যত্নে, আরামে এখন জলে অবগাহন করা যায়। পাটলিপুষ্পের সংস্পর্শে এই দিনে বনবায়ু সুরভি হইয়া উঠিয়াছে। পল্লববহুল তরুচ্ছায়ায় এই দিনে সহজেই ঘুমাইয়া পড়া যায়। পরিণামেও দিনগুলি আনন্দদায়ক। সুতরাং বন-সংশ্রবে, আনন্দে, বিশ্রামে, বিশ্রব্ধ আলাপে দিনগুলি অতিবাহিত করিয়া নায়ক-নায়িকা প্রেম-মিলন উপভোগ করুক। তাহাদের এই মিলনে বিরহ-বিচ্ছেদ কিছু আসিলেও পরিণামে তাহা মিলনের আনন্দে, রাজচক্রবর্তি-লক্ষণযুক্ত সন্তানলাভে রমণীয় হইয়া উঠুক। সূত্রধারের উক্তির মধ্য দিয়া যেমন রাজা দুষ্যন্তের শ্রান্তিহরণ, ক্লান্তিমোচন, বিশ্রামপিপাসু প্রেমার্তির ব্যঞ্জনা হইতেছে, তেমনি নটীর সংগীতের মাধ্যমে শকুন্তলার প্রতিও ইংগিত করা হইয়াছে। প্রেমের মধ্যে ভোগের দিক্ প্রবল হইয়া যাহাতে সুকুমারত্ব এবং কোমলতা নষ্ট না করে, দয়মান নায়ককে সে কথাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে।

প্রস্তাবনার পর নাটকের সত্যকার আরম্ভ। রথারূঢ় অধিজ্যকার্মুক মহারাজ দুষ্যন্ত প্রাণভয়ে পলায়মান মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে প্রবেশ করিতেছেন। মৃগটিকে বধ করিবার জন্য তিনি যখনই শর-সন্ধান করিতে যাইতেছেন, তখনই নেপথ্য হইতে নিষেধবাণী উচ্চারিত হইল, 'হে রাজন্, এটি আশ্রম-মৃগ; ইহাকে বধ করিবেন না।' আশ্রম-পালিতা মৃগাক্ষী শকুন্তলা দুষ্যন্তদর্শনে পুষ্পবাণে আহতা হইবেন, এই নিষেধবাণীর মধ্য দিয়া কি তাঁহারই অদৃষ্টের ইংগিত সূচিত হইল না? নাট্যকার যে সুকৌশলে আমাদিগকে নাট্যকাহিনীর সূচনা ও পরিণতির আভাস দিতেছেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বৈখানস রাজাকে আশীর্বাদ

করিতেছেন,—দুষ্মন্ত পুরুবংশের উপযুক্ত কাজ করিয়াছেন, তিনি বংশের উপযুক্ত গুণসম্পন্ন চক্রবর্তী পুত্র লাভ করুন। এই আশীর্বাণী যেমন নাটকের পরিণতির আভাস দেয়, তেমনি 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' প্রভৃতি স্মৃতিবচন স্মরণ করাইয়া দিয়া দুষ্মন্তের শকুন্তলা সাক্ষাতের প্রতিও ইংগিত করে। কবিত্বপূর্ণ ব্যঞ্জনার মাধ্যমে নাট্যকার কথাবস্তুর উপস্থাপন করিতেছেন।

নাটকটির অঙ্গীরস শৃংগার। প্রথমাঙ্কটি এই শৃংগার-রসের অবতারণায় উৎকৃষ্ট কাব্যগুণ এবং সূক্ষ্ম অথচ সুন্দর নাট্যকলার পরিচয় বহন করে। জলসেচনরত তাপসকন্যাত্রয়কে দেখিয়াই মহারাজ মুগ্ধ হইয়াছেন। শুদ্ধান্তঃপুরে যে সৌন্দর্য দুর্লভ, তাহ' যদি আশ্রমবাসিনীগণের থাকে, তাহা হইলে উদ্যানলতা বনলতা-কর্তৃক দূরীভূতা হইয়াছে। এই সৌন্দর্য প্রশংসা আসক্তির পূর্বলক্ষণ। সমবেদনা প্রেমের সহচরী। অনসূয়ার কথার সূত্র ধরিয়া রাজা মনে মনে আলোচনা করিতেছেন, শকুন্তলার এই স্বভাবসুন্দর দেহকে তপস্কার্য সাধন করাইয় ঋষি নিশ্চয়ই নীলোৎপলপত্র-ধারা দিয়া শমীলতা ছেদন করিতে অধ্যবসায় করিতেছেন। রাজার মনের অবচেতন-স্তরে শকুন্তলার প্রতি যে প্রেম জাগিয়াছে, তাহাই সমবেদনার বাণীতে অভিব্যক্ত হইতেছে। তারপর তিনি ইঁহাকে (শকুন্তলাকে) ভাল করিয়া দেখিয়া লইবার জন্য বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করিতেছেন। এই আত্মগুপ্তির কারণ কি? নিশ্চয়ই অন্তরে জাগরিত প্রেম রাজাকে দুর্বল করিয়াছে, তাই সংকোচ-মিশ্রিত এই সাবধানতা। নাট্যকার সুকৌশলে রাজার এই সম্ভোগ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতেছেন। শকুন্তলা বলিতেছেন, 'সখি অনসূয়ে, প্রিয়ংবদা, আমার বল্কলটি খুব এঁটে বেঁধে দেওয়ায় আমি নড়তে-চড়তে পারছিনে। এটাকে একটু আলগা ক'রে দাও না।' প্রিয়ংবদাও কম যান না। তিনি বলিলেন, 'তোমার যে যৌবন পয়োধর বিস্তার করেছে তার দোষ দাও।' উক্তিটিতে রাজার সুবিধা হইল। তিনি দেখিতেছেন, বল্কল-বসনেও শকুন্তলা অধিক সুন্দরী হইয়াছেন। তাহা ছাড়া, আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। আশ্রমকন্যাগণ যৌবনধর্ম-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞা নহেন; তাঁহারা এক একটি নারী ঋষ্যশৃঙ্গ বা মিরাণ্ডাও নন্। সুতরাং পরবর্তী কালে ইঁহারা দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেমের ব্যাপারে দৌত্যে অংশ গ্রহণ করিলে তাহা আকস্মিক এবং অসংগত হইবে না। শকুন্তলার মনের অবচেতন-স্তরেও দাম্পত্যপ্রেম-সম্বন্ধে সংস্কার ছিল, নাট্যকার তাহাও আমাদিগকে জানাইয়াছেন। অনেক সময়ে দেখা

যায়, অনেক বন্ধ্যাবধূ বিড়ালছানাকে কোলে লইয়া আদরযত্ন করিয়া অতৃপ্ত মাতৃস্নেহ চরিতার্থ করে। যুবতী শকুন্তলা তেমনি নবমালিকাকে সহকারের স্বয়ংবরবধূ করিয়া নিজের স্বয়ংবর বাসনাই অভিব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং তপোবনে আজ দুষ্মন্তের আগমন অসময়ে এবং আকস্মিক নহে। বনজ্যোৎস্না আজ নবকুসুমযৌবনা, সহকার ও স্নিগ্ধপল্লবোদ্‌গমের জন্য উপভোগক্ষম। এই দম্পতীর দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকাইয়া প্রফুল্লা বনজ্যোৎস্নারূপিণী শকুন্তলা আজ কোন্ সহকারের অপেক্ষা করিতেছেন? সে কি মহারাজ দুষ্মন্তের নয়? প্রিয়ংবদা কিন্তু শকুন্তলার মনের কথা বুঝিয়া ফেলিয়াছেন—'বনজ্যোৎস্না যেমন অনুরূপ পাদপে সংগতা হইয়াছে, আমিও কি আত্মানুরূপ বর লাভ করিব না?' শকুন্তলা নিজের মনোভাব গোপন করিবার জন্য বলিলেন, 'এটা তোমার নিজের মনের কথা।'

ব্যঞ্জনা স্পষ্টীকৃত হইল। সুতরাং নাট্যকার আর অগ্রসর হইলেন না। এবারে মহারাজ দুষ্মন্তের ব্যাপার। পুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ মূর্ধাভিষিক্ত বিপ্র তিনি। ঋষির সবর্ণাপত্নীর গর্ভজাত কন্যাকে তিনি বিবাহ করিতে পারেন না, অথচ শকুন্তলার প্রতি তাঁহার মন ছুটিয়াছে কেন? রাজা যে মোহগ্রস্ত নন্, এটা আমরা বুঝিতে পারি। মোহমুগ্ধ ব্যক্তির আত্মবিশ্লেষণের বাসনা খুব একটা থাকে না। দুষ্মন্ত ভাবিতেছেন, এই কন্যা নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ের বিবাহযোগ্যা, কারণ, আমার আর্য মন উহাকে অভিলাষ করিতেছে। কোনো বস্তু-সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হইলে সৎ ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণ-প্রবৃত্তি-গুলিই প্রমাণ।

রাজা যখন স্থিরনিশ্চয় হইলেন যে, কন্যাটি ক্ষত্রিয়ের বিবাহযোগ্যা, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, উহার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া তিনি অন্যায় করিতেছেন না। মানস-শৃংগারের অপূর্ব আয়োজন চলিয়াছে এই অঙ্কটিতে। এই মোহিনী প্রিয়া শকুন্তলার অধর-সুধা-পানের বাসনা জাগিয়াছে রাজার অন্তরে। কিন্তু তাহা সম্ভবপর নয়। ভ্রমরাক্রান্তা শকুন্তলার পলায়ন-প্রচেষ্টা এবং ভ্রমরের তাড়নাকে অবলম্বন করিয়া রাজা নিজেরই মনোভাব ব্যক্ত করিলেন।

নাট্যকার আর একটু অগ্রসর হইলেই তাহা অতিরিক্ত হইত। কালি-দাসের রচনার একটা বড় গুণ যে, তিনি যথাস্থানে থামিতে জানেন। সখীদ্বয় কৌতুক করিয়া বলিলেন, "আমরা তোমাকে পরিত্রাণ করিবার কে? দুষ্মন্তকে স্মরণ কর।" রাজা ভাবিলেন, এই আত্মপ্রকাশ করিবার উপযুক্ত

সময়। কিন্তু তিনি যে এতক্ষণ ধরিয়া সুন্দরী শকুন্তলা এবং তাঁহার সখীদের দেখিতেছিলেন, তাঁহার কথায় তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তিনি যে কথা বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন, তাহা প্রেমিকের কথা নয়, রাজপুরুষের কথা।— 'পুরুবংশীয় নৃপতি বসুমতী শাসন করিতেছেন, শান্তিপ্রিয় মুগ্ধা তপস্বিকন্যার প্রতি অবিনীত আচরণ যে করে, সে কে?' রাজা যেন পূর্ববর্তী ঘটনাবলীর কিছুই জানেন না, তাঁহার আগমন তপোবনে যেন নিতান্ত আকস্মিক। বিপন্না ঋষিকন্যার কাতরোক্তি শুনিয়া তিনি যেন এইমাত্র তপোবনে আবির্ভূত হইয়াছেন।

ঘটনার মোড় ফিরিল। অনসূয়া বলিলেন, 'আর্য, এমন কিছু অহিত হয় নাই, আমাদের এই প্রিয়সখী মধুকরের আক্রমণে কাতরা হইয়াছিলেন।' বলিয়াই তিনি শকুন্তলাকে দেখাইয়া দিলেন। রাজার পক্ষে সুবিধা হইল, তিনি শকুন্তলার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'তপঃ বর্ধিত হ'চ্ছে তো?' ঋষিগণের তপঃ বর্ধিত হইতেছে কিনা, রাজপুরুষের দিক্ হইতে ইহাই হইবে প্রথম জিজ্ঞাসা। দুষ্মন্ত রাজকর্তব্য পালন করিলেন। কিন্তু সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই উক্তিটির মূল্য বিচার করিতে হইবে। জিজ্ঞাসাটি দুষ্মন্তের অন্তরের কথা নয়। কারণ, কিছুক্ষণ আগেই এই সব অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যাকে তপস্যায় নিযুক্ত করার জন্য তিনি মহর্ষি কণ্বকে অনুযোগ করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজকর্তব্য-রক্ষার জন্য দায়ে ঠেকিয়া ঢেঁকি গেলার মতো কথাটি মহারাজ দুষ্মন্তের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আসল জিজ্ঞাসা যে ঐটি নয়, তাহা আমরা একটু পরেই দেখিব। অনসূয়া শকুন্তলাকে অতিথির পরিচর্যার জন্য কুটীর হইতে ফল লইয়া আসিতে বলিলেন। কিন্তু রাজার ইচ্ছা নয় যে, শকুন্তলা চলিয়া যাক্। তিনি বলিলেন, 'আপনাদের মধুর বাক্যেই আতিথ্যের কাজ হইয়াছে।' প্রিয়ংবদা বলিলেন, 'তাহা হইলে এই প্রচ্ছায়-শীতল সপ্তপর্ণ-বেদিকায় একমুহূর্ত বসিয়া পরিশ্রম বিনোদন করুন।' রাজা বলিলেন, 'আপনারাও পরিশ্রান্তা।' অর্থাৎ রাজা চাহেন যে, শকুন্তলা এবং তাঁহার সখীদ্বয়ও যাহাতে চলিয়া না যান।

পারস্পরিক কর্তব্যের অনুরোধে সকলেই উপবেশন করিলেন। শকুন্তলার অবস্থাও রাজার অনুরূপ। শকুন্তলা আশ্রমবিরোধী মনোবিকারের জন্য নিজের মনকে প্রশ্ন করিতেছেন। আগন্তুকের সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে কৌতূহল জাগিয়াছে, অনসূয়ার প্রশ্নে তাহাই প্রকাশ পাইল। শকুন্তলা ব্যাকুলহৃদয়ে রাজার উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। রাজা একেবারে পুরাপুরি

আত্মপ্রকাশ না করিয়া দ্ব্যর্থক ভাষায় উত্তর দিলেন, তবে তিনি যে রাজপুরুষ এবং ধর্মাধিকরণে নিযুক্ত ইহা বুঝা গেল। ওদিকে শকুন্তলা স্বীয় প্রেমপ্রবণতা গোপন করিতে পারিতেছেন না, এবং সখীদ্বয় তাহা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন, "তাত কণ্ব আজ আশ্রমে উপস্থিত থাকিলে 'জীবিত-সর্বস্ব' দ্বারা এই অতিথির সৎকার করিতেন।" মুগ্ধা নায়িকা ধরা পড়িয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কপট কোপ এবং অভিমানের পালা আরম্ভ হইল। শকুন্তলা বলিলেন, 'তোমাদের মনে যা আসছে তাই বল্‌ছ, আমি তোমাদের কথা শুন্‌ব না।'

দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার প্রেমচঞ্চল হৃদয়ের উদ্বেলতা উচ্ছ্বসিত ভাষায় প্রকাশিত না হইলেও আভাসে, ইঙ্গিতে, প্রচেষ্টায় অতি সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। যেখানে উভয় পক্ষেরই বাক্যে, কার্যে, প্রচেষ্টায় সংযম এবং শালীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে, অথচ মনসিজ-দেবতার ক্রিয়া-কলাপ গোপন করিতে চেষ্টা করিয়াও লুকানো যাইবে না, সেখানে কাব্যময় ইংগিত অবলম্বন করা ভিন্ন আর উপায় কি? কর্ম এখানে বাহিরের নয়, অন্তরের, কর্ম স্থূলরূপ হারাইয়া সূক্ষ্ম শক্তিরূপ লাভ করিয়াছে, কারণ, নায়ক-নায়িকাকে অবলম্বন করিয়া যে দেবতার লীলা চলিতেছে, তিনি চিত্তাশ্রয়ী অনঙ্গ।

যাহা হউক, রাজা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত জানিয়া লইলেন। কিন্তু তবুও তিনি আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, ইহাকে অনুরূপ বরে প্রদান করিবার জন্য মহর্ষি সংকল্প করিয়াছেন, তখন আশান্বিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, যাহাকে তিনি এতক্ষণ অগ্নি বলিয়া আশংকা করিয়াছিলেন, তাহা এখন স্পর্শক্ষম রত্ন বলিয়া মনে হইতেছে।

ওদিকে শকুন্তলার অবস্থাও লক্ষ্য করিবার মতো। শকুন্তলা এই প্রসঙ্গে জাতকৌতূহলা। কিন্তু নিজের বিবাহবিষয়ক কথা উত্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া বাহিরে লজ্জাজনিত রোষ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন, 'অনসূয়ে, আমি চলিলাম।' 'কেন?' 'এই অসম্বদ্ধপ্রলাপিনী প্রিয়ংবদা যাহা বলিতেছে, তাহা আর্যা গৌতমীকে জানাইবার জন্য।' গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে নিবারণ করিবার বাসনা রাজার মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু তিনি আত্মবাসনা দমন করিলেন, তবে বুঝিলেন, তিনি শকুন্তলার প্রতি কতখানি আসক্ত হইয়াছেন। দুষ্মন্ত ধূর্তচূড়ামণি, অঙ্গুরীয়-দানে তিনি শকুন্তলাকে ঋণমুক্ত

করিলেন। এই অঙ্গুরীয়-দানের অর্থ সম্পূর্ণভাবে আত্মপ্রেম-নিবেদন। তবুও তিনি আত্মপ্রকাশ করিতেছেন না, কারণ, তিনি এখনও শকুন্তলার মনোভাব জানিতে পারেন নাই। ভারতীয় বিবাহনীতির সবচেয়ে বড় কথা হইল এই যে, নারীই পুরুষকে বর্ণে, বংশে, গুণে, জ্ঞানে 'বর' বা বরণীয় মনে করিয়া মুগ্ধহৃদয়ে তাহার নিকট আত্মনিবেদন করিয়া ধন্য হইবে। তাই তো সে স্বামীর যোগ্য সন্তানের জননী হইবে। মহারাজ দুষ্মন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত শকুন্তলার মনোভাব না জানিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সম্যক্‌ভাবে নিজের ভালবাসাও নিবেদন করিতে পারিতেছেন না। তবে শকুন্তলার প্রতি তাঁহার লোলুপ আকর্ষণ রহিয়াছে, তাহার জন্য তিনি আকারে-ইঙ্গিতে, নিদর্শনে নিজের শ্রেষ্ঠপুরুষত্বের পরিচয় যতটুকু পারেন দিয়া যাইতেছেন এবং অন্যদিকে বিজ্ঞ মনস্তাত্ত্বিকের মতো শকুন্তলাব বাক্য ও প্রচেষ্টায় প্রেমের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া ভাবিতেছেন, শকুন্তলা তাহার প্রতি আকৃষ্টা হইতেছেন কিনা। ইংরেজী wooing এবং ভারতীয় প্রেমনিবেদনে পার্থক্য এইখানে। ইংরেজী নাট্যে সাধারণতঃ নায়কই অগ্রসর হইয়া নারীর নিকট প্রেম নিবেদন করে। প্রেমিকার প্রসাদ্ পাইয়া, তাহার দাস সাজিয়াও, নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করে। প্রেমিকা তাহার প্রতি আকৃষ্টা হইলেও অনেক সময়ে তাহাকে লইয়া খেলা করিবার অবকাশ পায়। নায়ক যে তাহার প্রেম ও সৌন্দর্যের জালে মায়ামুগ্ধ কুরঙ্গের মতো আবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সে একথাও জানে যে, এই বশীকৃত প্রাণীর আর পলাইবার উপায় নাই। তাহাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তীকৃত জানিয়া নায়িকা তাই তাহাকে লইয়া খেলিবার অবকাশ পায়। তাই ইংরাজী নাটকে প্রেম লইয়া খেলা, রঙ্গ বা ছলনার যাদু অনেকখানি চলিতে পারে। নায়ককে বোকা বানাইয়া নায়িকা বা নায়িকার সহচরীবৃন্দ অনেক সময়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সংস্কৃত নাটকে সে অবকাশ নাই। নায়িকা প্রেমে পড়িয়াছে তো মরিয়াছে। যে সম্পূর্ণভাবে নায়কের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া ধন্য হইতে চায়, তাহার খেলা করিবার অবকাশ কোথায়? তাই সংস্কৃত সাহিত্যে 'As You Like It' বা 'Twelith Night' হওয়া সম্ভবপর নহে। সেখানে 'শকুন্তলা', 'রত্নাবলী', 'স্বপ্নবাসবদত্তা' এবং 'মৃচ্ছকটিকই' সম্ভবপর।

যাক্। মনস্তত্ত্ববিদ্ রাজা শকুন্তলার প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁহার অন্তরের ছায়া প্রতিফলিত দেখিতেছেন। তিনি বুঝিলেন, শকুন্তলাও তাঁহার প্রেমে পড়িয়াছেন। 'তিনি আমার কথায় কথা মিলাইতেছেন না, কিন্তু আমি

কথা বলিলে উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। আমার মুখের দিকে তাকাইতেছেন না, অথচ ইহার দৃষ্টি অন্য কিছুতেও নিবদ্ধ নহে।'

দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পূর্বরাগ তাঁহাদের বাক্যে ও কার্যে যথেষ্ট ব্যঞ্জিত হইল। নাট্যকার ইহাকে আর বেশীদূর টানিতে চাহিলেন না। নেপথ্যে ঘোষিত হইল, মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়া-ব্যপদেশে আশ্রমের সন্নিধানে আসিয়াছেন। সুতরাং তপস্বিগণ আশ্রমের প্রাণীদের রক্ষায় যত্নবান্ হইলেন. সখীদ্বয় ও শকুন্তলা কুটীরে গমন করিলেন। শকুন্তলা গমনে একটু বিলম্ব করিলেন এবং রাজার দিকে একটু দৃষ্টিপাতও করিলেন। রাজা আর রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে পারিতেছেন না। তিনি স্থির করিলেন, আশ্রমের সন্নিহিত কোনো স্থানে অনুযাত্রিগণসহ থাকিবেন, শকুন্তলাকে ছাড়িয়া তাঁহার মন চলিতেছে না।

অনেকে অনুযোগ করিয়াছেন, কালিদাসের নাটকে কর্ম নাই। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, কর্ম শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আস্ফালন নয়। যাহারা নিয়ন্ত্রিত-চরিত্র, তাহাদের কর্ম এবং যাহারা প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে, তাহাদের কর্ম এক নয়। স্থিতপ্রজ্ঞ শ্রোত্রিয়ের কর্মের মধ্যে যে সংযম এবং নিয়মানুবর্তিতা থাকে, তাহার জন্য কর্মের বহিরঙ্গ সংঘাতের তীব্রতা অনেকখানি কমিয়া যায়। আবার, অন্তরের মথ্যমান প্রবৃত্তিগুলির তীব্র ঘাত-প্রতিঘাত যে ভিতর-বাহিরকে তীব্র দ্বন্দ্বে আলোড়িত করিয়া বাহিরে কর্মের রূপ গ্রহণ করিবে, এই সমস্ত শ্রেষ্ঠ চরিত্রে তাহাও সম্ভবপর নয়। কারণ, কি করিতে হইবে, তাহাও ইহারা জানেন। তাই 'to do or not to do'র বালাই ইহাদের নাই। আবার, কি করিতে হইবে না, তাহাও ইহারা জানেন, তাই ইহাদের অন্তরের কোনো প্রবৃত্তিই দুর্দমনীয় হইয়া ওঠে না। সংস্কৃত নাটকে তাই ট্রাজেডি নাই।

দ্বিতীয় অঙ্ক। রাজা বিশ্রাম চাহিতেছেন, কারণ, ধ্যান এবং মননের মাধ্যমে এখন তিনি শকুন্তলাকে আস্বাদন করিবেন। কিন্তু এ-বিশ্রাম শুধু রাজাই চাহিতেছেন না, সমগ্র পরিবেশই আজ বিশ্রামের জন্য লালায়িত। বিদূষক এই মৃগয়া-ব্যসনী রাজার সঙ্গে ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত। সেনাপতিও মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, তবুও রাজার মন রক্ষা করিবার জন্য মুখে মৃগয়ার প্রশংসা করিতেছেন। মৃগয়া বন্ধ হইল। আশ্রমের সন্নিধানে জীবহিংসা করা ভাল হইবে না বলিয়া রাজা মৃগয়া নিষেধ করিলেন, কিন্তু এ-নিষেধের মূল কারণ প্রকাশ পাইল রাজার স্বগতোক্তিতে। মৃগের চোখে

তিনি প্রিয়ার বিলোল কটাক্ষ লক্ষ্য করিতেছেন, তাই শর-সন্ধানে প্রবৃত্তি হইতেছে না। রাজা ধীরে ধীরে বিদূষকের নিকট শকুন্তলার কথা বলিলেন, তিনি যে মুগ্ধ হইয়াছেন, তাহাও বলিলেন। কিন্তু কি উপায়ে শকুন্তলা-লাভ সম্ভবপর হইবে ?

উপায় জুটিল। রাক্ষসের আক্রমণ হইতে আশ্রম-রক্ষার জন্য রাজা অনুরুদ্ধ হইলেন। সুকৌশলী নাট্যকার এখানে ঘটনার জটিলতা-সৃষ্টির বেশ কিছু পরিচয় দিয়াছেন। রাজা একমাত্র বিদূষকের নিকটই শকুন্তলার কথা বলিয়াছেন, শকুন্তলার সৌন্দর্যের প্রশংসা করিয়াছেন, কিন্তু তাহা অন্বস্থিত অন্যান্য প্রসঙ্গকে একেবারে কোণঠাসা করিয়া স্ব-প্রকট হইয়া উঠে নাই। অন্যান্য প্রসঙ্গের মতো শকুন্তলার কথাটাও একটা প্রসঙ্গ, বিশ্রম্ভালাপের অঙ্গ। এখন রাজার তপোবনে অবস্থিতির সময়ে বিদূষকও যদি থাকিয়া যায়, তাহা হইলে এই স্থূলবুদ্ধি মহাব্রাহ্মণটি হিতে বিপরীত ঘটাইয়া তুলিতে পারে। তাই ইহাকে সরানোর প্রয়োজন। সুযোগও জুটিল, রাজমাতার ব্রত-পারণের সময়ে পুত্রকল্প এই বিদূষকটি রাজার প্রতিনিধিত্ব করিতে চাহিল। কিন্তু সব চেয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে রাজা আত্মরক্ষার জন্য এখানে একটু মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অন্তঃপুরে যাহাতে শকুন্তলার বিষয়ে কোন্ আলোচনা বা আলোড়ন সৃষ্টি না হয়, সেজন্য তিনি বিদূষককে বলিলেন, শকুন্তলার সম্বন্ধে তিনি এতক্ষণ পরিহাস করিয়াছেন, যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য নয় ; সুতরাং এ বিষয়ে বিদূষক যেন রাজধানীতে কিছু না বলে। ভবিষ্যৎ ঘটনার জটিলতার বীজ এইখানে উপ্ত হইল। পরবর্তী কালে দুর্বাসার শাপে রাজা যখন শকুন্তলার কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলেন, শকুন্তলাও অঙ্গুরীয় দেখাইতে পারিলেন না, তখন বিদূষক রাজাকে পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইয়া দিতে পারিতেন ; কিন্তু সে পথও বন্ধ হইল। সুতরাং নাটকীয় ঘটনার পরিণামমুখী গতির জন্য যে গ্রন্থন-নৈপুণ্য প্রয়োজন শকুন্তলা নাটকে তাহা আছে।

তৃতীয় অঙ্ক দুইটি পিপাসু আত্মার মিলন লগ্ন। বেশি কিছু বলিব না। সুধু একটি প্রসঙ্গের আলোচনা করিব। সখীদ্বয় দুষ্মন্ত-শকুন্তলাকে নিভৃতে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। মুগ্ধা নায়িকা শকুন্তলাও চলিয়া যাইবার জন্য উৎসুক। কিন্তু এতদিন ধরিয়া যে মিলনের আয়োজন হইল, তাহার কি হইবে ? রাজা প্রিয়ার অধরসুধা পান করিবার জন্য তাহার মস্তক উন্নমিত করিলেন। কিন্তু নিয়তির নিষেধের মতো কয়টি কথা ছুটিয়া

আসিল, চক্রবাকবধূ, রজনী উপস্থিত। তাপসী গৌতমী শকুন্তলাকে দেখিতে আসিতেছেন। প্রথম মিলনের পথে এই বাধা সকলের অজ্ঞাতসারে একটি অশুভ ইঙ্গিত করিয়া গেল না কি? এই ইঙ্গিত দুর্বাসার অভিশাপের পূর্বরূপ। গুরুজনের অজ্ঞাতে গান্ধর্ব্যবিবাহে দয়িতের নিকট আত্মসমর্পণ বিপ্রকন্যার যোগ্য কর্ম নয়। উহা ক্ষত্রিয়ের আচরণ। শকুন্তলা বিশ্বামিত্রের কন্যা হইলেও আশ্রমে পালিতা। প্রবৃত্তির বশে আশ্রমধর্ম ভঙ্গ করা তাঁহার উচিত হইতেছে না। নাট্যকার এই সত্যকে স্পষ্ট করেন নাই। ইঙ্গিতে সারিয়া দিয়াছেন। স্পষ্ট করিলে নাট্যকারের উপদেশাত্মক ভঙ্গী প্রকট হইয়া নাট্যগুণ ক্ষুণ্ন করিত।

বহু-আলোচিত মধুর চতুর্থাঙ্কটি বাদ দিলাম। পঞ্চমাঙ্ক-সম্বন্ধে কিছু বলিব। মহারাজ দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন। এই অঙ্কে শকুন্তলার আগমন হইবে। হংসপদিকার নেপথ্য-সঙ্গীতে অনুযোগের সুর ভাসিয়া আসিল। নূতনের পিয়াসী 'অভিনবমধুলোলুপ' রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলা-রূপিণী 'চূতমঞ্জরী'কে চুম্বন করিয়া অন্তঃপুরের পদ্মিনী-সংস্পর্শে আসিবামাত্রই কি করিয়া ঐ চূতমঞ্জরীকে ভুলিলেন? কিন্তু ভুলিয়া থাকা তো 'ভোলা' নয়। 'বিস্মৃতির মর্মে' বসিয়া ঐ বিগত দিনের প্রেম রাজার 'রক্তে দোলা' দিতেছে। নাট্যকার বলিতে চাহেন, রাজা ইচ্ছা করিয়া শকুন্তলাকে ভোলেন নাই। দুর্বাসার অভিশাপই ইহার কারণ। দুঃখের কারণ কিছু উপস্থিত না থাকিলেও এই গানে রাজার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। রাজা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না, এমন হয় কেন। ইহা যে শকুন্তলার প্রেমেরই অজ্ঞাত আকর্ষণ, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তিনি ভাবিতেছেন, সঙ্গীতের আকর্ষণে আমাদের বোধের অতীত জন্মান্তরীণ কোনো সংস্কারকে মনে মনে স্মরণ করিয়াই বোধ হয় মানুষের এই অবস্থা হয়। শকুন্তলার প্রেমের স্মৃতিও আজ মহারাজ দুষ্মন্তের নিকট জন্মান্তরীণ সংস্কারের মতো বিস্মৃতির অতলগর্ভে বিলীন।

ভূমিকার এই সঙ্গীতটি সমস্ত অঙ্কটিকেই করুণ-গম্ভীর করিয়াছে। অদৃষ্টদেবতার সাবধানী আকাশবাণীর মতো একটি গভীর বিষাদের বার্তা আভাসিত হইয়া উঠে হংসপদিকার এই গানে। আমরা বুঝিতে পারি, অনঙ্গদেবতার লীলায়, হাস্যোচ্ছল পরিবেশে যে দুইটি নরনারীর মিলন হইয়াছিল, তাহাদের জীবনে হয়তো গভীর বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে। আবার, এই গানটি দুষ্মন্তের সমস্ত অপরাধ ক্ষালন করিয়া

দিয়াছে, রাজা ইচ্ছা করিয়া শকুন্তলাকে ভোলেন নাই। তাই এই অঙ্কে তিনি যখন নির্মমভাবে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখনও আমরা তাঁহাকে দোষ দিতে পারি না। বিস্মৃতা শকুন্তলা এখন তাঁহার নিকট পরস্ত্রী, সুতরাং পৌরব-অন্তঃপুরে সে গ্রহণীয়া নহে; তবে শকুন্তলাকে গ্রহণ না করিলেও দুষ্যন্ত রাজকর্তব্য ভোলেন নাই, তিনি সংশয়ে পড়িয়াছেন। শকুন্তলার সহিত তাঁহার যে কোন সম্বন্ধ হইয়াছিল, ইহাও তিনি যেমন মনে করিতে পারিতেছেন না, তেমনি ঋষিশিষ্যগণের অনুরোধে ইঁহাকে গ্রহণ করিলে তিনি পরস্ত্রীগ্রহণের পাপে লিপ্ত হইবেন কিনা তাহাও ভাবিতেছেন। এই সংশয় হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তিনি পুরোহিতের পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন। পুরোহিত যে পরামর্শ দিলেন, তাহাতে সহজেই মীমাংসা হইত। কিন্তু রাজচরিত্র এবং শকুন্তলার চারিত্রিক বিশুদ্ধি-সম্বন্ধে জনসাধারণের একটি কৌতূহল-পূর্ণ জিজ্ঞাসা রহিয়া যাইত, সেইজন্য শকুন্তলাকে মারীচের আশ্রমে বিরহের অগ্নিপরীক্ষায় বিশুদ্ধ হইতে হইয়াছে।

ইউরোপীয় নাট্যাদর্শে অবশ্য এই পঞ্চমাঙ্কেই 'শকুন্তলা' নাটকের যবনিকা-পতন হইতে পারিত, নাটকখানি হইত ট্র্যাজেডী। কিন্তু কালিদাস সে অবকাশ রাখেন নাই। নাটকের পরিণতির দৃশ্য, অর্থাৎ সপ্তমাঙ্ক আকস্মিক নহে। রাজচক্রবর্তী ভরতের আবির্ভাবের জন্যই দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেমলীলার আয়োজন হইয়াছিল। কুমার-জননী গৌরীর তপস্যার সগোত্র হইয়া শকুন্তলার প্রেম দেখা দিয়াছে, পার্থক্য এই যে, গৌরী তপস্যা করিয়াছিলেন সন্তানলাভের আগে, আর শকুন্তলার তপস্যা সন্তানলাভের পরে।

একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মতো; প্রথম অঙ্ক হইতে তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত রাজা শকুন্তলার দেহাশ্রিত অনঙ্গের পূজা করিয়াছেন। কিন্তু রাজসভা হইতে শকুন্তলা বিদায় লইবার পর রাজা প্রেমের যে স্মৃতি-চর্বণা করিতেছেন, তাহার মধ্যে দেহরতির দিকটি প্রবল নহে। কাম অনঙ্গ হইয়া মনকে আশ্রয় করিয়াছে, প্রেম এখানে দেহাতীত। না জানিয়া অদৃষ্টের দোষে তিনি শকুন্তলার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার জন্য চলিয়াছে অনুশোচনা। আর সমস্ত বাসনার অন্তরালে যে একটি উপযুক্ত আত্মজ-লাভের বাসনা কাজ করিয়া যাইতেছিল, সমুদ্রব্যবহারী সার্থবাহ অপুত্রক 'ধনমিত্রের'র প্রসঙ্গে রাজা তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন—এই অনপত্যতা কষ্টকর। বহুধন এবং বহু পত্নী থাকিলেও ইহা হইতে

পারে, এই অনপত্যতার দুঃখ রাজা দুষ্যন্তের নিজের। সুতরাং বসন্তের ফুল থেকে গ্রীষ্মের ফল পর্যন্ত দেখানোর যে আয়োজন নাট্যকার করিয়াছেন, নাটকীয় ঘটনা-সংস্থাপন ও চরিত্র-চিত্রণের দিক্ দিয়া তাহা সার্থক।

শৈলী-সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিয়া 'শকুন্তলা' নাটক শেষ করিব। ভারতীয় নাট্যরচনার সার্থক উদাহরণ 'শকুন্তলা'। প্রথমাঙ্ক হইতে সপ্তমাঙ্ক পর্যন্ত নাটকের ঘটনার স্রোত অব্যাহত ভাবে চলিয়াছে। নাটকের ঘটনা হইবে 'গোপুচ্ছাগ্রসমন্বিত'। 'গোপুচ্ছাগ্রসমন্বিত' কথাটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়া 'দশরূপকে'র টীকাকার ধনিক' বলিয়াছেন, যেমন গরুর লেজের অগ্রভাগের কোন লোম লম্বা, কোনটি বা খাট হয়, নাটকের অঙ্কগুলিও সেইরূপ হইবে। ব্যাখ্যাটি খুব উপযুক্ত বলিয়া মনে হয় না, আমার ধারণা অন্যরূপ। গরুর লেজের অগ্রভাগের লোমগুলি বিশেষ একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করিয়া প্রথম উদ্গত হইতেছে, তারপর ক্রমেই উহারা ফাঁপিয়া ফুলিয়া মাঝখানে আসিয়া বেশ ছড়াইয়া পড়িতেছে। আবার ঐ মধ্যবিন্দু হইতে একটি দুইটি করিয়া সমগ্র লেজটিকে পরিণামে একটি সূক্ষ্ম বিন্দুতে পর্যবসিত করিতেছে। নাটকের ঘটনাও তাই। বিশেষ একটি ক্ষুদ্রতম উপযুক্ত মুহূর্তকে কেন্দ্র করিয়া নাটকের ঘটনার আরম্ভ হয়। আপন অন্তর্নিহিত আবেগে ঐ ক্ষুদ্রতম ঘটনাই মাঝখানে ছড়াইয়া পড়ে। ক্রমে এমন একটি অবস্থায় আসে, যখন সে আপন পরিধিকে আর বাড়াইতে পারে না, তখন হইতে সুরু হয় falling action বা ঘটনার পরিণামমুখী অবনমনের পালা। যে বাসনাসংস্কারের বীজ হইতে নাটকীয় ঘটনার আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ ফল-সম্ভাবনায় নাটকের শেষ হয়। নাটকের প্রথমাঙ্কে তাপসদের আশীর্বাণীই বলিয়া দেয়, দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেম অন্য-সংস্কার-নিরপেক্ষ যৌবন-বিলাস নয়। এই যৌবনধর্ম রূপ-সম্ভোগের মধ্য দিয়া রূপাতীত কল্যাণকে বরণ করিবার জন্য। তাই পঞ্চমাঙ্কে শকুন্তলার বিদায়ে নাট্য-কাহিনীর চরমোত্থান সূচিত হইলেও উহাই পরিণতি নয়।

নাটকের ঘটনা-সংস্থাপনের বৈশিষ্ট্য

'শকুন্তলা'-নাটকের, এক কথায় প্রায় সমস্ত সংস্কৃত নাটকের সম্বন্ধে একটি কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে। চরিত্রগুলি নিজেদের চিন্তা-কর্ম-অনুভূতির ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকীয় ঘটনা যতখানি সৃষ্টি না করে, তাহার চেয়ে বেশি করিয়া তাহারা ফুটিয়া উঠে বহিরাগত ঘটনা ও পরিস্থিতির অবলম্বনে। অথচ ঐ ঘটনাগুলিকে কার্যকারণহীন accident বলা যাইবে না, কেননা চরিত্রের সঙ্গে উহারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

সংস্কৃত নাটক 'খ্যাতবৃত্ত' অর্থাৎ পরিচিত কাহিনী লইয়া রচিত হওয়ার ফলে কাহিনী-সৃষ্টির দিকে খুব বেশি জোর দেওয়ার দরকার হয় না। জানা কাহিনীর সূত্রমাত্র ধরিয়া পাত্রপাত্রীকে এমন কতকগুলি পরিস্থিতির (situation) সম্মুখীন করা হয়, যে পরিস্থিতিগুলি অবলম্বন করিয়া উহারা নিজেদের অন্তরস্থিত ভাবরাশির রূপ দিতে পারে, ঐ ভাবগুলিকে নিজেরা আস্বাদন করিতে পারে এবং বিভাব-অনুভাবাদির মাধ্যমে সাধারণীকৃত করিয়া অন্যকে উপভোগ করাইতে পারে। সংস্কৃত নাটকের ঘটনা তাই রসাশ্রয়ী, কাব্যধর্মী। ইংরেজী নাটকের ভাব বা sentiment ঘটনাকে মুখ্য রাখিয়া ঘটনার অবলম্বনেই প্রকাশিত হয়। 'রত্নাবলী', 'উত্তররামচরিত' প্রভৃতি নাটকে অবশ্য ঘটনা গৌণ হইয়া মৃত কাহিনীতে পর্যবসিত হইয়াছে। তাই ঐ নাটকগুলির রসস্ফুরণ হয় বেশি কাব্যধর্মী হইয়াছে, না হয় গতানুগতিকতাদোষে দুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু 'শকুন্তলা' নাটকে কাব্যময়ত্ব, অর্থাৎ হৃদয়গত ভাবোচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি, এবং ঘটনাসৃষ্টি, বা ভাবকে কর্ম-চিন্তা-অনুভূতির সমঞ্জসীভূত প্রকাশের মাধ্যমে রূপদান, পরস্পরের অনুপূরক হইয়াছে। কোনটি কোনটিকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই। মনন অনুভূতিকে খর্ব করে নাই, অনুভূতি মননকে অভিভূত করে নাই। পারিপার্শ্বিক জগৎ ও জীবন, বাহিরের ঘটনা-প্রেরণা সব কিছু মিলিয়া দুষ্যন্ত-শকুন্তলাকেই বিকশিত করিয়াছে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনো চরিত্রকে তিনি গ্রহণ করেন নাই। প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে তিনি সুন্দর চরিত্রকেও অতিরিক্তজ্ঞানে নির্মমভাবে বিসর্জন দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে যাহারা 'কাব্যের উপেক্ষিতা', নাট্যে তাহারা মোটেই উপেক্ষিতা নয়। সপ্তমাঙ্কাবধি অনসূয়া-প্রিয়ংবদার কোনো প্রয়োজন নাটকে ছিল না। শুধু শকুন্তলার সুখের দিনের সাক্ষী হিসাবে এই চরিত্র দুইটিকে শেষ পর্যন্ত টানাটানি করিলে 'শকুন্তলা' নাটকের সপ্তমাঙ্ক যাত্রার 'ক্রোড়-অঙ্ক' হইয়া দাঁড়াইত। কিন্তু মহাকবি, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার কালিদাস, বাঙালী যাত্রাওয়ালা ছিলেন না।

সংস্কৃত নাটকের ঘটনার বৈশিষ্ট্য

'শকুন্তলা'র নাটকীয় বৈশিষ্ট্য

কালিদাসের এই তপোবনাশ্রয়ী ভাবাদর্শ ইউরোপীয় নাটকে মিলিবে না বলিয়া দুঃখ করিয়া লাভ নাই। অথবা কালিদাসের নাটকের এই জীবনধর্ম না বুঝিয়া ইহাকে গালাগালি করিয়াও কোনো ফল হইবে না। কালিদাসের নাট্যশৈলী অননুকরণীয়। বাংলা সাহিত্যে ইহার অনুসরণ হয় নাই; হওয়া

সম্ভবপরও নহে। কিন্তু সমাজের অবর জনজীবনের আলেখ্য অতি নিপুণভাবে আঁকিয়াছেন 'মৃচ্ছকটিক'কার মহারাজ শূদ্রক। পাশ্চাত্ত্যদেশের অনেক সমালোচক তাঁহাকে শেক্‌স্‌পীয়ারের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে 'মৃচ্ছকটিক'কে মোটামুটিভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ লঘুনাট্য এবং গণনাট্য বলা যায়।

দশবিধ রূপকের মধ্যে 'নাটিকা' এবং 'প্রকরণ'কে আমরা লঘুনাট্য বলিয়া ধরিতে পারি। উহাদের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে আমরা অন্ততঃ অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইব।

প্রথমে উহাদের বিষয়বস্তু-সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক্। নাটকের বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট; পরিচিত। নাট্যকারের স্বাধীন কল্পনার অবকাশ সেখানে খুব বেশি একটা নাই। অবশ্য কালিদাস ও ভবভূতির মত নাট্যকার প্রাচীন প্রসিদ্ধ কাহিনীকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নিজেদের ইচ্ছামতো করিয়া সাজাইয়াছেন, নাটকের রসস্ফুরণের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু 'প্রকরণ' এবং 'নাটিকা'র কাহিনী-রূপায়ণে নাট্যকারের স্বাধীনতা অনেক বেশি। তিনি ইচ্ছামতো কাহিনী সৃষ্টি করিতে পারেন। উদয়ন-বাসবদত্তা-রত্নাবলীর কাহিনী নাট্যকার শ্রীহর্ষ এবং ভাস বিভিন্ন ভাবে বলিয়াছেন।

হাস্যরস-প্রধান লঘুনাট্যের কাহিনী সাধারণতঃ গণজীবন-সমাশ্রয়ী। উহাতে পাত্রপাত্রীর ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য যতখানি ফুটুক না কেন, ঐ চরিত্রগুলি হইবে সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি। আপামর-জনসাধারণের জীবনই লঘুনাট্যে আসর জুড়িয়া বসে। বর্তমানের ক্ষণিকতা, ঐহিকতা এই সকল নাটকে প্রাধান্য পায়। সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে এই জীবনটুকু উপভোগ করিতে পারিলেই চলিল। লঘুনাট্যের পাত্রপাত্রীর অন্তরে বৃহত্তর বা ব্যাপকতর কোনো জীবনজিজ্ঞাসা নাই। এই ধরণের নাটকে কোনো বিশেষ একটি চরিত্র প্রধান হইয়া অন্য চরিত্রগুলিকে আড়াল করে না বা ছায়া-মাত্রে পর্যবসিত করে না। প্রকরণে যে জীবন রূপায়িত হয়, তাহাও মুখ্যতঃ এই। প্রকরণের ইতিবৃত্ত কবিকল্পিত, ইহা মর্ত্যলোকবাসিগণের চরিতাশ্রয়ী। প্রকরণে শৃঙ্গাররসই অঙ্গী। ইহার নায়ক জীবনের ভোগের দিক্‌টিই কামনা করিবে; মোক্ষমার্গী হইবে না। ধনাদির অর্জনে ব্যাপৃত থাকিবে। * * * সুতরাং শেক্‌সপীরীয় রোমান্টিক কমেডীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংস্কৃত প্রকরণের বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য অতি নিবিড়, জীবন-প্রেরণাও একই ধরনের। আবার শেকসপীরীয় রোমান্টিক কমেডীর মধ্যে স্ত্রীচরিত্রের প্রাধান্য দেখা

লঘুনাট্যের বৈশিষ্ট্য

রোমান্টিক কমেডী, নাটিকা ও প্রকরণ

যায়, সংস্কৃত নাটিকায়ও তাই। তাহা ছাড়া নাটিকা হইবে 'বহুগীতনৃত্য-বাদ্য-রতি-সম্ভোগাত্মিকা'। * * * সংস্কৃত-প্রকরণের মতো গণতন্ত্রী নাটক ভারতবর্ষে আর সৃষ্ট হয় নাই। সমাজের সর্বস্তরের লোকের জীবনকে প্রকরণে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রেমিক অমাত্যপুত্র এবং সার্থবাহ ব্রাহ্মণ হইতে সুরু করিয়া চোর, দ্যূতকর, গণিকা প্রভৃতি প্রকরণে স্থান পাইয়াছে। এক কথায় গোটা সমাজজীবন প্রকরণে মূর্ত হইয়াছে।* সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকরণ 'মৃচ্ছকটিক' অবলম্বন করিয়াই আলোচনা করিব।

আরম্ভেই নাট্যকার বলিয়া দিতেছেন, এই নাটকের বিষয়বস্তু মুখ্যতঃ সমাজের নীচের তলার লোকের জীবন। চারুদত্ত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি বণিগ্-বৃত্ত্যবলম্বী, সুতরাং বৃত্তিতে তিনি বৈশ্যের সগোত্র। তিনি যুবা। নায়িকা বসন্তসেনাও সমাজের নিম্নস্তরবাসিনী গণিকা। নাটকের বর্ণিতব্য বস্তু হইতেছে এই বণিগ্‌ধর্মী যুবা ব্রাহ্মণ এবং সুন্দরী বসন্তসেনার প্রেম। আইনের দোষ এবং খলের স্বভাব এই প্রণয়কাহিনীকে জটিল করিয়া তুলিবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অদৃষ্টের জয় হইবে। জাগতিক উন্নতি-অবনতি ও জীবনের ভোগের দিক্‌ই এই নাটকের মুখ্য অবলম্বন। তাহার জন্য ছলনা-প্রতারণা, বুদ্ধি-কৌশল, চারিত্রিক নীচতা-কদর্যতা প্রভৃতির অবতারণা এই নাটকে করা হইয়াছে। কিন্তু এই অবর জনগণের প্রতি নাট্যকারের সমবেদনার অন্ত নাই। আধুনিক বিংশ শতকের যে মনোবৃত্তি সমাজের নীচস্তরের অবহেলিত মানবতার প্রতি সমবেদনা জানাইতেছে, শত শত বৎসর পূর্বে মহারাজ শূদ্রক সেই মনোবৃত্তির অধিকারী ছিলেন, ইহা কম বিস্ময়ের কথা নহে। নিয়তি-নিপাতিত ভাগ্যপ্রতিহত মানুষ উদরান্ন-সংস্থানের জন্য অনেক সময়ে হীনকর্ম করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ঐ কর্ম কখনই তাহার নীতিবোধ বা মনুষ্যত্ববোধের দ্বারা সমর্থিত নয়। পরিস্থিতি ও পরিবেশ তাহাদিগকে ঐরূপ করিতে বাধ্য করিয়াছে মাত্র, উপযুক্ত জীবনোপায় মিলিয়া গেলে তাহারা যে-কোন মুহূর্তে পূর্বকর্ম এবং আচরণ ত্যাগ করিতে পারে। অন্তরে অন্তরে ইহারা দীন বা হীন নয়, মহনীয় মনুষ্যত্ব ইহাদের অন্তরে বর্তমান ; কৃতজ্ঞতাবোধ বা বন্ধুত্বের জন্য ইহারা প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে। জানিয়া শুনিয়া ইহারা যখন কোনো হীনকাজ করে, তখনও ইহাদের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত থাকে। ব্রাহ্মণ শর্বিলক চোর, প্রেম তাহাকে

মৃচ্ছকটিকের আলোচনা

* Viswanatha's Sahityadarpana, ed. by Kumudranjan Ray, Chap. VI-এর ৩৫৩ পৃষ্ঠা, ৩৬৭-৩৬৮ পৃষ্ঠার টীকাংশ দ্রষ্টব্য।

চুরি করিতে বাধ্য করিয়াছে, কিন্তু সুপ্ত বা ভয়ার্তকে সে আঘাত করে না। আবার যে মদনিকার প্রেমে পাগল হইয়া সে চুরি করিয়াছে, গোপপুত্র বন্ধু আর্যকের বিপদের মুহূর্তে সেই প্রিয়তমাকে ত্যাগ করিয়া সে বিপদের মুখে ছুটিয়া চলিল। পাটলিপুত্রনিবাসী গৃহস্থসন্তান সংবাহক চারুদত্তের পরিচর্যা করিত, অদৃষ্ট তাহাকে দ্যূতক্রীড়া করিতে বাধ্য করিয়াছে। অদৃষ্টের বিপাকে পড়িয়াই সে বৌদ্ধসন্ন্যাসী হইল। কিন্তু বসন্তসেনা যে তাহাকে দশ-সুবর্ণ-দানে মুক্ত করিয়াছিল, তাহা সে ভোলে নাই। অদৃষ্টের নির্যাতনে ভুগিয়াও যে মানুষ অন্তরের মহনীয়তা বিসর্জন দেয় না, 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের ইহাই চরম শিক্ষা। ভারতীয় সভ্যতার এক বিশেষ যুগের পূর্ণ প্রাণ-স্পন্দন অনুভূত হয় 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে। ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সমাজের সর্বস্তরের লোকই এই নাটকে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য-মহিমার পতনোন্মুখ অবস্থা কল্পনা করা যায় 'মৃচ্ছকটিক'-এ। ব্রাহ্মণ চারুদত্ত যজন-যাজন-অধ্যয়নাদি কৌলিকবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক উন্নতির জন্য বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈশ্যপল্লীতে বাস করিতেছেন। ব্রাহ্মণের গণিকাপ্রীতি নিন্দনীয় না হইয়া বরং সমাদৃত হইতেছে। ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরে গণিকা 'বধূ'-রূপে সাদরে বৃত হইতেছে। বর্ণাশ্রম-ধর্মের মধ্যে যে অনেকখানি শিথিলতা আসিয়া গিয়াছে, 'মৃচ্ছকটিক' নাটক তাহার প্রমাণ। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে ত্যাগব্রতী, উঞ্ছবৃত্তিক ব্রাহ্মণ ঐশ্বর্য-পিপাসু হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার প্রাচীন ঐতিহ্যের ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান। চারুদত্ত ঐশ্বর্য কামনা করেন, নিজের ভোগের জন্য নয়। পরিজনপালন, অতিথিসৎকার, দান প্রভৃতির জন্য গৃহস্থ চারদত্তের অর্থের প্রয়োজন। ব্রাহ্মণোচিত বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য, ত্যাগশীলতা এবং হাস্যমুখে আত্মবিসর্জনের শক্তি চারুদত্তেব সহজাত। মৃত্যুপথযাত্রী চারুদত্ত যখন নিজের গলার যজ্ঞোপবীত খুলিয়া পুত্র রোহসেনের গলায় পরাইয়া দেন, তখনই বুঝিতে পারি, সুপ্রাচীন কালের ভারতীয় ব্রাহ্মণের মহিমা তাঁহার মধ্যে কতখানি জাগ্রত। চারুদত্ত দরিদ্র, খলের ষড়্‌যন্ত্রে নির্যাতিত, মৃত্যুর সম্মুখীন, তাঁহার সব গিয়াও সবচেয়ে বড় সম্পদ্‌ ছিল,—এতদিন তাঁহার সুনাম নষ্ট হয় নাই। শকারের ষড়্‌যন্ত্রে, অবিমৃষ্যকারী রাজার দণ্ডাদেশে হতমান চারুদত্ত আজ সর্বহারা। উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্রকে দিবার তাঁহার আর কিছুই নাই, নিজের গলার যজ্ঞসূত্র পুত্রকে দান করিয়া তিনি এই শিক্ষাই দিয়া গেলেন, ঋষির বংশধর রোহসেন যেন বিপদে-আপদে পিতার নীতিই অনুসরণ করে, মৃত্যুর মুহূর্তেও চারিত্রিক মহিমা বিসর্জন না দেয়।

চারুদত্তের এই আচরণ নীতিভ্রষ্ট রাজধর্মের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ। সমগ্র 'মৃচ্ছকটিক' জুড়িয়া এই প্রতিবাদ চলিয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, ব্রাহ্মণ চারুদত্তের প্রতিনায়ক রাজশ্যালক কাপুরুষ, দুশ্চরিত্র, মূর্খ সংস্থানক। নিরপেক্ষ বিচারের ভার যাহাদের হাতে, সেই ন্যায়াধীশগণও এই মূর্খের দ্বারা প্রভাবিত, রাজা নিষ্ক্রিয়, নাটকে তিনি নেপথ্যেই রহিয়াছেন। রাজধর্মই যখন শিথিল, অনাচারদুষ্ট, তখন ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত সমস্ত প্রজা নির্যাতিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? অবধ্য নিরপরাধ ব্রাহ্মণ সাধারণ অপরাধীর ন্যায় যখন বধ্যভূমিতে নীত হন, তখনই বুঝিতে হইবে বিধাতার রুদ্র অভিশাপে এই রাজবংশের অবসান হইবে, সুতরাং নাটকের শেষে গোপপুত্র আর্যকের রাজ্যপ্রাপ্তি আকস্মিক নহে। বিপ্লবের দিনে এমনই হইয়া থাকে, সমাজের তথাকথিত উচ্চ, যাঁহারা ক্ষমতার অভিমানে ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দেন, তখন নিয়তির অমোঘ বিধানে তাঁহারা নীচে নামিয়া আসেন এবং নির্যাতিত নিপীড়িত জনগণের মধ্য হইতে তখন ত্রাতৃরূপে কোন শক্তিমান্ চরিত্রবানের আবির্ভাব হয়। মনে পড়ে মহাত্মা যীশুর বাণী—'The last shall come first and the first shall come last.' ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন—'প্রবর্তেতাধরোত্তরম্'—(মনু—৭-এর ২১)। শেক্সপীয়ার যেমন তাঁহার নাটকে সর্বস্তরের নরনারীকে লইয়া একটি ছোটখাটো সম্পূর্ণাঙ্গ জগৎ সৃষ্টি করেন, মহারাজ শূদ্রকও তাহাই করিয়াছেন। জীবনের ব্যাপ্তি ও চরিত্রের বৈচিত্র্য 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে মিলিতেছে। চারুদত্তের ধর্মপত্নী ধূতা দেবী, গণিকা বসন্তসেনা এবং মদনিকা মিলিয়া ভারতীয় নারীত্বের পরিপূর্ণ মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

ব্রাহ্মণপত্নী ব্রাহ্মণী 'ধূতা'দেবী; তিনি স্বামীর সহধর্মিণী,—বিলাস-সঙ্গিনী নহেন। তাই চারুদত্ত-বসন্তসেনার মিলন-মহোৎসবে তিনি আপন অন্তঃপুরের গোপন কক্ষে আবদ্ধ রহিয়াছেন। স্বামীর এই অন্যনারীর প্রতি আসক্তিতে তিনি প্রতিহিংসাময়ী ক্ষত্রিয়নারীর ন্যায় আচরণ করেন নাই। 'রত্নাবলী'র 'বাসবদত্তা'র এবং 'মৃচ্ছকটিকে'র 'ধূতাদেবী'র মধ্যে যে পার্থক্য, তাহা ব্রাহ্মণী এবং ক্ষত্রিয়ার পার্থক্য। অধিবিন্না ধূতা দেবী অতি সহজে স্বামীর এই প্রেম-ব্যাপার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কারণ, তিনি জানেন, প্রেম নিছক কামজনিত দেহবিলাস নয়, প্রেমের চরমপরিণতি মাতৃত্বে, তাই 'ধূতা'দেবী রোহসেনের মাতা।

ধূতাদেবী ও বাসবদত্তার তুলনা

বসন্তসেনা নৃত্যময়ী, লাস্যময়ী, লাবণ্যবতী, রূপাজীবা। কিন্তু নারী-জীবনের একটি চরম সত্য তাহার জীবনে মূর্তিলাভ করিয়াছে। প্রেমের মূল 'চারিত্র্য' বা চরিত্রমাধুর্য,—বলাৎকার নয়। নারী শ্রেষ্ঠ পুরুষের ভালবাসাই কামনা করে। 'শ্লথপ্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা' সে কখনও সহ্য করে না। তাই শকারের কাতর প্রেমনিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অগাধ ঐশ্বর্য এবং তাহার দেওয়া রত্নালঙ্কার সে পদাঘাতে অপসারিত করিয়াছে। চরিত্রবান্ মহান্ চারুদত্তের জন্য সে প্রাণ বিসর্জন করিতে এতটুকুও কুণ্ঠিত নহে। ঋগ্বেদের ঋষি বলিয়াছেন, 'এক শ্রেণীর নারী আছে যাহারা সামান্য পণ্যের দ্বারা ক্রীতা হয়। কিন্তু তিনিই ভদ্রা বধূ হইতে পারেন যিনি জনসমুদ্রের মধ্য হইতে নিজের সমানধর্মা পুরুষকে নিজেই বরণ করিয়া লন।* বসন্তসেনা গণিকা হইয়াও এই ভদ্রা বধূশ্রেণীর নারী। তাহার অন্তরের সুপ্ত মাতৃত্বের পরিচয় পাই রোহসেনকে গাড়ী গড়াইবার জন্য স্বর্ণালঙ্কার দান করায়। 'মৃচ্ছকটিক' নামের বোধ হয় ঐখানেই সার্থকতা। চারুদত্তের প্রেম এবং বিলাসের শেষ পরিণতি ঐ বালক রোহসেনের অস্তিত্বে; পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' এই স্মৃতিবাক্যের সাক্ষী ঐ বালক রোহসেন। বসন্তসেনার সৌন্দর্য-বৃদ্ধিকারী অলংকার তাই বালকের ক্রিয়ার উপকরণ হইয়া ধন্য হইতে চায়।

বসন্তসেনা

মদনিকা বারবিলাসিনী বসন্তসেনার পরিচারিকা। রাণীর আদরে থাকিয়াও সে দরিদ্র শর্বিলকের বধূ হইবার বাসনা ত্যাগ করিল না। 'ভট্টিনী'র নিকট হইতে বিদায় লইয়া যাইতে তাহার চোখে জল আসিতেছে সত্য, কিন্তু পরমাকাঙ্ক্ষিত বধূজীবনের আকর্ষণ ও প্রলোভনও সে ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। তাই শর্বিলক বন্ধুপ্রীতির আকর্ষণে, কর্তব্যের অনুরোধে যখন নবপরিণীতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে চায়, তখন মদনিকা বিনা দ্বিধায় বলিয়া উঠে, আমাকে গুরুজনদের নিকট রাখিয়া যাও। দারিদ্র্যের মধ্যে বিরহিণী বধূ গুরুজনের সেবা করিয়া 'বধূ'-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবে, তবু বিলাসের প্রাচুর্যে বারাঙ্গনাগৃহে অবস্থান করিবে না। এই 'বধূ'-জীবনের মর্যাদা বসন্তসেনাও উপলব্ধি করিয়াছে। তাই বিদায়ের প্রাক্কালে মদনিকা তাহাকে প্রণাম করিতে চাহিলে সে বলিয়া উঠিল,—'তুমি এখন আমার প্রণম্যা হইলে।'

মদনিকা

* কিয়তী যোষা মর্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পণ্যসা বার্যেণ।
ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎসুপেশাঃ স্বয়ং সা মিত্রং বনুতে জনে চিৎ ॥
—ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ২য় অনুবাক, ১১শ সূক্ত।

নায়ক চারুদত্তের চরিত্র বিকশিত করিবার জন্য নাট্যকার যেমন 'শকার'-চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি শকারকে বুঝাইবার জন্য 'বিট'-চরিত্র রচনা করিয়াছেন। চারুদত্ত 'শকার'-চরিত্রের প্রতিবাদ এবং 'বিট' ঐ চরিত্রের সমালোচক। শকার নারীরূপলোলুপ কাপুরুষ, কামমুগ্ধ হইয়া সে বসন্তসেনাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, আর চারুদত্ত বসন্তসেনার প্রেমের অনুরোধেই নীরবে মৃত্যুবরণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রেমের শেষ পরিণতি যে প্রেমাস্পদের জন্য আত্মবিসর্জন, নাট্যকার তাহা দেখাইয়াছেন।

শকার ও বিট

ঘটনা ও চরিত্রবিশ্লেষণের দিক্ দিয়া আমরা দেখিতেছি, নাট্যকার বিশেষ কোনো অবাস্তব আদর্শের রূপায়ণের জন্য বাস্তব জগৎকে অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু সমাজের সর্বস্তরের জীবন-সম্বন্ধে তাঁহার যে বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল তাহার দ্বারা নাটকখানিকে তিনি সত্য-সমুজ্জল করিয়াছেন। ইউরোপীয় বিশেষ করিয়া শেক্স্পীরীয় নাটকে দৃষ্ট ঐহিকতার সঙ্গে ভারতীয় আদর্শ-বাদী জীবনের সমন্বয় হইয়াছে মৃচ্ছকটিক নাটকে। সংস্কৃত নাটকে এমনটি আর কোথাও হয় নাই। শেক্সপীয়ারের কোনো কোনো কমেডীর সূচনায় একটা বিষাদের সুর থাকে (যেমন 'As You Like It', 'Comedy of Errors' প্রভৃতিতে)। আবার কোনো কোনো নাটকের ঘটনা হাস্যমুখর পরিবেশে সূচিত হইয়া হঠাৎ গুরুগম্ভীর হইয়া উঠে, বিষাদময়ী পরিণতির ইঙ্গিত দেয়। দর্শক আন্দোলিত হৃদয়ে নাটকের চরম পরিণতির অপেক্ষা করে (যেমন 'The Merchant of Venice' নাটকে)। 'মৃচ্ছকটিক' নাটকেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। চারুদত্তের দারিদ্র্যের বর্ণনায় নাটকের আরম্ভ। আড্ডাধারী দর্দুরক-সংবাহক প্রভৃতির বাক্য ও কার্য নাটকের এই বিষাদবিধুর ভাবকে অনেকখানি দূরে সরাইয়া রাখিয়া হাস্যমুখর পরিবেশে নাট্যকাহিনীকে গতিদান করিতেছিল। গোপবালক আর্যকের পলায়ন একটি গুরুতর ঘটনা। রাজপরিবর্তনের মতো গুরুতর ঘটনা ইহার সঙ্গে জড়িত, কিন্তু এই ঘটনাও লঘু হইয়া গিয়াছে বীরক ও চন্দনকের বাক্য ও কার্যের দ্বারা। নাটকে যেখানে যেখানে অতিগাম্ভীর্য আসিতে পারিত, চরিত্রগুলিকে আকর্ষণীয় করিয়া, তাহাদের হাস্যরসাত্মক কার্য ও বাক্যের মোহনীয়তার মাধ্যমে নাট্যকার সেই সকল স্থানে জীবনের লঘু ছন্দের মন্দাক্রান্তা তাল সৃষ্টি করিয়াছেন। কেবল নাটকের একেবারে শেষের দিকে বধ্যভূমিতে নীয়মান চারুদত্তকে কেন্দ্র করিয়া বিষাদময়ী পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু সেই বিষণ্ণতাও পরিণামে ঠিক ততখানি

আনন্দে পরিসমাপ্তি লাভ করে। শেক্স্‌পীয়ারের অনেক নাটকের মতো শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক'ও একখানি serio-comedy।

শৈলীর দিক্‌ দিয়া 'মৃচ্ছকটিক' নাটক বিশেষভাবে আলোচ্য। হাস্যরস-পরিবেশনের সুপরিচিত প্রায় সব কয়টি উপায়ই নাট্যকার প্রয়োগ করিয়াছেন। নাট্যারম্ভে চারুদত্ত-বিদূষকদের কথোপকথন নাটকের ভূমিকা মাত্র। প্রকৃত সূচনা হয় বিট ও নীচজাতীয় দাসগণসহ শকার পলায়মানা বসন্তসেনাকে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিলে। এই আরম্ভের দৃশ্যেই নাট্যকার তাঁহার কবিত্বশক্তি এবং হাস্যরসর্জনী প্রতিভার সার্থক পরিচয় দিয়াছেন। পলায়মানা বসন্ত-সেনাকে বর্ণনা করিয়া 'বিট' শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করিয়া চলিয়াছে, শ্লোকগুলি আমাদিগকে শকুন্তলা-নাটকে দুষ্মন্তের মৃগানুসরণবর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্লোকের ছন্দের মধ্যে পলায়মানা, ভীতা, ত্রস্তা বসন্তসেনার গতিভঙ্গীর নৃত্যমুখর অনুকরণ যেমন হইয়াছে, তেমনি পলায়মানা বসন্তসেনার চিত্রও অতিজীবন্ত হইয়াছে। চিত্র, সঙ্গীত এবং বসন্তসেনার গতিনৃত্য, অভিনয়ের মাধ্যমে অতীন্দ্রিয় রসকে ইন্দ্রিয়গোচর করিয়া তুলিতেছে। দৃশ্যকাব্যের এইখানেই সার্থকতা। কিন্তু এই অতি উচ্চাঙ্গের কবিত্বপূর্ণ শ্লোকগুলির পার্শ্বে শকার এবং তাহার দাসগণের সংলাপের তুলনা করিলে নাট্যকারের হাস্যরস-সৃষ্টির ক্ষমতা আমরা বুঝিতে পারিব। বিটের বর্ণনায় বসন্তসেনা 'ব্যাধভীতা হরিণী'র মতো 'প্রব্যাকুলিত-মানসা' হইয়া 'নৃত্যবিশদ-চরণদ্বয়' ক্ষেপণ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন—রক্তাম্বর-পরিহিতা সুন্দরী ভয়ে 'বাল-কদলীর মতো' বিকম্পিত-দেহে পলায়ন করিতেছেন, তাঁহার বিলোল অঞ্চল পবনে দুলিতেছে। ইহার পাশেই শকারের কবিত্বহীন, বাচালতাপূর্ণ উক্তির স্থান হইয়াছে। 'দাঁড়াও বসন্তসেনা, দাঁড়াও। স্খলিতচরণে তুমি কোথায় পলাইতেছ? ভয় নাই; আমার মাথা খাও। অঙ্গাররাশির উপর পতিত মাংসখণ্ডের মতো আমার অসহায় হৃদয় কামের দহনে দগ্ধ হইতেছে।' শেষের উপমাটি কি বীভৎস-রসাত্মক! আদিরসের সম্পূর্ণ বিরোধী। শকারের বীভৎস রুচি এবং চরিত্রের কদর্যতাই শুধু এই উপমার দ্বারা ব্যঞ্জিত হইতেছে না, বিটের শ্লোকের ভাবগাম্ভীর্য এবং ধ্বনি-মাধুর্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ বৈপরীত্য বা অসঙ্গতি সৃষ্টি করায় শ্লোকটি হাস্যরসের উপকরণ হইয়াছে, তারপর 'লাবণ্যশেষ কুন্তী' উপমায় এই অসঙ্গতি চরমে উঠিয়াছে। এইভাবে বিটের শ্লোকগুলি যতই উৎকৃষ্ট হইতেছে, শকারের শ্লোকে মূর্খতা, গালাগালি এবং উপমার অসঙ্গতি ততই বাড়িয়া

যাইতেছে। হাস্যরসের মূল উপাদান যে অসঙ্গতি, নাট্যকার তাহা ভালভাবেই বুঝিতেছেন।

বসন্তসেনা ভয়ে ভীতা হইয়া নিজ পরিচারিকা ও পরিচারকদের ডাকিতেছেন। বাচাল শকার বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বলিতেছে, কাহাকে ডাকিলেও রক্ষা নাই, দুঃশাসন-সম সে বসন্তসেনার কেশাকর্ষণ করিবে এবং সুতীক্ষ্ণ অসির আঘাতে তাহার মস্তক ছেদন করিবে। শকারের ইহাই প্রেম-নিবেদনের ভাষা। এ ভাষা যে একমাত্র তস্করের হইতে পারে, বসন্তসেনা তাহাই বুঝিলেন। তিনি নিজের অলঙ্কারগুলি দিয়া এই তস্করের হাত হইতে রক্ষা পাইতে চাহিলেন। শকার বলিল, সে দেবপুরুষ বাসুদেব, সে প্রেম চায়। না হাসিয়া উপায় কি? চক্রধারী মহাবীর বাসুদেব কাপুরুষের হাত হইতে শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদিতা রুক্মিণীকে রক্ষা করিয়াছিলেন নারীর প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য। কাপুরুষ শকার বলপূর্বক নারী-নির্যাতন করিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে প্রেমিক বাসুদেবের সহিত তুলনা করিতেছে, ইহা অপেক্ষা অসঙ্গতি আর কি হইতে পারে? এই অসঙ্গতি চরমে উঠিয়াছে অষ্টম অঙ্কে জীর্ণোদ্যানে বসন্তসেনার সহিত শকারের পুনরায় সাক্ষাতের সময়ে।

রোমক ও শেক্সপীরীয় কমেডীর হাস্যরস-সৃষ্টির আর একটি বিশেষ উপায় হইল false identification বা একের পরিবর্তে অন্যকে ধরিয়া লওয়া। প্লটাসের কমেডীতে কাহিনীর অসঙ্গতি ও জটিলতা-সৃষ্টির ইহা একটি প্রধান উপায়। সংস্কৃত নাট্যকারগণ এই উপায়টির সঙ্গত প্রয়োগ করিয়াছেন।

রোমক ও শেক্সপীরীয় কমেডী এবং সংস্কৃত নাটকের সাদৃশ্য

'রত্নাবলী' নাটকে 'বাসবদত্তা'কে 'সাগরিকা' বলিয়া ভুল করায় সমস্ত পরিস্থিতি পরিবর্তিত হইয়া জটিল আকার ধারণ করিল। মৃচ্ছকটিকেও ইহার জন্য হাস্যরসের সৃষ্টি হইয়াছে এবং ঘটনার মোড় ফিরিয়াছে। বসন্তসেনা-ভ্রমে শকার মদনিকার কেশাকর্ষণ করিয়াছে, এই ভ্রম যতক্ষণ না ভাঙে, ততক্ষণই হাস্যরসের অবকাশ থাকে। মদনিকা কাতরকণ্ঠে বলিতেছে, 'মহাশয়েরা করেন কি।' কিন্তু শকারের ভ্রম ভাঙিল না। সে বলিতেছে, 'দেখ পণ্ডিত, দই-সরের লোভে বেড়াল যেমন গলার স্বর বদলায়, এ বেটিও তেমনি আপনার গলার স্বর বদ্‌লেছে।' অসঙ্গতি ঘনীভূত হয় যখন বিটও এ কথা বিশ্বাস করিয়া বলে, 'বিচিত্র কি? রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া যে নানাবিধ নাট্যকলা অভ্যাস করিয়াছে, সেই বঞ্চনাপণ্ডিত এখন স্বরের নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে।'

কিন্তু শূদ্রকের কৃতিত্ব সুধু অসঙ্গতিজনিত হাস্যরস-সৃষ্টিতেই নয়। হাসির সঙ্গে বিষাদের, তারল্যের সঙ্গে গাম্ভীর্যের অপূর্ব মিশ্রণ করিয়াছেন নাট্যকার মহারাজ শূদ্রক। বিদূষককে দেখিয়া শকার বলিতেছে,—'এটা ঠিক নয়···এটা উচিত নয় যে এখন চারুদত্ত গরীব হয়ে গেছে ব'লে একজন পরপুরুষ তাঁর গৃহে এসে ঢুকবে।' বাক্যটি dramatic ironyর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সুখ-দুঃখের বান্ধব বয়স্য মৈত্রেয়। শকারকে দেখিয়া এই বাক্যটি তাঁহারই উচ্চারণ করা উচিত ছিল। মৈত্রেয় মদনিকার অপমানকে চারুদত্তের অপমান বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। হাস্যচটুল পরিস্থিতি এক-মুহূর্তে বিষাদ-গম্ভীর হইয়া উঠিল। বিট চারুদত্তের নাম শুনিয়া ক্ষমা চাহিয়া প্রস্থান করিল।

'মৃচ্ছকটিক' নাটকে যেমন ভারতীয় সমাজের ত্যাগমুখী আদর্শবাদী অভিজাত-জীবন এবং বস্তুমুখী, ভোগপিপাসু গণজীবনের সমাবেশ ও সমন্বয় হইয়াছে, তেমনি গুরুগম্ভীর নাট্যাদর্শের সহিত লঘুনাট্য-রচনারীতিরও মিলন ঘটিয়াছে। তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সংস্কৃত নাটকে যে অতিকাব্যত্ব নাটককে গীতিকবিতায় ভারাক্রান্ত করে, মৃচ্ছকটিক নাটকে তাহার প্রকাশ কোথাও কোথাও থাকিলেও নাটকটি মুখ্যতঃ কর্মাশ্রয়ী। চারুদত্তের দারিদ্র্যজনিত অনুশোচনা, বসন্তসেনা-চারুদত্তের মিলনে বর্ষাবর্ণন প্রভৃতির বেলায় নাটকীয় সংলাপ কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। এইটুকু কাব্যের অবকাশ সংস্কৃত নাট্যে স্বীকার করা হইয়াছে, ইউরোপীয় নাট্যাদর্শে যদিও চরিত্র ও কর্মের সহিত অসম্পৃক্ত কাব্য সর্বথা পরিত্যাজ্য। কিন্তু সমাজের অবর-জন-জীবনের রূপায়ণে নাট্যকার এই কাব্যিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই বা প্রশ্রয় দেন নাই। জীবনধারণের জন্য চিরচঞ্চল গণজীবনে কাব্যের অবকাশ কোথায়? তাই 'মৃচ্ছকটিক' নাটকে সমাজের এই নীচের তলার লোকেদের জীবন বাস্তবতায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের বর্তমান যুগের গণজীবনের মতোই উহা তাই এখনও জীবন্ত রহিয়াছে।

মৃচ্ছকটিক নাটকে গণজীবনের স্বরূপ

শ্রীহর্ষের 'রত্নাবলী' রোমান্টিক প্রেমমূলক মিলননাট্য। উহার মধ্যে ঘটনার জটিলতা বা বৈশিষ্ট্য থাকিলেও উচ্চাঙ্গের কবিকৃতি বা চরিত্রমহিমা দৃষ্ট হয় না। শেক্‌স্‌পীরীয় রোমান্টিক কমেডীগুলির সঙ্গে উহার তুলনার ব্যর্থ প্রয়াস করিব না। সংস্কৃত রোমান্টিক প্রেমনাট্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'শকুন্তলা'। তারপর লঘুনাট্য এবং গুরুগম্ভীর নাট্যশৈলীর মিলনাদর্শ-হিসাবে আমরা

মৃচ্ছকটিকের নাম করিলাম। এই দুইখানি সংস্কৃত নাটক আপন বৈশিষ্ট্যে অতুলনীয়। এবার সংস্কৃত প্রহসনের আলোচনা করিয়া দেখিব, ভারতীয় প্রতিভা সাহিত্যের এই শাখায় কতখানি উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

'প্রহসন' প্রকৃষ্টভাবে হাসাইয়া তোলে বা হাসির খোরাক যোগায়। বিশুদ্ধ আমোদ বা কৌতুকের জন্য আমরা যেমন হাসি, তেমনি ব্যঙ্গেও হাসিয়া থাকি। পরিস্থিতি, পরিবেশ, বাক্য, কার্য ও চিন্তার অসঙ্গতি থেকেই যে কৌতুকহাস্যের উৎপত্তি হয়, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। ব্যঙ্গের হাসির উৎপত্তি হয় সাধারণতঃ ব্যক্তি বা সমষ্টির, এককথায় সমাজের, দোষত্রুটি-সংশোধনের জন্য সমালোচনা-মনোবৃত্তি হইতে। ব্যক্তির বা সমাজের যে আচরণে কল্যাণ-বোধ ক্ষুণ্ণ হয়, আমরা তাহা চাই না বলিয়াই সামান্যতম নিষ্ঠুরতার আঘাতে সেগুলি দূরীভূত করিতে চাই। ঐ অকল্যাণকর অসঙ্গতির বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ সহনশীল। উহারা অসঙ্গত, ক্ষতিকর কিন্তু একেবারে সত্তাবিধ্বংসী নয় বা মহান্ অনর্থের সংঘটক নয়। তাহা হইলে আমরা উহা সহ্য করিতে পারিতাম না, আর সহ্য করিতে পারিতাম না বলিয়াই তাহা লইয়া হাসাও সম্ভবপর হইত না। এই সহনশীল ত্রুটী বা অসঙ্গতি হইতেই ব্যঙ্গহাস্যের উৎপত্তি।

ব্যঙ্গ হাসির বৈশিষ্ট্য

এই ব্যঙ্গবস্তুগুলি যখন সহনশীলতার মাত্রা বজায় রাখিয়া সাহিত্যে স্থান পায়, তখন উহারা উৎকৃষ্ট প্রহসনের বিষয়বস্তু হয়। সংস্কৃত প্রহসনে কৌতুকহাস্যের সঙ্গে এই ব্যঙ্গহাস্যের অবাধ মিশ্রণ হইয়াছিল। তাই সংস্কৃত প্রহসনসাহিত্যে প্রথমদিকে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কিন্তু অর্বাচীন কালের সংস্কৃত প্রহসনে আক্রমণাত্মক মনোবৃত্তি বাড়িয়া গেল। তাই বেশীর ভাগ প্রহসনই অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ এবং প্রচারাত্মক হইয়া দাঁড়াইল। লেখক তাঁহার রচনায় নিজেকে নির্লিপ্ত, নিরপেক্ষ দ্রষ্টার আসনে আর বসাইয়া রাখিতে পারিলেন না। নিজের রচনায় তিনি রূঢ় সমালোচকরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। 'হাস্যার্ণব', 'লটকমেলকম্' প্রভৃতি এই জাতীয় প্রহসন।*

'লটকমেলকম্' উন্নতশ্রেণীর প্রহসন নহে। তবুও ইহার আলোচনা করিব। কারণ, বাংলা সাহিত্যের সত্যকার আদি নাটক বা প্রহসন 'কুলীন-কুলসর্বস্বের' উপর ইহার শৈলীর প্রভাব অনেক। রামনারায়ণ 'লটকমেলকম্'

* Though our latter প্রহসনs show an extremely low state of the society, our earlier ones as represented by মত্তবিলাস and ভগবদজ্জুকীয়ম্ are dignified in a way inspite of the lower characters figuring therein—The types of Sanskrit Drama, D. R. Mankad, pp. 136.

প্রহসনের সহিত শুধু পরিচিতই ছিলেন না, ইহার দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে করা নিতান্ত সঙ্গত হইবে। রামনারায়ণ সমাজের অনাচার এবং কুপ্রথার নির্মম সমালোচনা করিয়াছেন, সমাজের তথাকথিত শ্রেষ্ঠদের চারিত্রিক দুর্বলতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। 'লটকমেলকম্' প্রহসনেও তাহাই দেখা যায়। রামনারায়ণের সমালোচনা যেমন তীক্ষ্ণ ভাষায় সমাজের কদর্যতার নগ্নরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছে, 'লটকমেলকম্'-রচয়িতা শঙ্খধরও তাহাই করিয়াছেন।

কুলীন-কুলসর্বস্বের উপর লটকমেলকের প্রভাব

সুরাপানে এবং বেশ্যাসক্তিতে গোটা সমাজ মগ্ন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ধনী, শ্রেষ্ঠী হইতে আরম্ভ করিয়া নগ্ন কাপালিক পর্যন্ত এই ব্যসনে ডুবিয়া আছে। ইহাদের লইয়াই 'লটকমেলকম্' প্রহসনের রচনা। দন্তশূল-গ্রাম-নিবাসিনী দন্তুরা-নাম্নী কুট্টনী এই প্রহসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রহসনের আরম্ভেই দন্তুরা বলিতেছে,—এখন বসন্তসময় উপস্থিত, দশদিক্ পক্ষিকূজন-মুখরিত। সুতরাং কুট্টনীগিরি করিয়া তাহার শিকার ধরার উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। সে আব্রাহ্মণচণ্ডাল সকলেরই সর্বনাশ করিয়াছে। যাহার যাহা শেষ সম্বল, সকলই তাহার ঘরে বাঁধা পড়িয়াছে। দরিহরা-গ্রামনিবাসী তপস্বী 'অজ্ঞানরাশি' এখনও তাহার বন্ধকীকৃত ভূতিভাজন গ্রহণ করে নাই। হগ্‌গউলী-গ্রামী দিগম্বর 'জটাসুর' তাহার পিচ্ছিকা চাহিয়া লয় নাই। গুণ্ডিওয়াল-গ্রামবাসী মহামহোপাধ্যায় 'সভাসলি' তাহার রত্নকরণ্ডিকা বন্ধক রাখিয়া গিয়াছে। ডুণ্ডৌলি-গ্রামবাসী নিরক্ষর ফুক্কমিশ্রের শাস্ত্রপুস্তক প্রবাহে পড়িয়াছে। হাড়িবাড়ি-গ্রামবাসী নিরক্ষরপুত্র জন্তুকেতু নামক মহাবৈদ্যের ঔষধকরণ্ডিকা মূষকের দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। ...বগউল-গ্রামের ঝগড়া-পসার টঙ্কশ্রেষ্ঠীর লেখসম্পুটিকা প্রবাহে পতিত হইয়াছে। অর্থাৎ এই কুট্টনীর বশীকরণ-মন্ত্রে সমাজের সর্বস্তরের সর্বনাশ হইয়াছে, ইহাতে তাহার আনন্দের সীমা নাই। আবার যে লোকগুলির এইরূপ সর্বনাশ হইল, তাহাদের প্রতি দর্শকের সমবেদনার উদ্রেক হয় না। কারণ, এইরূপ অদৃষ্টফল তাহাদের চরিত্রের দ্বারা অর্জিত। যিনি 'তপস্বী' তিনি 'অজ্ঞানরাশি'—'জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা'র স্পর্শ তিনি শতহস্ত দূর হইতে এড়াইয়া চলিয়াছেন। যাঁহার শাস্ত্রগ্রন্থ বাঁধা পড়িল, তাঁহার পেটে ডুবুরী নামাইলেও 'ক-অক্ষর' খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। আর মহামহোপাধ্যায় 'সভাসলি'? তাঁহার মহামহো-পাধ্যায় উপাধিটি বোধ হয় কুলক্রমাগত,—স্বোপার্জিত গুণ তাঁহার মূর্খতা

এবং লাম্পট্য। ঘটক কুলব্যাধির সহিত মহামহোপাধ্যায় 'সভাসলি' দন্তুরার দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি 'মদনমঞ্জরী'-নাম্নী বারবিলাসিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন, দন্তুরার কৃপায় তিনি 'মদনমঞ্জরী'র প্রসাদ পাইলে ধন্য হইবেন। সভাসলির দাম্পত্যজীবন অতিমধুর, স্বামীর চরিত্রের এই দিক্‌টি জানিতে পারিলে ধর্মপত্নী 'কলহপ্রিয়া' তাঁহাকে মধুর আপ্যায়ন জানাইবেন সন্দেহ নাই। এখানে আসিবার আগে একদফা প্রেমনিবেদন এই দম্পতীর হইয়া গিয়াছে। কুলব্যাধি দন্তুরাকে বলিতেছে,—অয়ি দন্তুরে, কাজ কলহপ্রিয়ার সঙ্গে ইঁহার দশনাদশনি, নখানখি, হস্তপদাদির মহাযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তারপর দর্বীখণ্ডে, তারপর অলাতখণ্ডে, তারপর পীঠিকায়। তারপর হাঁড়ি দিয়া উপাধ্যায়কে পিটাইয়া বাহির করিয়া দিয়াছে।

এই তো গেল মহামহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণের চরিত্রচিত্রণ এবং দাম্পত্য-জীবনের বর্ণনা। এইবার চিকিৎসক মহাবৈদ্যের চরিত্র। বিদ্যাবুদ্ধিহীন মনুষ্যত্ববর্জিত চিকিৎসক জন্তুকেতু, তাহার চিকিৎসাব্যবস্থার বর্ণনা সভাসলি করিতেছেন।

'কাশি হইয়াছে গলায় সেক দাও। আমজ্বরে প্রচুর ঘৃত-দুগ্ধ পান করিবে। রক্তামাশয়ে পেটে আগুনের সেক দাও। অতিসারে পথ্য হইতেছে সক্তুমিশ্র কর্কটী। চোখের অসুখে ক্ষারচূর্ণ প্রয়োগ কর। জন্তুকেতু এই সকল উপচারের দ্বারা যমাড়ম্বর তরুণায়িত করিয়া থাকে।

চরক-সুশ্রুতাদি চিকিৎসা-শাস্ত্র জন্তুকেতুর একেবারে কণ্ঠস্থ। কারণ জন্তুকেতুর মতে চরকের অভিমত এই যে,—যে কোনো তরুর মূল যে কোন কিছুতে পেষণ করিয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিবে ; তাহাতে যাহা হইবার তাহাই হইবে।

মহাবৈদ্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া লেখক এইবার ব্রাহ্মণপণ্ডিতের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। ফুঙ্কক মিশ্র রাঢ়ীয় বচনরচনা উদ্ধার করিয়া বলিতেছেন, ইনি ব্যাকরণ জানেন না, কাব্যে ইনি পরিশ্রম করেন নাই, শ্রুতিতে আচমন করেন, ভট্ট-বার্ত্তিকে স্নান করেন, তর্কশাসনকে চণ্ডালবৎ পরিত্যাগ করেন, নৈয়ায়িকগণকে অপটু মনে করেন, রাঢ়ীয়-পণ্ডিতগণ অতি গদগদ-কণ্ঠে প্রাভাকর শ্রবণ করেন।

সংসারত্যাগী নগ্ন জৈনসন্ন্যাসী দিগম্বর, জগতের মায়ামোহ ত্যাগ করিয়া মুক্তির সাধনা করাই তাহার ব্রত হওয়া উচিত, বিবাহ-বাসনা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে। সমাজের ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সর্বস্তরের লোকের মতো এই জৈন

সন্ন্যাসীরও নারীর প্রতি স্বাভাবিক দুর্বলতা রহিয়াছে। কুট্টনী দন্তুরার সংগে দিগম্বরের বিবাহ-ব্যবস্থা হইল, দিগম্বরকে অর্ক-পুষ্পমাল্য শোভিত করিয়া বরবেশে সাজাইয়া আনা হইল, 'চতুর্বেদ' পণ্ডিত পুষ্প এবং অক্ষত গ্রহণ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছেন,—'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥' পরিস্থিতি এবং সংলাপ উৎকৃষ্ট প্রহসনের উপযোগী হইয়াছে। সন্ন্যাসী দিগম্বর হইয়াছে কেন? মুক্তির জন্য। বিষয়বাসনার সঙ্গে সঙ্গে সে কামাদিরও অতীত হইয়াছে। কিন্তু বাহিরে তাহার এই যোগীর সাজ থাকিলেও অন্তরের অন্তস্তলে যদি প্রবল ভোগবাসনা লুক্কায়িত থাকে, তবে সেই বৈড়ালব্রতীকে জীবনের শেষ দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত। এই অভাগ্য বার্ধক্যে পদার্পণ করিয়াছে, মৃত্যু ইহার আসন্ন, তবুও যদি ইহার অন্তর হইতে কামবাসনা অন্তর্হিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার অবশ্যম্ভাবী শেষ পরিণামের জন্য আমাদের দুঃখ করিয়া লাভ নাই। আর এই জরাজীর্ণ কামাতুরের উপযুক্ত বিলাস-সংগিনী হইবে এই কদর্যরূপা, দীর্ঘদশনা বৃদ্ধা কুট্টনী দন্তুরা, শমন নিকট জানিয়াও যে পরকালের জন্য সতর্ক হইতেছে না। সংসার ত্যাগ করিয়াও যে সন্ন্যাসী কামাচারী, সংসারে আবদ্ধা এই কদর্য কামদূতী কুট্টনীই তাহার উপযুক্ত সহধর্মিণী, আর অর্কপুষ্পমাল্যভূষিত মৃত্যুযাত্রী বলির পশু দিগম্বরই তাহার উপযুক্ত বর।

কিন্তু সবচেয়ে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন দিগম্বর চতুর্বেদকে হরিতকীযুগল দক্ষিণা দিতে বাহির করিল। লেখক এখানে 'দিগম্বর' এবং 'চতুর্বেদ' উভয়ের চরিত্রের দুর্বলতা উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। যাহার কাণাকড়ি সম্বল নাই, সেই দিগম্বরেরও বিবাহ করিয়া সংসার করিবার বাসনা জাগিয়াছে। মানবচরিত্রের ইহা এক স্বাভাবিক দুর্বলতা, কিন্তু ইহা সন্ন্যাসিজনোচিত নহে। আবার পুরোহিতের কাজ হইল লোভহীন হইয়া কোনো অনুষ্ঠানের পুরোভাগে অবস্থান করা, যজমান যথাসাধ্য দক্ষিণা দিলেই তিনি খুশী হইবেন, অর্থের জন্য তিনি নীচ কাজ করিবেন না। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের আদর্শ এত নামিয়া গিয়াছে যে 'চতুর্বেদ' বেশ্যা ও দিগম্বরের বিবাহে পর্যন্ত পৌরোহিত্য করিতেছে। একমাত্র অর্থলোভই তাহার কারণ। এই বিবাহ যত অসংগতই হউক, ইহাতে কিছু দক্ষিণা পাওয়া যাইবে। ভিতরে ভিতরে যাহার এত লোভ এবং সত্য সত্যই যে এতখানি অন্যায় আচরণ করিয়া থাকে, তাহার মুখে ন্যায় ও নিয়মনিষ্ঠার দোহাই ঠিকই আছে। চোরের এমন

বড় গলাই হইয়া থাকে। "আমি অনেক নিয়ম-ব্রতপরায়ণ শূদ্রপ্রতিগ্রহ-নিবৃত্ত। তুই আমার মতো ব্রাহ্মণের দক্ষিণা লোপ করিতেছিস্? সুতরাং আমি ইহাকে (দন্তুরাকে) লইয়া যাইব।" দক্ষিণার জন্য বিবাহ ভঙ্গ হইয়া গেল।

কনোজবাসী নাট্যকার শঙ্খধর খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকে সমাজের যে শোচনীয় দশা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহারই বাস্তব রূপ অঙ্কন করিয়াছেন এই 'লটকমেলক'-প্রহসনে। প্রহসনের যে বাস্তবতাগুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন, 'লটকমেলক'-এ তাহা আছে। লেখকের রচনা সমাজের তীব্র ব্যঙ্গ করিয়াছে, সমাজকে কশাঘাত করিয়াছে অনেক, কিন্তু তাহা অতিরূঢ় আঘাতে সাহিত্যের রসহানি ঘটায় নাই।

'জ্যোতিরীশ্বর'-রচিত 'ধূর্তসমাগম' এই একই ধরনের প্রহসন। ইহার প্রভাবও 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে পড়িয়াছে। প্রহসনটির আদ্যন্ত বিশ্লেষণ করিবার প্রয়োজন নাই, কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া রচয়িতার শক্তিমত্তার পরিচয় দিব। Satire-রচনায় জ্যোতিরীশ্বর সিদ্ধহস্ত ছিলেন। লেখক বলিতেছেন, "লক্ষ্মী যাহাদের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন বলিয়া যাহাদের সর্বভোগ বিঘ্নিত হইয়াছে, ধনসংগ্রহের চিন্তায় যাহাদের নিদ্রা হয় না, জগতে যাহারা নামকাম কিছুই করিতে পারে নাই, আশ্রমপদ তাহাদের সাম্‌নেই পড়িয়া আছে।······আর এই সাধুত্ব ততদিন টিকিবে যতদিন শ্রীমতীদের চঞ্চল কটাক্ষ এই জ্ঞানবান্‌দের সম্মুখে নৃত্য না করিবে।"

জ্যোতিরীশ্বরের রচনায় উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জনা-গুণ লক্ষ্য করিবার মতো। গণিকা সুরতপ্রিয়ার গৃহে ভিক্ষার আশায় কপট সন্ন্যাসী 'বিশ্বনাগর' প্রবেশ করিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সুরতপ্রিয়া বলিতেছে, "ভগবান্ যে! তাহলে আমি অভ্যর্থনার জন্য অগ্রসর হচ্ছি। (অগ্রসর হইয়া) ভগবন্, প্রণাম করি।"

"বিশ্ব। (সানন্দে) অভিলষিতভাজন হও।

সুরতপ্রিয়া। ভগবন্, আপনার প্রসাদে (তা' হ'বে)।

বিশ্ব। অচিরেই তা' হোক।

সুরতপ্রিয়া। ভগবান্ আদেশ করুন, আমাকে কি করতে হ'বে; কি দিতেই বা হ'বে।

বিশ্ব। শুভে, আমাদিগকে তোমার অদেয় কি আছে? তবে এখন ভিক্ষেই চাই।

সুরতপ্রিয়া। ভগবন্, কোন্ ধরণের ভিক্ষা? কোন্ সময়ে?·········
হে উদারমূর্তে! এই আমার শরীর, তথা বিরহযুক্ত ধর্মৈকসার প্রাণ,

সমস্তই আপনার আয়ত্ত। তা' বাইরের বস্তুতে আস্থা কি? ভগবান্ তাহ'লে অভ্যন্তরগৃহে প্রবেশ ক'রে বিশ্রাম করুন, আমি এখন ভিক্ষোপচার (সজ্জিত) করি।"

বিশ্বনাগর যে স্থরতপ্রিয়ার আসঙ্গলাভ করিবার জন্য তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, এবং স্থরতপ্রিয়া যে তাহাকে সেই দিকেই আকৃষ্ট করিতে চায়, তাহা উহাদের আলাপে ব্যঞ্জিত হইয়া উঠিতেছে। 'অভিলষিতভাজন হও' এই আশীর্বাণীর অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা এই যে, আমি তোমাকে অভিলাষ করিয়াই এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি আমাকে সন্তুষ্ট কর। স্থরতপ্রিয়াও বক্রোক্তির দ্বারা সম্মতি জানাইল। 'অচিরেই তা' হোক'—এই বাক্যে বিশ্বনাগরের বাসনার তীব্রতা প্রকাশ পাইতেছে। স্থরতপ্রিয়াও বাক্য-কৌশলে 'কি করতে হ'বে; কি দিতেই বা হ'বে!' বলিয়া সাগ্রহে সম্মতি জানাইল। বিশ্বনাগরের ভিক্ষা যে তণ্ডুলমুষ্টি নয়, গণিকা তাহা জানে। সুতরাং 'কোন্ সময়ে' ভিক্ষা দিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় উভয়ের মনোভাব দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। অতএব লম্পট সন্ন্যাসীর নিকট গণিকার মনঃপ্রাণ-সমর্পণের জন্য অভ্যন্তর-গৃহে প্রবেশের প্রয়োজন হয় এবং উপযুক্ত প্রসাধনের মাধ্যমে ভিক্ষোপচার সাজানো হইবে, তাহা বুঝিতে পারি।

জ্যোতিরীশ্বরের এই শৈলীর অনুবর্তন আমরা গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর' যাত্রায় এবং গিরিশচন্দ্রের 'বিল্বমঙ্গল' নাটকে থাকমণি ও সাধকের আলাপে দেখিতে পাই। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে ইহাকে জ্যোতিরীশ্বরের সজ্ঞান অনুসরণ বলিতে পারি না।

এইবার সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি শ্রেষ্ঠ প্রহসনের আলোচনা করিব। ইহা মহারাজ মহেন্দ্রবিক্রম-বর্মা-বিরচিত 'মত্তবিলাস' প্রহসন। গ্রন্থখানিকে সমালোচক-প্রবর এ.বি. কীথ প্রাচীনতম প্রহসন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।* কিন্তু ইহার বিষয়বস্তু যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহাও বলিতে কসুর করেন নাই।† কীথ সাহেবের এই উক্তিটি নির্বিচারে মানিয়া লওয়া যায় না।

* Almost contemporary to a day of Harsha was Mahendra Vikramavarman ...... who ruled in Kanci ...... in the first quarter of the seventh century ... ... His Prahasana ... ... is so far the only early farce published.

—The Sanskrit Drama, A. B. Keith, pp. 182

† The play is not unamusing, though the subject is much too trivial for the pains taken to deal with it.

—The Sanskrit Drama, A. B. Keith, pp, 181-185

'মত্তবিলাস'-সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় আপত্তি হইল এই যে, সামান্ত একটি ভিক্ষাভাণ্ড অবলম্বন করিয়া কি করিয়া একখানি শ্রেষ্ঠ প্রহসন রচিত হইবে? আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, ঐ ভিক্ষাভাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া প্রহসনখানি গড়িয়া উঠিয়াছে বলিয়াই উহার গুরুত্ব বাড়িয়াছে। ভারতবর্ষে বৈরাগীর ভিক্ষাভাণ্ড মহাপ্রভু যিশুখৃষ্টের 'ক্রুশ'-চিহ্নের সমান মর্যাদা বহন করে। ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্রের মতোই উহা পবিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ। যজ্ঞসূত্রের অমর্যাদা বা অপব্যবহারে যেমন ব্রাহ্মণ্য-সভ্যতার অপমান হয়, সন্ন্যাসীর ভিক্ষাভাণ্ডের অমর্যাদাও ঠিক সভ্যতাকে ততখানি আঘাত করে। উহাকে ভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্রের সমান করিয়া দেখিলে চলিবে না। প্রবৃত্তি-পরিচালিত হইয়া যদি কেহ এই ভিক্ষাভাণ্ডের মর্যাদা লঙ্ঘন করে, সেই সাধুই সবচেয়ে বেশি নিন্দাভাজন।

ভারতীয় সন্ন্যাসীর বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় সভ্যতার মূল কথাই হইল ধর্ম। ভারতীয় ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবন সমভাবে এই ধর্মের অনুশাসনে অনুশাসিত। ধর্মগুরু ধূলির ধরণীতে ভগবানের প্রতিনিধি। রাজা বিধাতার পালনী ইচ্ছা পরিপূরণের জন্য প্রজার কল্যাণে রাজ্যশাসন করেন বলিয়া তিনি ধর্মাবতার। গৃহস্থ চতুরাশ্রমের প্রয়োজন-পরিপূরণের জন্য ইষ্টার্থে এবং সর্বার্থে সংসার-ধর্ম পালন করিয়া চলিয়াছেন। দেবদ্বিজাতিথি-সেবা তাঁহার নিত্যধর্ম। আপামর-জনসাধারণকে এই ধর্মের নীতি শিখাইয়া সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য যে প্রবৃত্তিবিমুক্ত কল্যাণকামী নরদেবগণ সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই সন্ন্যাসী। তাঁহাদের সমস্ত প্রবৃত্তি জীব-কল্যাণের জন্য তাঁহারা সর্বজীবেশ্বরের চরণে ন্যস্ত করিয়াছেন। ব্যক্তিগত সুখ-ভোগের বাসনা তাঁহাদের নাই। তাঁহাদের সেবায় ও ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া কৃতজ্ঞ সমাজ যাহা দান করিবে, তাহা দিয়া তাঁহারা জীবসেবা করিবেন এবং শরীর-রক্ষার জন্য যেটুকু গ্রহণ না করিলে নয়, সেইটুকুমাত্র গ্রহণ করিবেন, তাই তাঁহারা নিত্য-ভিখারী। তাঁহাদের ভিক্ষাভাণ্ড অক্ষমের দীনতার প্রতিনিধি নহে, শক্তিমান্ প্রেমিকের ভালবাসার দান-গ্রহণের প্রতীক। কিন্তু সন্ন্যাসী যদি এই সমাজসেবার কল্যাণময় আদর্শ হইতে পতিত হয়, তাহা হইলে সে মনুষ্যত্ব হারায় এবং দীন ভিখারীরও অধম হয়। তাহার ভিক্ষাভাণ্ড সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করিয়া উপহাসমিশ্রিত করুণার বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

মহারাজ মহেন্দ্রবিক্রম সমাজের এই শোচনীয় দুরবস্থা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, পাশুপত, কাপালিক প্রভৃতি সর্বমতের তথাকথিত সাধুচরিত্রে তিনি

চরম অধঃপতনের চিহ্ন লক্ষ্য করিয়াছেন। তাই ব্যঙ্গের মাধ্যমে 'মত্তবিলাস'-প্রহসনে তিনি উহাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। 'মত্তবিলাসে' যে ব্যাপক সমাজদৃষ্টির পরিচয় রহিয়াছে, 'ভগবদজ্জুকীয়'-প্রহসনে তাহা নাই। 'লটকমেলক', 'হাস্যার্ণব' প্রভৃতি প্রহসনে মহারাজ মহেন্দ্রবিক্রম বর্মার দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণ চলিলেও সাহিত্যিক আদর্শে ঐ প্রহসনগুলি 'মত্তবিলাসে'র সমান মর্যাদা দাবী করিতে পারে না। চরিত্রসৃষ্টির যে অভিনব কৌশল আমরা 'মত্তবিলাসে' লক্ষ্য করি, 'ভগবদজ্জুকীয়ে' তাহা অতখানি মিলিবে না। 'মত্তবিলাসে' সব কয়টি চরিত্রই সৃজ্যমান বা চলিষ্ণু। 'ভগবদজ্জুকীয়ে' এক 'শাণ্ডিল্য'-চরিত্র ভিন্ন সব কয়টি স্থাণু। ভগবদজ্জুকীয়ে হাস্যরস প্রধানতঃ পরিস্থিতি-সঞ্জাত,* কিন্তু মত্তবিলাসে চরিত্রগুলিই হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। ওখানে চরিত্র ও পরিস্থিতির মিলন হইয়াছে, তাই শৈলীর দিক্ দিয়া 'মত্তবিলাস'কে 'ভগবদজ্জুকীয়' হইতে উন্নত ধরনের বলিতে হইবে। যাঁহারা 'মত্তবিলাস'কে 'ভগবদজ্জুকীয়' হইতে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন, তাঁহারা 'মত্তবিলাস'-এর চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত মর্মার্থ লক্ষ্য করেন নাই।

মত্তবিলাসে সমাজদৃষ্টি

প্রহসনখানির মোটামুটি বিশ্লেষণ করিয়া আমি আমার বক্তব্য উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিতেছি—

পানোন্মত্ত এক কাপালিক তাহার বধূ দেবসেনার সহিত টলিতে টলিতে প্রবেশ করিতেছে। পঞ্চ-ম-কারের প্রকৃত তাৎপর্য ভুলিয়া যে কদাচারী কামাচারিগণ তন্ত্রশাস্ত্রকে কলুষিত করিয়াছে, এই কাপালিক তাহাদের প্রতিনিধি। কাপালিক হঠাৎ লক্ষ্য করিল, তাহার ভিক্ষাভাণ্ড 'নর-কপাল' অপহৃত হইয়াছে। কাপালিকত্ব এই কপালে আসিয়া ঠেকিয়াছে—ইহা তাহার ভিক্ষাভাণ্ড, পানপাত্র এবং খাদ্যসংগ্রহের উপকরণ, এই ভিক্ষাভাণ্ডই এখন তাহার ধর্মকর্ম, সমস্তই। কারণ, মুক্তির জন্য তপস্যা করিতে সে কাপালিক ব্রত গ্রহণ করে নাই, ইহা তাহার জীবনোপায়। কাপালিক তাই ভাবিতেছে, ভিক্ষাভাণ্ড না

মত্তবিলাসের আলোচনা

* "One important feature of this well written farce, which distinguishes it from all other farces in Sanskrit, is that the comic element is found not in the oddities of the characters but in the ludicrousness of the plot."—History of Sanskrit Literature, Dr. De & Dr. Dasgupta, pp 495.

থাকিলে সে বাঁচিবে কি করিয়া? তাই শেষ পর্যন্ত সে ঠিক করিল, 'আপদ্ধর্ম' প্রতিপাদন করিয়া গোশৃঙ্গের দ্বারাই কপালের প্রয়োজন সিদ্ধ করিবে। লেখকের satire (ব্যঙ্গসৃষ্টির শক্তি) লক্ষ্য করিবার মতো। কাপালিক যত কদাচারীই হউক না কেন, সে হিন্দু; গোশৃঙ্গ নিশ্চয়ই তাহার নিকট অপবিত্র, কিন্তু আপন প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য সে গোশৃঙ্গ গ্রহণ করিতেও ইতস্ততঃ করিতেছে না। আবার এই কদাচারী ধর্মধ্বজীদের নিজেদের অপকীর্তি-সমর্থনের জন্য যুক্তির অভাব হয় না। শাস্ত্রের নির্দেশ রহিয়াছে, যখন 'আপদ্ধর্ম' উপস্থিত হয়, তখন কোনো ব্যক্তি তাহার স্বাভাবিক-বৃত্তির ব্যতিক্রম করিলে সে ধর্ম এবং আচারভ্রষ্ট হইবে না। কিন্তু এই কপট সাধুগণ এতদূর নামিয়া গিয়াছে যে, অতি তুচ্ছ কারণে নিজেদের অন্যায়-আচরণ-সমর্থনের জন্য আপদ্ধর্মের দোহাই দেয়।

আবার, ইহাদের অন্যায় আচরণের জন্যই ধর্মের নামে রাশি রাশি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। সেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ, অকারণ ঈর্ষ্যা প্রভৃতি লাগিয়াই থাকে। শাক্যভিক্ষুকে দেখিয়া কাপালিক তাহার স্ত্রীকে বলিতেছে, 'প্রিয়ে, আমার মনে হয়, কপালটির মধ্যে শূল্যমাংস ছিল বলিয়া হয় উহা কুকুরে লইয়াছে, না-হয় এই শাক্যভিক্ষু গ্রহণ করিয়াছে।' উক্তিটির মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ লক্ষ্য করিবার মতো—শাক্যভিক্ষুকে কুকুরের সমান করিয়া দেখা হইতেছে। কিন্তু ইহা শুধু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষই নয়, আরো কিছুর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত এই উক্তির মধ্যে আছে। শাক্যভিক্ষু বাহিরে কাপালিকাচার-বিরোধী, কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে-ও যে কামাচারী, মদ্য-মাংস-লোলুপ, এই উক্তির মধ্যে ঐ অর্থ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। শাক্যভিক্ষুর নিজের উক্তি হইতেই আমরা তাহা বুঝিতে পারিব।

> শাক্যভিক্ষু বলিতেছে,—"উপাসক শ্রেষ্ঠী ধনদাসের 'সর্বাবাসমহাদত্ত মহিমা', কারণ—তিনি আমাকে 'অভিনববর্ণ'-গন্ধ-রস-সংযুক্ত 'মৎস্যমাংসো-পচার-বহুল' অন্ন ভক্ষণ করাইয়াছেন। যাক্‌, আমি এখন রাজবিহারে যাইব। (পরিক্রম করিয়া স্বগত) অহো! পরমকারুণিক ভগবান্‌ তথাগত প্রাসাদে বাস, সুবিহিত শয্যা-পর্যঙ্কে শয়ন, পূর্বাহ্ণে ভোজন, অপরাহ্ণে 'পঞ্চসুগন্ধবোধিত'-তাম্বূল-চর্বণ, 'সহ্নবসন' (সদ্য বা নূতন বস্ত্র)-পরিধান প্রভৃতির বিধান করিয়া ভিক্ষুসঙ্ঘকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, কিন্তু পরিগ্রহ এবং সুরাপান-বিধান তো দেখি না! অথবা সর্বজ্ঞ (ভগবান্‌ বুদ্ধ) ইহা দেখিবেন না কেন? অবশ্যই এই (মদ্যপানে) নিরুৎসাহ দুষ্ট-বৃদ্ধ-স্থবিরগণ আমাদের মতো তরুণজনের প্রতি ঈর্ষ্যাবশতঃ

পীটক-পুস্তক হইতে এমন সুরাপান-বিধান তুলিয়া দিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। কোন স্থান হইতে অবিনষ্ট-মূলপাঠ (পীটক) উদ্ধার করিতে হইবে, তাহা হইলেই সম্পূর্ণ বুদ্ধবচন লোকে প্রকাশ করিয়া আমি সঙ্ঘোপকার করিতে পারিব।"

উক্তিটি অতি উচ্চাঙ্গের satire। ধর্মের নামে যখন কৃচ্ছ্র-সাধন অতি-মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল, জীবনবৃদ্ধির নীতির নামে মানুষ অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন হইয়া যখন মরণের উপাসনা করিতেছিল, তখন ভগবান্ বুদ্ধ মানুষকে ধর্মের সহজ পন্থা দেখাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—আত্মনিগ্রহই ধর্ম নয়, স্বাভাবিক দেহধর্ম পালন করিয়া শরীরকে রক্ষা করিতে হইবে। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্' বা 'যুক্তাহার-বিহার'ই যোগ, একথা হিন্দুশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে, তাই আহার-বিহারে স্বাভাবিক ও সংযত হইবার উপদেশ বুদ্ধদেব দিয়াছিলেন এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের মধ্যে সেই নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র অনিয়ন্ত্রিত-বৃত্তি ভিক্ষুগণ নিজেদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য বুদ্ধবচনের অপব্যাখ্যা করিতে লাগিল, বুদ্ধবচনকে সম্পূর্ণ বিপরীত বুঝিল এবং বুঝাইল। সাধনার জন্যই বুদ্ধদেব দেহমনকে সুস্থ-স্বস্থ রাখিবার যে বিধান দিয়াছিলেন, দেহ-সর্বস্ব ভিক্ষুগণ পরবর্তী কালে নিজেদের ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সেই বচনগুলিই ভাঙ্গাইয়া খাইতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহারা মূল শাস্ত্রবচনে প্রক্ষেপারোপের জন্য সচেষ্ট হইল। পূর্বাচার্যগণের দোষ দিয়া তাহারা নিজেদের কল্পিত শ্লোকাদি মূল শাস্ত্রগ্রন্থে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া উহাদিগকে শাস্ত্রবাণীর দ্বারা সমর্থিত করিতে চেষ্টা করিল। নাট্যকার বলিতে চাহেন, ধর্মশাস্ত্র যদি বিকৃত ও কলুষিত হইয়া থাকে, তবে তাহা এই বৈড়ালব্রতী ধর্মাশ্রয়ীদের দ্বারাই হইয়াছে, সাধারণ জনগণের দ্বারা নহে।

এই কপট ধর্মধ্বজীদের অন্তরের ধারণা-ভাবনা এবং বাহিরের আচরণে পার্থক্য অনেক। ইহাদের অন্তরের দুর্বলতা যাহাতে বাহিরে ধরা না পড়ে, সেজন্য ইহারা সব সময়ে সচেতন থাকে। অন্তরে অন্তরে এই শাক্যভিক্ষু কাপালিকের সগোত্র। কিছুক্ষণ আগে মদ্যপানের বাসনা সে স্বগতোক্তির মাধ্যমে প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু বাহিরে সে এই মনোভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নয়, তাই সে সুরাপান-বিভ্রান্ত কাপালিকের লক্ষ্যীভূত হইবে না বলিয়া পলায়ন করিতেছে। কিন্তু কাপালিক ভাবিল শাক্যভিক্ষু নিশ্চয়ই তাহার ভিক্ষাভাণ্ড চুরি করিয়াছে, নহিলে এমন করিয়া পলাইবে কেন? পরিস্থিতি ভুল বুঝিবার জন্য এখানে হাস্যরসের সৃষ্টি হইল।

শাক্যভিক্ষুকে থামিতে হইল, কারণ, কাপালিক-দম্পতীর পানোন্মত্ততা তাহার ভাল লাগিয়াছে, তাহাদের এই 'সুখোপনত অভ্যুদয়ে'র শাক্যভিক্ষু মনে মনে অভিলাষী। সুরাপানের জন্য তাহার জিহ্বায় জল আসিতেছে, কিন্তু মহাজনেরা ইহাতে দোষ দেখিবেন বলিয়া সুরাপানে তাহার সাহস হইতেছে না। তাই সে একদিকে জিহ্বা লেহন করিতেছে এবং অন্যদিকে প্রকাশ্যে বলিতেছে—"আমাকে সুরাপান করিতে বলিয়া আমার অপমান বাড়াইও না।" বাক্য ও চিন্তার এই অসংগতি হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে।

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। কাপালিক দেবসেনার পানাবশিষ্ট সুরা শাক্যভিক্ষুকে দিতে বলিল কেন? এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দুষ্ট সাধুগণ নিজেদের আচার-আচরণকেই একমাত্র ধর্মসম্মত আচরণ বলিয়া মনে করে। অন্যদের আচার-আচরণ তাহাদের নিকট অশাস্ত্রীয় এবং হেয়। তাই কাপালিক নিজমত-প্রতিষ্ঠার জন্য শাক্যভিক্ষুকে মদ্যপানে বাধ্য করিতে চায়। এই পরমতাসহিষ্ণুতাই সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কলহ সৃষ্টি করিয়া ধর্মের সত্যকারের মর্যাদা নষ্ট করিয়াছে, নাট্যকার ইহাই বলিতে চান।

শাক্যভিক্ষু যখন পথে আসিল না, তখন কাপালিক বলপূর্বক তাহার নিকট হইতে ভিক্ষাভাণ্ড গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিল। লেখক এখানে পরিস্থিতিগত অসঙ্গতি সৃষ্টি করিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। ভিক্ষাভাণ্ড ছিনাইয়া লইবার জন্য শাক্যভিক্ষুকে আক্রমণ করিতে গিয়া পানোন্মত্ত কাপালিক পড়িয়া গেল। স্বামী যাহা পারিল না, ধর্মপত্নী অবশ্যই তাহা পারিবে! 'মরেছিস দাসীর বেটা!' বলিয়া দেবসেনা শাক্যভিক্ষুকে আক্রমণ করিল, কিন্তু আক্রান্ত ব্যক্তিকে মারিবার পরিবর্তে তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া নিজেই ঝুলিয়া পড়িল।

নারীর স্পর্শ বৌদ্ধভিক্ষুকে আনন্দে উদ্বেলিত করিয়াছে, কিন্তু নিজের এই দুর্বলতাকে সে সহজে স্বীকার করিবে না, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ইহাকে সে সমর্থন করাইয়া লইবে। তাই সে মনে মনে ভাবিতেছে—"এ আমার মুণ্ডন দেখিয়াছে, সুতরাং বুদ্ধকে অর্থেক জানিয়াছে।" যখনই নিজের দুর্বলতার সমর্থন নিজের অন্তরে পাইল, তখনই সে সোল্লাসে "উপাসিকে, ওঠো, ওঠো, ওঠো" বলিয়া দেবসেনাকে ধরিয়া তুলিল। ইহার মধ্য দিয়া সে স্পর্শসুখ-জনিত রত্যানন্দ লাভ করিল। কিন্তু রতনে রতন চেনে। কাপালিক অমনি বলিয়া উঠিল—"হে মাহেশ্বরগণ, তোমরা দেখ, নাগসেন-নামধারী এই দুষ্ট ভিক্ষু আমার প্রিয়তমার পাণিগ্রহণ করিল।" শাক্যভিক্ষু

নিজের কার্য্য সমর্থন করিবার জন্য ধর্মের দোহাই দিয়া বলিল—"বিষমে পতিতের প্রতি অনুকম্পা আমাদের ধর্ম।" কাপালিক কিন্তু আসল কথাটি ধরিয়া ফেলিয়াছে—"কি আমার সর্বজ্ঞ-ধর্মী ব্যক্তিরে! আমিই তো আগে পড়িয়া গিয়াছিলাম।" শাক্যভিক্ষুর করুণা নারীর প্রতি উথলিয়া উঠিল, নরের প্রতি নয়। ধর্মনীতি ইহাদের প্রবৃত্তি-চরিতার্থতার উপায়। মজা এই যে, এই সকল কপট ধর্মধ্বজী নিজেদের অন্তরের অভীপ্সা বাহিরের আচরণের দ্বারা যতই গোপন করিতে চেষ্টা করে, ততই তাহাদের বাক্য-কার্যের অসঙ্গতি প্রকট হইয়া তাহাদের স্বরূপ ধরাইয়া দেয়। তাই তাহারা সর্বজনের ব্যঙ্গের পাত্র হয়।

কাপালিক আর সহ্য করিতে না পারিয়া এবার শাক্যভিক্ষুর মাথা ফাটাইবার জন্য প্রস্তুত হইল—"তোমার শিরঃকপাল আমার ভিক্ষাকপাল হইবে।" ঝগড়া বাধিয়া গেলে শিবোপাসক 'পাশুপত' রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া কাপালিক অভিযোগ করিয়া বলিল,—"এই দুষ্ট ভিক্ষুনামধারী নাগসেন আমার ভিক্ষাকপাল চুরি করিয়া ফিরাইয়া দিতে চাহিতেছে না।" মুক্তির জন্য তপস্যা যাহাদের একমাত্র ব্রত, পার্থিব সম্পদকে ধূলিমুষ্টির মতো পরিত্যাগ করিয়া যাহারা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কত সঙ্কীর্ণতা, কপটতা ও স্বার্থান্ধতা প্রবেশ করিয়াছে, প্রহসনকার তাহা অতি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন। সামান্য ভিক্ষাপাত্র লইয়া এই তথাকথিত আশ্রমিগণ যে কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া তুলিয়াছে, তাহা অজ্ঞ, অন্ধ, ভোগমুখী সাধারণ জনের পক্ষেও অগৌরবের। সুতরাং ধর্মের নামে ইহারা কোথায় নামিয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। আর কত বৃত্তিস্বার্থ আসিয়াই যে ইহাদের এক একটি আচরণ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও কৌতূহলের সহিত লক্ষ্য করিবার মতো। 'পাশুপত' আসিয়া এই দ্বন্দ্ব আরো জটিল করিয়া তুলিল, কারণ, সে ধর্মের নামে ব্যভিচারের সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। সে ভাবিতেছে, আমাদের দ্বারা যাহা অনুষ্ঠিত হয়, এই দুরাত্মা গান্ধর্ববিধানে তাহা করিয়াছে। গাভীকে যেমন করিয়া গ্রাসমুষ্টির দ্বারা আকর্ষণ করে, এই দুরাত্মা তেমনি চীবরান্তদর্শন করাইয়া আমার দয়িতা ক্ষৌরিকের দাসীকে আকর্ষণ করিয়াছে, সুতরাং 'প্রতিহস্তিপ্রোৎসাহ'-ন্যায়ের দ্বারা আমি ইহাকে ধ্বংস করিব। এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া সে নাগসেনকে বলিল—"ওহে নাগসেন, এ যা' বলছে তা'কি সত্য?" শাক্যভিক্ষু সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধবচন আওড়াইয়া বলিল, মিথ্যাকথা বলিলে শিক্ষাপদের বিরমণ হয়, দান করা বস্তু ভিন্ন অন্য বস্তু লইলে শিক্ষাপদের

বিরমণ হয়। সে যখন একজন খাঁটি বৌদ্ধ, তখন সে অন্যের জিনিস চুরি করিতে পারে না, এবং মিথ্যা কথা বলিতে পারে না। কথায় বলে, চোরের বড় গলা, এই শাক্য-ভিক্ষুরও তাহাই দেখিতেছি। সে ভিক্ষাভাণ্ড চুরি করে নাই সত্য, কিন্তু অন্তরের হীনবাসনা গোপন করিবার জন্য সে কিছুক্ষণ পূর্বেই মিথ্যাকথা বলিয়া এবং বুদ্ধবচন উদ্ধৃত করিয়া আত্মসমর্থন করিয়াছে। সেই কপটাচারী এখন সত্যের দোহাই দিতেছে। সে যখন তাহার জীবনে ও আচরণে বুদ্ধবচন প্রমাণিত করিতেছে, তখন সে কেন ভিক্ষাভাণ্ড গ্রহণ করিতে যাইবে ?

যাহা হউক, টানাটানি করিতে গিয়া বৌদ্ধভিক্ষুর বসনাভ্যন্তর হইতে একটি ভিক্ষাভাণ্ড পড়িয়া গেল। উহা শাক্যভিক্ষুর নিজেরই। কিন্তু কাপালিক ভাণ্ডটি দেখিয়া বলিল, "কাকের বর্ণের চেয়েও এর বর্ণ কৃষ্ণতর, বর্ণান্তরকরণে শাক্যভিক্ষুর নৈপুণ্য আছে।" কাপালিক পরিষ্কার বুঝিয়াছে, ভাণ্ডটি তাহার নয়, তবুও নিজের ভাণ্ড হারাইয়াছে বলিয়া এই কপট কাপালিক শাক্যভিক্ষুর পাত্রটি আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছে। সে যে-কোনো প্রকারে প্রমাণ করিবে যে পাত্রটি তাহারই। এ বিষয়ে তাহার পত্নীটিও কম যায় না। দেবসেনা বলিতেছে– সর্বলক্ষণসম্পন্ন, কমলাসনশীর্ষ-কপালানুভাব, পৌর্ণমাসী-সোমদর্শন, নিত্য-সুরাগন্ধী এই কপাল (শাক্যভিক্ষুর) মলিনবসন-সংযোগে এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে।" যুক্তিটি অপূর্ব! স্বামি-স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া প্রমাণ করিল যে ভিক্ষাভাণ্ডটি তাহাদেরই। কিন্তু ভিক্ষাভাণ্ডটি শাক্যভিক্ষুর স্পর্শে অশুচি হইয়াছে, ইহা কি করিয়া গ্রহণ করা যায়? কাপালিক তাহারও সহজ উপায় বলিতেছে। "ভারতবর্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাপমোচনের একটা সহজ উপায় আছে। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সমস্ত পাপ দূরীভূত হইবে।" নাট্যকার ভারতীয় প্রায়শ্চিত্ত-বিধির উপর কটাক্ষ করিতেছেন। "আমাদের স্বামী 'বালেন্দুচূড়ামণি' যত্ন করিয়া এই মহাব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন; তাই তিনি পিতামহের শিরচ্ছেদজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ত্রিদিবেশ্বর (ইন্দ্র ও পুরাকালে তৎপুত্র ত্রিশিরাকে বধ করিয়া শত-যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং তাহার দ্বারা পাপমুক্ত হইয়া তিনি পুণ্যলাভ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, অনেক বেলা হইতেছে এবং তর্কে কোনো ফল হইবে না মনে করিয়া শাক্যভিক্ষু শেষপর্যন্ত ভিক্ষাভাণ্ডটি কাপালিককে দিতে গেল। পাশুপত দেখিল, তাহার শত্রুতা সিদ্ধ হইতেছে না। সুতরাং সে আপত্তি করিয়া

বলিল, "দরবারে ইহার বিচার হউক।" দেবসেনার উক্তিতে সমাজের আর এক কদর্যরূপ ফুটিয়া উঠিল। "অনেক বিহারের বিত্ত সম্ভোগ ও সঞ্চয় করিয়া এই শাক্যভিক্ষু অর্থশালী হইয়াছে। এ ব্যক্তি অধিকরণ-করণিকদের মুখ পূর্ণ করিতে পারিবে, আমাদের কী সম্বল আছে?" এই তথাকথিত ধর্মধ্বজিগণ, ত্যাগমার্গ পরিহার করিয়া শুধু ভোগপঙ্কিল জীবনই যাপন করে না, জন-কল্যাণার্থ উৎসর্গীকৃত বিহারের অর্থেরও অপব্যবহার করে। নিজেদের অপরাধ ঢাকিবার জন্য সেই পবিত্র অর্থ ঘুষ দিয়া বিচারকদের মুখ বন্ধ করে, আর যাহারা বিধাতার প্রতিনিধি হইয়া ধর্মাধিকরণে বসিয়াছে, সেই 'ধর্মাবতার'গণও অর্থের লোভে এই বকধার্মিকদের সমর্থন করে।

এবার সর্বসমস্যার সমাধান হইল। যে ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া এত গণ্ডগোল সুরু হইয়াছিল, সেই 'কপাল' এতক্ষণ পর ফিরিয়া আসিল। এক চণ্ডালের কুকুর মাংসগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া কপালটি লইয়া গিয়াছিল, কুকুরই আবার তাহা মুখে করিয়া আনিয়াছে। কপালী তাহা মাথায় করিয়া নাচিয়া উঠিল। সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অন্ধবিদ্বেষ কোথায় গিয়া দাঁড়াইছে, তাহা লক্ষ্য করিবার মতো। শাক্যভিক্ষু আর যাহাই হউক, মানুষ। একটি মানুষ আর একটি মানুষের ভিক্ষাপাত্র স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া যে পাত্র কলুষিত হয়, শ্মশান-মাংস-ভোজী চণ্ডালের কুকুর তাহা মুখে করিয়া আনিলেও অপবিত্র হয় না। ছুৎ-মার্গ মানুষকে কতখানি বিচার-বিমূঢ় করিয়াছে!

নাট্যকারের তীব্র ব্যঙ্গের প্রকাশ পাইয়াছে একেবারে শেষ শ্লোকে। কপাল আলিঙ্গন করিয়া কপালী বলিতেছে,—'আমার তপ চির-অখণ্ডিত হইয়াছে, ভগবান্ মহেশ্বরে আমার ভক্তি রহিয়াছে, কারণ, আমি দেখিতেছি, আমার সেই হারানো কপাল সুখে, কুশলে ফিরিয়া আসিয়াছে।' ব্রহ্মজ্ঞানী সাধকের সমস্ত তপস্যার ফল হইল কিনা ভিক্ষাভাণ্ডখানি! যে দেশের সাধক সমস্ত ভোগৈশ্বর্য ত্যাগ করিয়া 'সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী' নারায়ণের ধ্যানে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, যে দেশের নারী পর্যন্ত পার্থিব ঐশ্বর্যের প্রতি অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছে, "যাহার দ্বারা আমি অমৃত হইব না, তাহা দিয়া কি করিব" সেই দেশের সাধক-নামধারী ভোগান্ধ-ভ্রষ্টাচারগণ এক কপর্দক মূল্যের অথবা মূল্যহীন ভিক্ষাভাণ্ডের জন্য মারামারি করিতেছে এবং সেই ভিক্ষাভাণ্ড ফিরিয়া পাইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির আনন্দ অনুভব করিতেছে!

'মত্তবিলাস'-নাটকে satire-এর প্রাধান্য। 'ভগবদজ্জুকীয়ে' humour-এর সুন্দর প্রয়োগ আছে। আর এক দিক্ দিয়া 'ভগবদজ্জুকীয়'-এর প্রশংসা

করিবার মতো। 'ভগবদজ্জুকীয়' কৌতুকহাস্তের উদাহরণ। কৌতুক-হাস্ত আমাদিগের কোনো সংস্কারে গুরুতর রকম আঘাত করে না। সংশোধনী মনোবৃত্তি কৌতুকহাস্তের মধ্যে প্রবল নহে। আমাদের আচার-আচরণ, বেশ-ভূষা ও বাক্য-কার্যের সহনযোগ্য অসঙ্গতির প্রকাশের মধ্য দিয়াই কৌতুক-হাস্যের সৃষ্টি হয়. 'ভগবদজ্জুকীয়ে'ও তাহাই হইয়াছে। অবশ্য তাহার সঙ্গে কিছু কিছু ব্যঙ্গহাসি যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু কৌতুককর পরিস্থিতি ব্যঙ্গ হাসিকে প্রাধান্য লাভ করিতে দেয় নাই।

Winternitz সাহেব 'ভগবদজ্জুকীয়ম্'-প্রহসনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ইহাকে প্রহসন না বলিয়া বরং 'কমেডী' বলা ভাল।* তবে প্রহসনখানির মধ্যে 'রামিলক' এবং 'বসন্তসেনা'র প্রেম দেখানো হইলেও উহার ঐকান্তিক নিবিড়তা ফুটিয়া উঠে নাই। কিন্তু 'বসন্তসেনা'র মাতার স্নেহ-ব্যাকুলতা, চেটীর বাক্য ও কার্য হাস্যরসাপ্লুত এই প্রহসনের মধ্যে গাম্ভীর্য আনয়ন করিয়াছে এবং চরমে রামিলক ও বসন্তসেনার মিলনে গ্রন্থখানির সমাপ্তি হইয়াছে। Winternitz সাহেব সেইজন্যই বোধ হয় গ্রন্থখানিকে 'কমেডী' বলিয়া স্বীকার করিতে অধিক আগ্রহশীল হইয়াছেন। আমার মনে হয় ইহার প্রহসনত্বই প্রধান। প্রহসনখানির নায়ক 'রামিলক' নহে, পরিব্রাজকও নহেন, —'শাণ্ডিল্য'। এই 'শাণ্ডিল্য' চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া, উহাকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্যই প্রহসনখানির সৃষ্টি হইয়াছে।

'শাণ্ডিল্য' ব্রাহ্মণ-সন্তান, কিন্তু মহাব্রাহ্মণ। তাহার পরিব্রাজক গুরু তাহাকে চিনিতে পারিয়াছেন। মানবদেহ রোগের নিধান এবং জরাধর্মগত, লীলান্তক যমের অধিষ্ঠান। বৃক্ষ যেমন নিত্য আঘাতে ক্ষয়শীল তীরে অবস্থান করে, মানবদেহও তেমনি নিত্য-প্রতিঘাতশীল. বিষয়ে অবরুদ্ধ। এই দেহাত্মবুদ্ধি মানব বিষয়ভোগে মত্ত হইয়া আনন্দ পায়, ইহাই আশ্চর্য। শাণ্ডিল্য এই মোহগ্রস্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে একজন। পরিব্রাজক যদিও ইহার মতো 'তমোবৃত' দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখেন নাই, তবুও ইহাকে তিনি তুচ্ছ করিতেছেন না। বরং তিনি ভালবাসিয়া জ্ঞানদান করিয়া ইহার অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবেন। অন্যান্য সংস্কৃত প্রহসন হইতে 'ভগবদজ্জুকীয়ম্'-প্রহসনের পার্থক্য এইখানে। 'বোধায়ন কবি' মনুষ্য-চরিত্রের দুর্বলতা লইয়া হাস্যরস

* The Bhagavadajjukiya is rather a comedy in our sense of the word than a farce P. Anujan Achan-সম্পাদিত 'ভগবদজ্জুকীয়ম্' প্রহসনের M. Winternitz লিখিত ভূমিকা, পৃষ্ঠা I-II

সৃষ্টি করিয়াছেন, তবুও সংস্কারকের মনোবৃত্তি লইয়া ব্যক্তি বা সমষ্টিকে জর্জরিত করেন নাই। তাঁহার রচনায় চরিত্র ও পরিস্থিতিগত অসঙ্গতিজনিত কৌতুকের হাসি রহিয়াছে, উহা আঘাত-জর্জরিত ব্যঙ্গ নহে। অবশ্য 'মত্তবিলাস'-এর মতো ধর্মাশ্রমীদের কপটতা, স্বার্থপরতা এবং দুশ্চরিত্রতার সমালোচনা 'ভগবদজ্জুকীয়ে' যে নাই, তাহা নহে। 'শাণ্ডিল্য' চরিত্রই এই প্রহসনে সেই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হইয়াছে, কিন্তু শাণ্ডিল্যের উপরে তাহার গুরু পরিব্রাজকের চরিত্রমাধুর্য বিস্তারিত করিয়া নাট্যকার ভারতীয় সাধন-মহিমা এবং সন্ন্যাসীর আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। 'শাণ্ডিল্য' চরিত্র অতিমাত্র আকর্ষণীয় এবং উপভোগ্য সৃষ্টি, কিন্তু প্রহসনে তাহাকে স্বপ্রধান হইতে দেওয়া হয় নাই। নাট্যকারের দৃষ্টি এখানে ব্যাপক। প্রহসনকারদের একটা স্বাভাবিক দৌর্বল্য আছে। তাঁহারা সমাজের দোষক্রটী দেখাইতে গিয়া অনেক সময়ে গুণের দিক্‌টা লক্ষ্য করেন না বা উপেক্ষা করেন, তাই তাঁহাদের দৃষ্টি প্রায়ই ঐকদেশিক হয়। সমাজের সামগ্রিক রূপ তাঁহাদের রচনায় তাই অনেক সময় ফুটিয়া উঠে না। বোধায়ন কবি কিন্তু তৎকালীন ধর্মজীবনের ভালোমন্দ দুইটি দিক্‌ই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাই তাঁহার সমাজদৃষ্টিকে ব্যাপক বলিয়া স্বীকার করিব। গুরুশিষ্য, পরিব্রাজক এবং শাণ্ডিল্য ভারতীয় তৎকালীন, এমন কি চিরন্তন, ধর্মজগতের দুই বিভিন্ন প্রান্তচরদের প্রতিনিধি। পরিব্রাজক যজন-যাজন-অধ্যয়নশীল জ্ঞানমার্গী ত্যাগী সন্ন্যাসী। শিষ্যটি আর কোন জীবনোপায় না দেখিয়া অদৃষ্টের নির্যাতনে, উদরান্ন-সংস্থানের একটি সহজ উপায়-হিসাবে ধর্মজীবনকে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার পরিচয় অপূর্ব। সে এমন একটি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে যে-বংশে কণ্ঠে যজ্ঞসূত্র লম্বমান থাকে, কিন্তু বাণীদেবীর কৃপা ঐ বংশে নাই। অন্নাভাবে নিপীড়িত হইয়া সে বৌদ্ধভিক্ষু সাজিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল না দেখিয়া সে চীবর ছিন্ন করিয়া পলাইয়া আসিয়া বর্তমানে এই পরিব্রাজকের শিষ্য হইয়াছে। সর্বত্যাগী, জ্ঞানমাত্রান্বেষী সন্ন্যাসীর শিষ্য সাজিয়াছে জ্ঞানহীন, নিরক্ষর, উদরান্ন-অন্বেষী মূর্খ ব্রাহ্মণ। দুই বিপরীতের মিলনে যে অসঙ্গতির সৃষ্টি হইতেছে, তাহাই এই প্রহসনে হাসির উপকরণ যোগাইতেছে। শাণ্ডিল্য বুঝিতেই পারে না, উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে সকলেই যখন পরিব্রাজককে প্রচুর দান করে, তখন পরিব্রাজক কেন ভিক্ষার জন্য ঘোরাঘুরি করেন? শাণ্ডিল্যের প্রশ্নের উত্তরে পরিব্রাজক যাহা বলেন, তাহাতে ভারতীয় সন্ন্যাসি-চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়। সন্ন্যাসী শুধুমাত্র নিজের জীবনধারণের জন্য

ভিক্ষা করেন, তাহার বেশি তাঁহার প্রয়োজন হয় না, সঞ্চয়ের বাসনা তাঁহার নাই, কষ্ট করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করায় তিনি মানশূন্য। বহু-গ্রহণের পাপ তাঁহার নাই, তিনি নিত্যভিখারী। কিন্তু শাণ্ডিল্য ভিক্ষুক সাজিয়াছে কেন? তাহার জীবনধারণের অন্য উপায় নাই বলিয়া। তাহার মাতুলাদি নাই, পিতা নাই, কাহারও নিকট হইতে সে এতটুকুও প্রসাদ পাইবে না। সুতরাং একমাত্র অন্নের জন্যই সে সাধু সাজিয়াছে—ধর্মের লোভে নহে। গুরুশিষ্যের এই আদর্শ-ভিন্নতা ও তজ্জনিত চারিত্রিক অসঙ্গতিই এই প্রহসনে হাসির উপকরণ যোগাইয়াছে। কিন্তু ইহা উৎকৃষ্ট humour-এর উদাহরণ। যে ভারতবর্ষে বাসনা-বিনির্মুক্ত সন্ন্যাসী মুক্তির জন্য তপস্যা করিতেছে, সেই ভারতবর্ষে তাঁহার শিষ্য-হিসাবে উচ্চবংশজাত গুণহীন মূর্খ যুবক উদরান্ন-সংস্থানের জন্য কপট সন্ন্যাসী সাজিয়াছে। 'শাণ্ডিল্য' তাই সুধু হাসির উপাদানই যোগায় না,—করুণাও আকর্ষণ করে। এই কপটতার পশ্চাতে রহিয়াছে জীবনধারণের অপরিহার্য প্রেরণা। কিন্তু শাণ্ডিল্য আমাদের করুণা আকর্ষণ করিয়া ট্র্যাজিক চরিত্র হইয়া উঠে নাই, তাহার চরিত্রের সহনযোগ্য অথচ অনমনীয় দুর্বলতা তাহাকে আদ্যন্ত কমেডীর নায়কের মর্যাদা দান করিয়াছে।

'কমিক' চরিত্রের অসঙ্গতি আর 'ট্র্যাজিক' চরিত্রের অসঙ্গতির মধ্যে বেশ খানিক পার্থক্য আছে -সেকথা আগেই মোটামুটি উল্লেখ করিয়াছি। এখানে প্রসঙ্গতঃ আবার বলি। ট্র্যাজিক চরিত্রের নিজস্ব এমন কতগুলি ধারণা-ভাবনা-জীবনচালনা থাকে, যাহার সঙ্গে তাহার সমগ্র জীবনবোধ জড়িত, উহা জীবন-মরণ-সমস্যা। সমস্ত বিশ্বের বিনিময়েও সে উহা বিসর্জন দিতে চায় না। উহার জন্য সে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তাহাদের একজন হইয়া মিলিতে পারে না। তাই সে পারিপার্শ্বিকের সহিত সংঘাত তোলে; পরিবেশকে আলোড়িত করে। তখন ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে, আদর্শে আদর্শে তীব্র সংগ্রাম সুরু হয়। গভীর, গম্ভীর পরিস্থিতির মধ্য দিয়া তাহার ফলে ভয়ানক পরিণামের সূচনা হয়। কমেডীর অসঙ্গতির মধ্যে এই ভয়ানকত্ব নাই। আদর্শের তীব্র সংঘাতে জীবনের রঙ্গমঞ্চ কলহের কুরুক্ষেত্র হইয়া উঠে না। অন্য চরিত্রের অসঙ্গতি আমাদের হাসির উপাদান হইলেও তাহা আমাদেরও যেমন ক্ষতি করে না, ঐ হাস্যাস্পদ চরিত্রেও মহান্ অনর্থ কিছু ঘটায় না। অনেক সময়ে আমরা শুধু এইটুকু ভাবি যে ঐ লোকগুলি ইচ্ছা করিলে জীবন থেকে ঐ অসঙ্গতি দূর করিতে

কমিক ও ট্র্যাজিক চরিত্রের পার্থক্য

পারিত, কিন্তু পারে না, ঐটিই তাহাদের দুর্বলতা। ঐ দুর্বলতা এক রকম ব্যাধির মতো উহাদের ঘাড়ে চাপিয়া লোকগুলিকে বেখাপ্পা করিয়া তুলিয়াছে। ঐ অভিভূতির অপদেবতাকে নামাইয়া দিবার জন্যই পারিপার্শ্বিক কৌতুককর সামান্য পীড়নের মধ্য দিয়া উহাদিগকে আক্রমণ করে, খোঁচা দিয়া ক্ষেপাইয়া আনন্দ পায়। 'ফল্‌ষ্টাফ' একগাদা মিথ্যা কথা সৃষ্টি না করিলে কি পারিত না? তাহার অদৃষ্ট-বিধাতা ইহা তাহার দুরপনের দোষ-হিসাবে সৃষ্টি করিয়াছিলেন কি? এই মিথ্যা কথা বলিয়া সে আনন্দ পায়। ইহা যদি চিরসত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মিথ্যাভাষণ হইত, তাহা হইলে আমরা মোটেই হাসিতাম না। অনৃতের আশ্রয়ে দ্রোণের মতো মহাবীরের মৃত্যু ঘটাইয়া ঐ একটুমাত্র মিথ্যা কুরুক্ষেত্রের মতো মহাযুদ্ধের ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করিত। ফল্‌ষ্টাফের মিথ্যায় চতুর্থ হেন্‌রীর রাজ্যও যাইবে না, সেনাদলও পরাজিত হইবে না, তবুও ফল্‌ষ্টাফ মিথ্যা কথা বলে, কারণ, ঐ অন্তঃসারশূন্য কুষ্মাণ্ডাকার ভীরু লোকটির মনে বাহবা পাওয়ার বাসনা রহিয়াছে। এই প্রবৃত্তি মানুষের চিরন্তন দুর্বলতা, কিন্তু ইহা ম্যাকবেথের উচ্চাশার মতো দুর্বলতা নহে। এ দুর্বলতাকে আমরা উপেক্ষা করিলে কাহারও কোন ক্ষতি হয় না, তাই উহা হাসির উপকরণ। ম্যাকবেথের দুর্বলতা দাবাগ্নির মতো মারাত্মক, অসহ্য; তাই উহার সংক্ষুব্ধ আত্মপ্রকাশে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্‌ভব হয়। 'শাণ্ডিল্য' চরিত্রে সহনযোগ্য দুর্বলতা আছে, ইচ্ছা করিলেই সে তাহা দূর করিতে পারিত। উহা মানুষের আয়ত্তে রহিয়াছে, তবুও উহা মানুষ ত্যাগ করিতে চায় না, তাই মানুষ অন্যের হাসির উপাদান হয়। শাণ্ডিল্যের অন্তরে যে অজ্ঞতার অন্ধকার রহিয়াছে, সে তাহা অধ্যয়নের মধ্য দিয়া দূর করিতে পারিত, কিন্তু সে কিছুতেই পরিব্রাজকের কথা শুনিয়া অধ্যয়ন করিবে না। শাণ্ডিল্য-চরিত্রের এই দুর্বলতা বা ত্রুটী পারিপার্শ্বিকের কোন মারাত্মক ক্ষতি যেমন করিতেছে না, তেমনি ইহার জন্য শাণ্ডিল্যের জীবনের গতি যে অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, এমন নয়। তাহার জন্য আমাদের চরম কোনো দুর্ভাবনা নাই বলিয়া তাহাকে লইয়া আমরা হাসিতে পারি। আবার, এই চরিত্রগুলি সবচেয়ে হাস্যকর হয় যখন উহারা তাহাদের মূর্খতা ও দুর্বলতা সংশোধনের চেষ্টা আদৌ না করিয়া বরং বিজ্ঞ পারিপার্শ্বিকের ভুল ধরাইয়া তাহাদিগের সংশোধন করিতে যায়। আবার, এই সব লোকের মুখেও যখন তাহাদের অজ্ঞাতসারে দুই-চারিটা গূঢ়ার্থব্যঞ্জক কথা বাহির হইয়া যায়, তখন ঐ চরম অসঙ্গতির

জন্য আমরা না হাসিয়া পারি না। এই সকল কারণে 'শাণ্ডিল্য'-চরিত্রও হাস্যরসাপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে।

আলোচনা করা যাক্।—

মোহগ্রস্ত কপট-সন্ন্যাসী শিষ্য শাণ্ডিল্যকে অধ্যয়নের মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞানদান করিবার জন্য পরিব্রাজক চেষ্টা করিতেছেন, কারণ, নিঃস্বার্থভাবে জ্ঞানবিতরণের দ্বারা জীবের কল্যাণ করাই সন্ন্যাসীর ধর্ম। কিন্তু যে শিষ্য উদরের চিন্তায় সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছে, প্রকৃত জ্ঞানার্জনের পিপাসা তাহার থাকিবে কি করিয়া? অজ্ঞ, অন্ধ জীবগণ যখন সত্যকার কল্যাণকে মোহবশে অস্বীকার করিতে চায়, তখন তাহাদের কৈফিয়তের অভাব হয় না, এবং শাস্ত্রের বাণী উদ্ধৃত করিয়া সেই উদ্ধৃতির অপব্যাখ্যা করিয়াই তাহারা শাস্ত্রকে অস্বীকার করিয়া থাকে। শাণ্ডিল্য পরিব্রাজককে অনুযোগ করিয়া বলিতেছে—সে পড়ুক আর না পড়ুক তাহাতে পরিব্রাজকের কি? পরিব্রাজক তো মুক্ত পুরুষ। মুক্তির নামে একশ্রেণীর সন্ন্যাসীর মধ্যে যে জড়ত্ব ও তামসিকতার উদ্ভব হইয়াছে এবং শাণ্ডিল্যের মতো দুষ্ট সন্ন্যাসীরা যে সেই জড়তা ও তামসিকতার আশ্রয় লইতেছে, প্রহসনকার ইঙ্গিতে আমাদিগকে সেই কথাই বলিতেছেন। যিনি প্রবৃত্তির বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নিঃস্বার্থভাবে জগতের কল্যাণ করেন, তিনিই মুক্ত পুরুষ। নির্লিপ্ততা মুক্তির লক্ষণ, মুক্ত পুরুষ রাগ-দ্বেষ-বিনির্মুক্ত। এখানে নির্লিপ্তির অর্থ এই নয় যে জগৎ অকল্যাণে পরিব্যাপ্ত হইলেও মুক্ত পুরুষ 'সকলই মায়ের খেলা' বলিয়া জগৎ হইতে মুখ ফিরাইয়া থাকিবেন। যে সকল দুষ্ট ধর্মাচারী জগৎ ও জীবনের সমস্যা দেখিয়াও নিজেদের প্রতিকারের শক্তি না থাকার জন্য নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে, তাহারাই পরিবেশকে ফাঁকি দিবার জন্য মুক্তির অর্থ করে কর্মহীনতা এবং নির্লিপ্তির অর্থ করে সব কিছুকে মায়া মনে করিয়া বসিয়া থাকা। ভগবান্ 'হৃষিকেশ' অর্থাৎ প্রবৃত্তিগুলির ঈশ্বর। তাঁহার প্রবৃত্তি নাই তাহা নহে। প্রবৃত্তিগুলি তাঁহার বশীভূত, তিনি প্রবৃত্তির অধীন নহেন। শ্রীভগবানের উপাসক সন্ন্যাসীও প্রবৃত্তিগুলিকে বশীভূত করিয়া নিজের ও জগতের কল্যাণে ঐগুলিকে নিয়োজিত করিবেন। উহাদিগকে অস্বীকার করা বা মারিয়া ফেলাই ধর্ম নয়, কারণ, উহারা মরিবার নয়। সাধারণ লোকের মধ্যে কপট ধর্মধ্বজীরা যে ধারণা প্রচার করিতেছে, তাহা হইল এই যে, জিতেন্দ্রিয় সন্ন্যাসীর কাম-ক্রোধ-লোভাদি মোটে থাকিবেই না। সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া শাণ্ডিল্য বলিতেছে, অক্রোধী সন্ন্যাসী

শাণ্ডিল্য

হইয়া পরিব্রাজক শাণ্ডিল্যকে তাড়না করিতেছেন কেন? পরিব্রাজক বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন যে 'অভ্যুপগত' শিষ্যের কল্যাণের জন্য তাহাকে তাড়ন স্মৃতিশাস্ত্রের দ্বারা সমর্থিত, ইহা পরিব্রাজকের 'আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি'র জন্য নহে।

শিষ্যটি জড় নয়; কপট। সে যখন বুঝিল যে আর তর্ক করিয়া লাভ নাই, তখন প্রসঙ্গটি এড়াইবার জন্য বলিল,—"একথা ছাড়িয়া দিন। ভিক্ষার সময় চলিয়া যাইতেছে।" পরিব্রাজক বলিলেন,—"মূর্খ! এখন তো কেবল প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন নয়।·········তাই চল, বিশ্রামার্থ এই উদ্যানে প্রবেশ করি।" শাণ্ডিল্যের মতে সন্ন্যাসী নিশ্চয়ই শালগ্রাম-শিলার সগোত্র। সন্ন্যাসিগণ যেহেতু 'বিগত-সুখ-দুঃখ-মোহাদি-স্বভাব', সেইজন্য তাঁহাদের শারীরিক বিশ্রামের প্রয়োজন কি? সন্ন্যাসী শিষ্যকে জ্ঞানদান করিবার জন্য দেহের বিশ্রাম ও আত্মার বিশ্রাম, দেহ ও দেহীর পার্থক্য প্রভৃতি বুঝাইতেছেন। এখানে পরিস্থিতি হাস্যাত্মক হইয়াছে এইজন্য যে, পরিব্রাজক যতখানি প্রকৃত নিষ্ঠার সহিত শিষ্যকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন, শিষ্যটিও ঠিক ততখানি কৌশলপূর্ণ অবহেলার সহিত না-বুঝিতেই চেষ্টা করিতেছে। গুরুতর সারল্য এবং নিষ্ঠার সুযোগ লইয়া শিষ্য যে তাহাকে প্রকৃতই ঠকাইয়া চলিয়াছে গুরু তাহা বোঝেন না বা বুঝিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। তাঁহার এই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ঠকিয়া যাওয়াই পরিস্থিতিকে হাস্যাত্মক করিয়া তুলিয়াছে।

এই দার্শনিক আলোচনা বেশিদূর টানিয়া লইলে প্রহসনটি নীরস প্রবন্ধের আকার ধারণ করিতে পারে, নাট্যকার তাই একটু লঘুহাস্যের অবতারণা করিলেন। উদ্যানে প্রবেশ করিতে গিয়া শাণ্ডিল্য ময়ূর দেখিয়া ভয় পাইয়া বলিতেছে, "আমাকে বাঘে ধরিয়াছে। আমাকে বাঘের মুখ থেকে রক্ষা করুন।" কিন্তু যখন সে জানিতে পারিল যে উহা বাঘ নহে,—ময়ূর, তখন সে আস্ফালন করিয়া বলিল, "ময়ূর? তাহা হইলে আমি উহার চক্ষু উৎপাটন করি।"

হাল্‌কা হাসির এই ক্ষুদ্র অবকাশটুকুর পরই আবার গুরুশিষ্যের গম্ভীর আলোচনা সুরু হইল। উদ্যানের অপূর্ব শোভা দেখিয়া শাণ্ডিল্য মুগ্ধ হইয়াছে। এইরূপ মুগ্ধ হওয়া পরিব্রাজকের মতে মূঢ়তা। ইন্দ্রিয়নিচয় দিন দিন যখন ক্ষীয়মাণ হয় এবং মহাকাল যখন একদিন জীবন হরণ করিবেই, তখন এই মর জগতে রমণীয় কি আছে? শাণ্ডিল্যের দৃষ্টি অত সুদূরপ্রসারী

নহে এই, নশ্বর জাগতিক আনন্দই তাহার নিকট যথেষ্ট। সুতরাং সে বলিতেছে, 'যাহা যতক্ষণ রমণীয় তাহাকে ততক্ষণ রমণীয় বলে।' পরিব্রাজক শিষ্যের এই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য আবার বলিলেন, 'বৎস, অধ্যয়ন কর।' 'অধ্যয়ন করিলে কি হইবে?' পরিব্রাজক বলিলেন, 'জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান হয়, বিজ্ঞান হইতে আসে সংযম, সংযম হইতে তপস্যা, তপস্যা হইতে যোগপ্রবৃত্তি, যোগপ্রবৃত্তি হইতে অতীত-অনাগত-বর্তমান তত্ত্ব-দর্শন হয়, এবং এই সকল হইতে অষ্টগুণ ঐশ্বর্যের লাভ হয়।'

গুরুর অন্য কোনো কথাই শিষ্যের অন্তরে রেখাপাত করিল না, কিন্তু ঐশ্বর্যের নাম শুনিয়া একটি অদ্ভুত প্রশ্ন শিষ্যের মনে আসিল।............ঐশ্বর্য-প্রভাবে সে অদৃশ্যভাবে পরগৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে কিনা? তাহা হইলে শাক্য-শ্রমণদের জন্য সদ্যপ্রবৃত্ত যে ভোজন-দ্রব্য রহিয়াছে, তাহা সে ভক্ষণ করিতে পারে। গুরু যখন চিন্ময় ব্রহ্মের উপাসনায় যোগযুক্ত, শিষ্য তখন জীবজন্মের একেবারে নীচের তলায়, অন্নময় কোষে পড়িয়া রহিয়াছে। গুরু শিষ্যকে যতই টানিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন, শিষ্য ততই অন্ধ দৃঢ়তায় নিজের প্রবৃত্তিধর্মকে আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। গুরুশিষ্যের আচার-আচরণ, ধারণা-ভাবনা ও কর্মের এই বৈপরীত্যই এই প্রহসনের হাস্যোৎপত্তির মূল কারণ। আবার, শাণ্ডিল্যের এই একগুঁয়েমির জন্য হাসিতে গিয়া আমরা তাহার প্রতি সমবেদনা না জানাইয়া পারি না, কারণ, শাণ্ডিল্যের শিক্ষাদীক্ষার অভাবের জন্য দায়ী তাহার জন্মগত পরিবেশ, এবং অন্নের প্রতি অন্ধ আসক্তির জন্য দায়ী তাহার দুর্ভাগ্য। অদৃষ্ট তাহাকে এমন মূঢ় ও মরিয়া করিয়া তুলিয়াছে, সুতরাং শাণ্ডিল্যের দুর্বলতা রহিয়াছে চরিত্রের অতি গভীরে, তাহাকে সহজে দূর করা যায় না। জীবনের জন্যই এখানে জীবনের মহত্তর সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা হইতেছে। যে 'চমৎকারা' 'অন্নচিন্তা'র জন্য কালিদাসও 'বুদ্ধিহারা' হন, যাহার জীবনে সেই অন্নচিন্তাই একমাত্র সমস্যা, সে পরমার্থ চিন্তা করিবে কি করিয়া? ক্ষুদ্র জীবনের প্রয়োজন এমনই করিয়া বৃহত্তর জীবনের সম্ভাবনাকে দূরে ঠেকাইয়া রাখে এবং মানুষকে বোধহীন বিবেচনাহীন পশুর স্তরে নামাইয়া দেয়। মানুষ নিয়তির হাতে এখানে উপায়হীন। মানুষের মন অদৃষ্টের পেষণে এমনই যন্ত্রবৎ অনুভূতিহীন হইয়া পড়ে যে পরে মহত্তর সম্ভাবনার হাজার সুযোগ আসিলেও ঐ যন্ত্রীভূত মন তাহা আর সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। কারণ, মানুষ তখন আর সুস্থ থাকে না, সংস্কারের ভূত তাহাকে পাইয়া বসে। এই সকল চরিত্র হাস্যরসের উপাদান হয় এইজন্য যে সাধারণ সুস্থ মানুষকে

একবার বুঝাইলে যাহা গ্রহণ করিতে পারে, এই লোকগুলিকে হাজার বার বুঝাইলেও তাহা গ্রহণ করিতে পারে না এবং প্রাণ গেলেও করে না। ইহাদের চরিত্রের এই অসঙ্গতির জন্য আমরা যখন হাসিতে যাই, তখন মানব-চরিত্রের রিক্ততার গভীর বেদনা অনুভব করিয়া আমরা কাঁদিয়াও ফেলি। শাণ্ডিল্যের গোটা চরিত্রই তাই হিউমারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। শাণ্ডিল্যের উক্তি, 'আপনি একা সুসমাহিত চিত্তে যোগই চিন্তা করুন, আমিও সুসমাহিত হইয়া অন্নের চিন্তা করি।.........ক্ষুধার জন্য অন্নগত চিন্তায় অন্নই আমার ধ্যান এবং অন্নই আমার মন্ত্র।'—তাহার চরিত্রেরই অভিব্যক্তি। সত্তানিহিত এই দুর্বলতার জন্যই সে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কারণ, 'অদত্তদান হইতে শিক্ষাপদের বিরমণ হয়, পানাতিপাত হইতে শিক্ষাপদের বিরমণ হয়।' সবচেয়ে বড় কথা, অকালভোজন হইতে শিক্ষাপদের বিরমণ হয়। সুতরাং যে ধর্মে, শাণ্ডিল্যের মতে, ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেই ধর্মই শ্রেষ্ঠ। এখানে আমরা দেখিতেছি যে, একটি মূর্খ শিষ্য নিজের প্রবৃত্তিধর্ম-পরিপোষণের সমর্থনে শাক্যবচনের অপব্যাখ্যাকেই প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, অন্যদিকে আমরা দেখিব, প্রবৃত্তিস্বার্থান্ধ মানুষ কল্যাণের নীতির অপব্যাখ্যার দ্বারা এই ধরনের বোধহীন মানুষগুলিকে কতখানি সর্বনাশের দিকে পরিচালিত করিতেছে। শাক্যবচনের অর্থবিকৃতি কতদূরে পৌছাইয়াছে তাহাও আমরা শাণ্ডিল্যের উক্তির মাধ্যমে বুঝিতে পারি। কারণ, এই ব্যাখ্যা শাণ্ডিল্যের মুখে দেওয়া হইলেও একধরনের বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যে নিজেদের প্রবৃত্তিস্বার্থ-পরিপোষণের জন্য এমনি ধরনের ব্যাখ্যা করিত, ইহাও সত্য। শক্তিমান্ প্রহসনকার একটি চরিত্রের মর্মগত সত্য-হিসাবে সমাজব্যাধির এই সার্বজনীন রূপটি দিতে পারিয়াছেন। চরিত্রের মাধ্যমে সামাজিক সত্য প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া ইহা নিছক সংশোধনাত্মক বা আক্রমণাত্মক গালাগালিতে পর্যবসিত হয় নাই।

সাধকজীবনের একটি প্রধান অন্তরায় হইল নারীর রূপলোলুপতা, শাণ্ডিল্য-চরিত্রে তাহা আছে। কিন্তু প্রহসনকার এমন সহজ স্বাভাবিক পরিবেশে, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাহা দেখাইয়াছেন যে উহাকে মানব-চরিত্রের সহজ ধর্ম বলিয়া মানিয়া লইতে অসুবিধা হয় না। প্রহসনে অনেক সময়ে মানবচরিত্রের কোনো দোষ-ত্রুটি-দুর্বলতার দিককে অতিচারী এবং উৎকটভাবে অসঙ্গত করিয়া দেখানো হয়, ফলে উহা হাস্যরসের উদ্রেক করিলেও উহার কৃত্রিমতা চরিত্রগুলিকে অবাস্তব করিয়া তোলে। প্রহসনও

তাই অনেক সময়ে ব্যঙ্গচিত্রে পর্যবসিত হয়। কিন্তু শক্তিমান্ বোধায়ন কবি 'ভগবদজ্জুকীয়ম্'-এর এই অংশে চরিত্র-চিত্রণে যেমন উৎকৃষ্ট নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তেমনি হাস্যরসের সুরটি আদ্যন্ত বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। এই অংশে গ্রন্থখানিতে সত্য সত্যই কমেডী ও প্রহসনের সমন্বয় হইয়াছে।

কেমন করিয়া, এখন তাহাই আমরা দেখিব।

একটি সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতি। পরিব্রাজক শাণ্ডিল্যকে উপদেশ দিতেছেন, দেহমধ্যে সমস্ত জগৎ সংক্ষিপ্ত করিয়া ইন্দ্রিয়গুলিকে আত্মায় যুক্ত করিয়া জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্ব উপলব্ধি কর, এবং কৃচ্ছ্র-সাধনার দ্বারা সমস্তের আত্মায় নিজের আত্মাকে উপলব্ধি কর। ঠিক সেই সময়ে চেটীর সঙ্গে একটি পানোন্মত্তা গণিকা অভিসারার্থ উদ্যানে প্রবেশ করিতেছে। রূপযৌবনসম্পন্না আসবমত্তা এই গণিকাটি জীবনের পঙ্কিল ভোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। একদিকে জ্ঞানমাত্রতনু বিশ্বপ্রেমিক সর্বত্যাগী পরিব্রাজক, অন্যদিকে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত জগতের অধিবাসিনী, ক্ষণভঙ্গুর-যৌবনগর্বিতা, ভোগোন্মত্ততার জীবন্ত উদাহরণ, গণিকা। এই দুইটির সঙ্গে যদি কায়মনোবাক্যগত বিনিময় হয়, তাহাই হইবে কৌতুকের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান। এই পরিব্রাজক এবং গণিকাটিকে উপগুপ্ত-বাসবদত্তায় পরিণত করা যাইবে না। তাহা হইলে তাহারা হাস্যরসের উপাদান হইবে না। তাই এই প্রবল অসঙ্গতিজনিত কৌতুক সৃষ্টি করিবার জন্য যোগপ্রভাব এবং যমপুরুষের প্রয়োজন হইল। পরিব্রাজক কি গণিকা কাহাকেও চিনিবার উপায় থাকিবে না, কিছুকালের জন্য উভয়েই 'একাত্ম' হইয়া পৌরাণিক অর্ধনারীশ্বর মূর্তির মতো ভগবদজ্জুকীয় হইয়া পড়িল। কিন্তু এই ব্যাপারে 'ভগবান্' বা 'আর্যিকা' কাহারও চারিত্রিক পরিবর্তন কিছুই হইল না। পরিস্থিতিটিকে অবলম্বন করিয়া চরিত্রের অপূর্ব বিকাশ হইতেছে শাণ্ডিল্যের। শাণ্ডিল্য-চরিত্র-বিকাশের জন্যই প্রহসনের অন্যান্য কাহিনী ও চরিত্রের আয়োজন।

গণিকা উদ্যানস্থিত 'কুসুম-সহকার-তিলকমণ্ডিত' শিলাপট্টে উপবেশন করিয়া গান করিতেছে আর প্রিয়ের আগমনের অপেক্ষা করিতেছে। সেই সঙ্গীত শাণ্ডিল্যের মনে কোকিলরবের মতো মধুর শুনাইতেছে। গণিকাকে দেখিয়া তাহার মনে হইতেছে তাহার সাধনা ধন্য। পরিব্রাজক বুঝিতেছেন, তাঁহার শিষ্যের আচরণ সন্ন্যাসিজনোচিত থাকিতেছে না, তাই মৃদু তিরস্কারে বলিতেছেন, 'যুক্ত-ব্যবহারী হও।' শাণ্ডিল্য বলিতেছে, 'রাগ করিবেন না, পরিব্রাজকগণের রাগিতে নাই।' অযুক্তব্যবহারী নিজে সংযত না হইয়া বরং যুক্তব্যবহারীর দোষ ধরিতেছে—হাসির কারণ নিশ্চয়ই

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস! গণিকা রূপযৌবনসম্পন্না, রূপমুগ্ধ যুবক প্রণয়ীর জন্য সাজিয়া সে অভিসারে আসিয়াছে, মৃত্যু যে তাহার শিয়রে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা সে জানিতেও পারিতেছে না। যমদূতের উক্তির মাধ্যমে যুবতী গণিকার জীবনের অমোঘ পরিণাম নির্মমভাবে ঘোষিত হইয়া হাস্যরসাত্মক প্রহসনখানিকেও মুহূর্তের জন্য বিষাদগম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে। 'শ্যামা, প্রসন্নবদনা, মধুরপ্রলাপা, মত্তা, বিশালজঘনা, বরচন্দনার্দ্রা, রক্তোৎপলাভ-নয়না, নয়নাভিরামা' এই বালাকে আমি শীঘ্রই যমসদনে লইয়া যাইব। গণিকার সৌন্দর্য, তারুণ্য এবং ভোগোন্মত্ততার উজ্জ্বল ছবি আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে না উঠিতে আমাদের কল্পনায় ইহার আশু নশ্বরত্ব দেখা দেয়।

যাহা হউক, গণিকা সর্পদষ্টা হইল। পরিব্রাজক মানুষের জীবনের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান জানেন, জন্মমৃত্যুর কার্যকারণ-সূত্র আবিষ্কার করিতে পারেন, তাই এই গণিকাটির জীবনের অমোঘ পরিণাম দেখিয়াও শান্ত রহিলেন। গণিকাটি সাধারণ মানবী! জীবনের প্রতি আকর্ষণ যেমন তাহার রহিয়াছে, তেমনি মৃত্যুর মুহূর্তেও সে তাহার প্রিয়পাত্রকে ভুলিতে পারিতেছে না। তাই 'রামিলক, আমাকে আলিঙ্গন কর' বলিয়া সে মূর্ছিত হইয়া পড়ে।

গণিকার মূর্ছা দেখিয়া শাণ্ডিল্য ব্যাকুল হইয়া পড়িল। পরিব্রাজক তাহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শাণ্ডিল্য যাহা বলিল, এই প্রহসনে তাহা সর্বশ্রেষ্ঠ হিউমারের উদাহরণ। গণিকা পরিব্রাজকের স্বজন, পরিব্রাজকের ন্যায় গণিকাও কাহাকেও স্নেহ করে না।

একদিক্ দিয়া ভাবিয়া দেখিলে সন্ন্যাসীর জীবন আর গণিকার জীবনে সত্য সত্যই সাদৃশ্য আছে। মানুষের সভ্যতা মুখ্যতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে স্নেহ-ভালবাসার অবলম্বনে। ভালবাসার বিকৃতির ফলে, উচ্ছৃঙ্খল যৌনজীবন-যাপনের জন্য নারী গণিকা হয়, কিন্তু তাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যর্থতা এইখানে যে, যে ভালবাসা তাহার নারীজীবনের ভূষণ ও একমাত্র অবলম্বন, বহু পুরুষের সঙ্গ করিতে গিয়া সে সেই ভালবাসাই হারাইয়া ফেলে; কাহারও প্রতি তাহার আসক্তি থাকে না। পরিব্রাজকও আসক্তিহীন, বৃহত্তর ভালবাসার আকর্ষণেই সে সংসারের ভালবাসার জাল ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসে; ফলে সে জগৎ এবং জীবন হইতে, আপন আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে, যাহা সত্য-সত্য পাইত, তাহা হইতে বঞ্চিত হয় এবং এক কাল্পনিক জগতের মোহে বাস্তব জগৎসম্বন্ধে উদাসীন থাকে। তাই গণিকা যেমন সত্যকার

জীবন থেকে বঞ্চিত, পরিব্রাজকও তাই। পরিব্রাজক সেইজন্য গণিকার সগোত্র। পরিব্রাজকের জীবনে ব্রহ্মপ্রাপ্তির আস্বাদন কত মধুর, তাহা জানি না, কিন্তু মানুষ-হিসাবে সে যে অনেকখানি বঞ্চিত ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শাণ্ডিল্যের উক্তি পরিব্রাজকজীবনের এই দুরপনেয় অভাবের দিক্‌টাই প্রকাশ করে বলিয়া উহা শ্রেষ্ঠ 'হিউমার'। জ্ঞানমোহ এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির নেশা পরিব্রাজককে বাস্তবজীবন হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাঁহার জীবন সুন্দর হইলেও সম্পূর্ণ নয়,—ঐকদেশিক, মহনীয় হইলেও ব্যর্থতাযুক্ত।

শিষ্যটিও কি জীবনকে সুস্থভাবে গ্রহণ করিয়াছে? তাহার জীবনের অপূর্ণতা অজ্ঞতাজনিত, অন্ধ-আকর্ষণপ্রসূত। গণিকার দুঃখে যে সে ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা কিন্তু মহতের বিশ্বপ্রেমজনিত নহে, গণিকাকে অবলম্বন করিয়া শাণ্ডিল্যের নারীরূপ-লোলুপতারই প্রকাশ হইতেছে। চেটী ইহা বুঝিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, 'মহাজনেরা সর্বানুকম্পী।' চেটীর এই উক্তি শাণ্ডিল্যের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়া উহা হাসির উদ্রেক করে। শাণ্ডিল্যচরিত্র-রূপায়ণে নাট্যকার সুন্দর মনস্তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। শাণ্ডিল্য গণিকাটির জন্য শোক করিতেছে কেন, যেহেতু গণিকা 'প্রিয়সম্পন্না' এবং 'মধুরগায়নী'। অনুকম্পা যে অন্তরের প্রচ্ছন্ন কামবাসনারই নামান্তর, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। শাণ্ডিল্য বলে, আমি ইহাকে স্পর্শ করিব। চেটী ভাবিতেছে, সন্ন্যাসী যৌগিক স্পর্শের দ্বারা বসন্তসেনাকে সুস্থ করিবে। কিন্তু কপট সাধুগণ মানুষের সরল ভক্তির সুযোগ লইয়া নারীদের অঙ্গস্পর্শ করিয়া তাহাদের কামবাসনা কেমন করিয়া চরিতার্থ করে, নাট্যকার এখানে তাহাই দেখাইতেছেন। অঙ্গস্পর্শের অনুমতি পাইয়া শাণ্ডিল্য গণিকার পাদস্পর্শ করিল, ইহার মধ্য দিয়া প্রচ্ছন্ন আকর্ষণের অভিব্যক্তি হইল। কিন্তু চেটী তাহা বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কিত হইয়া বলিল, 'পাদস্পর্শ করিবেন না।' শাণ্ডিল্য সতর্ক হইয়া বলিল, 'আমি আকুলাকুল, সুতরাং পা কি মাথা জানি না।' কিন্তু তাহার এই তীব্র আকুলতার কারণ তাহার পরবর্তী উক্তিতে আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। তালফলতুল্য তোমার অধোনম্র পীন স্তনযুগল যাহা কালে 'আচন্দনসিক্ত' হইত, আমি অভাগা তাহা (তোমার) জীবৎকালে আস্বাদন করিতে পারি নাই।

চেটী বুঝিতে পারিল, 'সানুক্রোশ' এই ব্রাহ্মণ আর্যিকাকে পরিত্যাগ করিবে না, সুতরাং কিছুক্ষণের জন্য শাণ্ডিল্যকে গণিকার রক্ষক নিযুক্ত করিয়া সে গণিকার আপনজনদের আনিতে গেল। শাণ্ডিল্য সুযোগ পাইয়া

যথেচ্ছ রোদন করিতে লাগিল। এই রোদনের প্রকৃত তাৎপর্য নারী-রূপাকর্ষণানভিজ্ঞ, যোগমাত্রসার পরিব্রাজক বুঝিতে পারিতেছেন না। সুতরাং তাঁহার চরিত্রও এখানে সূক্ষ্মভাবে হাসির উপাদান হইয়াছে। এই যোগসর্বস্ব সাধুটি মনে করেন, অধ্যয়ন করিলেই শাণ্ডিল্য এই অকারণ অযোগ্য মোহ হইতে পরিত্রাণ পাইবে, তাই এই মুহূর্তেও তিনি বলিতেছেন, 'বৎস, অধ্যয়ন কর।' শিষ্যের সেদিকে খেয়াল নাই। সে গুরুকে অনুরোধ করিল, গুরু যেন যোগবলে এই গণিকার চিকিৎসা করিয়া সুস্থ করেন। পরিব্রাজক ভাবিলেন, যোগের প্রভাব দেখাইয়া তিনি শিষ্যকে মুগ্ধ করিয়া জ্ঞানদান করিবেন, তিনি যোগবলে গণিকার দেহে প্রবেশ করিলেন।—ভগবদজ্জুকীয় নামের সার্থকতা এখন সম্পাদিত হইল। কিন্তু হাস্যরসের অবতারণায় এখন প্রধানতঃ বহিরঙ্গ অসঙ্গতিরই প্রাধান্য দেখা দিল। গণিকা-দেহে 'আর্যিকা' কিন্তু বাক্য ও আচরণে 'ভগবান্'। ভগবানের আর্যিকায় বা আর্যিকার ভগবানে পরিণতির অসঙ্গতিই হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে।

গণিকার দেহে পরিব্রাজকের আত্মা প্রবিষ্ট হইলে গণিকা উঠিয়া ডাকিল, 'শাণ্ডিল্য! শাণ্ডিল্য!!' শাণ্ডিল্য মনে করিল, গণিকা প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছে। সে সানন্দে বলিল, 'এই আমি।' বলিয়াই যখন সে গণিকাকে স্পর্শ করিতে গেল, তখন গণিকা বলিয়া উঠিল, 'অপ্রক্ষালিত ভাবে আমাকে স্পর্শ করিও না।' শাণ্ডিল্য মনে করিল, এই গণিকা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু যখন গণিকাও বলিয়া উঠিল, 'বৎস, অধ্যয়ন কর', তখন তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না,—এই ব্যক্তিও অজ্ঞানদের উপদেশ দেয়? সুতরাং শাণ্ডিল্য মনে করিল, পরিব্রাজকের নিকট গমন করিবে। অগ্রসর হইয়া দেখিল, পরিব্রাজক মৃত। শাণ্ডিল্য ভাবিল, এমন আদিযোগবিদ, বহুজ্ঞানবান্ উপাধ্যায়েরও মৃত্যু হয়।

এমন সময়ে চেটীর সহিত গণিকার মাতা প্রবেশ করিল। চেটী বলিল, 'উদ্যানে, এই আর্যা সর্পদষ্টা হইয়া আছেন।' 'বৎসে বসন্তসেনে, কি হইয়াছে?' বলিয়া বৃদ্ধা যখন কন্যাকে স্পর্শ করিতে যাইতেছে, তখন গণিকা বলিয়া উঠিল, 'বৃষলবৃদ্ধে, আমাকে স্পর্শ করিও না।' চেটী মনে করিল, বিষের বেগ খুব বাড়িয়াছে বলিয়া গণিকা প্রলাপ বকিতেছে, সুতরাং বসন্তসেনার মাতার আদেশে চেটী বৈদ্য ডাকিতে গেল।

রামিলক ও চেটীর প্রবেশ। চেটী বলিল, 'আপনার জন্য অপেক্ষা করিয়াই আর্যিকা মরিয়াছেন।' রামিলক সাগ্রহে বসন্তসেনার বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়া প্রেমনিবেদন করিতে অগ্রসর হইলে গণিকা বলিয়া উঠিল, 'ভো তামিস্র, আমার

বস্ত্রাঞ্চল ত্যাগ কর।' প্রণয়িনীর নিকট হইতে রামিলক এইরূপ প্রত্যাখ্যান-বাক্য আশা করে নাই। আসল ব্যাপারটি কি হইয়াছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিতেছে না। যে প্রসঙ্গে যাহার নিকট হইতে যে আচরণ সম্ভবপর, তাহার বিপরীত হওয়ার জন্যই হাস্যের উৎপত্তি হইতেছে। রামিলক চেটীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ব্যাপার কি?' চেটী কি করিয়া বলিবে? শুধু বলিল, 'যে অবধি আর্যিকাকে সর্পে দংশন করিয়াছে, সেই অবধি উনি এইরূপ অসম্বদ্ধ প্রলাপ বকিতেছেন।' রামিলক ঠিক অনুমান করিল—অন্য কোনো ব্যক্তির আত্মা ইহার শরীরে প্রবেশ করিয়াছে।

গণিকার চিকিৎসার জন্য একটি মূর্খ বৈদ্য প্রবেশ করিল। বৈদ্য কিছুক্ষণ চেষ্টা করিয়া আবার ঔষধ আনিতে প্রস্থান করিল। এমন সময়ে যমপুরুষ প্রবেশ করিয়া বলিল, যম এই বসন্তসেনাকে লইয়া যাইতে বলেন নাই, সে অন্য বসন্তসেনা।' কিন্তু বসন্তসেনাকে সজীব দেখিয়া এবং যোগীর দেহ প্রাণশূন্য দেখিয়া যমপুরুষ বুঝিল, বসন্তসেনার দেহে যোগী প্রবেশ করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। সুতরাং সে আপাততঃ যোগীর শরীরে গণিকার আত্মা প্রবেশ করাইয়া প্রস্থান করিল।

এইবার অসঙ্গতির চূড়ান্ত। পরিব্রাজক উঠিয়া পরিচারিকাকে ডাকিল। বলিল, 'রামিলক কোথায়?' রামিলক বলিয়া উঠিল, 'ভগবান্, এই আমি।' পরিব্রাজক যখন বলিয়া উঠিলেন, 'রামিলক আমাকে আলিঙ্গন কর, আমি মত্ত', তখন রামিলকের নিকট তাহা অসঙ্গত মনে হইল। সে বলিল, 'ভগবান, এইরূপ আলাপ আশ্রমবিরুদ্ধ।' ফলে তাহাকে আরো আশ্রমবিরুদ্ধ কথা শুনিতে হইল। পরিব্রাজক বলিলেন, 'আমি সুরাপান করিব।' এবার মহাতামিস্র শাণ্ডিল্যও সহ্য করিতে পারিল না। বলিয়া উঠিল, 'বিষ পান কর।' এবার শাণ্ডিল্য বুঝিল, কি করিয়া যেন একটি বিরাট পরিহাস সুরু হইয়া গিয়াছে। ভগবান্‌ও ভগবান্ নাই, আর্যিকাও আর্যিকা নাই, অথবা দুইজনে মিলিয়া 'ভগবদজ্জুক' হইয়া গিয়াছে। সত্যই তাই। অসঙ্গতির চরম হইল যখন বৃদ্ধা 'বৎসে বসন্তসেনে' বলিয়া ডাকিয়া উঠিলে পরিব্রাজক বলিল, 'আর্যে, এই আমি, আর্যে আমি বন্দনা করি।'

বৈদ্য আবার ফিরিয়া আসিল। গণিকা বলিল,—'মূর্খ বৈদ্য, তোমার পরিশ্রম বৃথা, তুমি যমকে জান না, তাই ইহাকে সাপে কাটিয়াছে বলিতেছ।' বৈদ্যটি ছাড়িবার পাত্র নয়, শাস্ত্র আওড়াইতেছে। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান তাহার অপূর্ব। শাণ্ডিল্যের মতো লোকেও তাহা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল।—'একপদ আওড়াইতে

গিয়াই ভুলিয়া গিয়াছ? তুমি ঠিক আমারই বয়স্য। এই বই নাও।' বৈদ্যমহাশয়ের যেমন শাস্ত্রজ্ঞান, তেমনি ব্যাকরণজ্ঞান। তিনি 'ত্রীণি সর্পাঃ ভবন্ত্যেতে' বলিতেই গণিকা বলিয়া উঠিল, 'অয়মপশব্দঃ "ত্রয়ঃ সর্পাঃ" ইতি বক্তব্যম্।' উপায়ান্তর না দেখিয়া বৈদ্য বলিল, 'ইহাকে যেমন তেমন সাপে কাটে নাই, একেবারে "বৈয়াকরণ সর্পে খাইয়াছে", সুতরাং চিকিৎসা সহজ নহে।' বৈদ্যপ্রবর চিকিৎসা করিতে না পারিয়া সসম্মানে প্রস্থান করিলেন। প্রহসনকার বৈদ্যচরিত্রের সমালোচনা করিলেও এই ধরনের সমালোচনা দীর্ঘ করিয়া প্রহসনের মূলরস ক্ষুণ্ণ করেন নাই। রচনায় তিনি যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার পর যমদূত আসিয়া প্রকৃত দেহে আত্মার সন্নিবেশ করিল, সকলে যথাস্থানে প্রস্থান করিল।

সংস্কৃত প্রহসনগুলির আলোচনা করিয়া আমরা দেখিলাম, বার্গ্‌সঁ হাস্য-রসোৎপত্তির কারণ যাহা যাহা বলিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার সকলই অবলম্বিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ কৌতুকের উদাহরণ সংস্কৃত প্রহসনে যেমন আছে, তেমনি সমাজ-সংস্কারের মনোবৃত্তি হইতে জাত তীব্র, তীক্ষ্ণ আঘাত-জর্জরিত ব্যঙ্গহাস্যও সংস্কৃত প্রহসনে রহিয়াছে। Satire এবং humour উভয় প্রকার হাস্যে সংস্কৃত প্রহসন ভরপুর। আপন শৈলীর বৈশিষ্ট্যে সংস্কৃত প্রহসন যে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপলাভ করিয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে স্বীকার করিতে হইবে। মলিয়ার মানুষের চরিত্রের যে সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি-দুর্বলতা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তেমনি ধরনের ব্যঙ্গ সংস্কৃত প্রহসনে ছিল, তাহার সঙ্গে অসঙ্গতিজনিত কৌতুকহাস্যও যথাপরিমাণ মিশিয়াছিল। বাংলা প্রহসনের আলোচনায় আমরা সংস্কৃত ও ইংরাজী-ফরাসী প্রহসনের প্রভাব আলোচনা করিব। তাহার আগে দেখিতে হইবে বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব হাস্যরসের পরিবেষণ কেমন হইয়াছিল।

ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব আসিবার পূর্বে আমাদের দেশে যে বাংলা সাহিত্য ছিল, তাহার মধ্যে হাস্যরসের উপকরণ কম ছিল না। অবশ্য যাঁহারা মনে করেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের উদাহরণে উদর এবং উদরের নিম্নভাগ ভিন্ন কিছুই পাওয়া যায় না, সেই সমালোচকপ্রবরদের সঙ্গে আমি একমত হইতে পারিলাম না। উৎকৃষ্ট হাস্যরসের উদাহরণ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে যথেষ্ট রহিয়াছে। কিছু কিছু উদ্ধার করিতেছি।

উদাহরণগুলি প্রাচীন বাংলা কাব্যের, কারণ প্রাচীন বাংলায় 'নাটক' ছিল না। পরবর্তীকালের যাত্রায় কুরুচি ও অশ্লীলতাপূর্ণ ভাঁড়ামি প্রবেশ করিয়াছিল

—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবুও বিদ্যাসুন্দর যাত্রার শতদোষ সত্ত্বেও তাহার মধ্যে শ্লেষসৃষ্টির যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের হাস্যরস

নারায়ণদেবের 'পদ্মাপুরাণ'। চাঁদ সদাগরের নির্দেশে ঘটক লক্ষ্মীন্দ্রের বিবাহের জন্য পাত্রী খুঁজিতে যাইবে। যে যে দেশের কন্যার সম্বন্ধে তাহার জানা আছে, ঘটক সেই-সেই দেশের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ-সম্বন্ধে চাঁদ সদাগরকে অবহিত করিতেছে। এক দেশের প্রথা এইরূপ,—'জ্যেষ্ঠভাই বিয়া করে ভগ্নীপতির শালী।' ভগিনীবিবাহের প্রথা শোভন ও সঙ্গত নহে। এই অসঙ্গত প্রথাটিকে বাক্যগত অসঙ্গতির মাধ্যমে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। সোজাসুজি বোন না বলিয়া 'ভগ্নীপতির শালী' বলায় হাস্যরস জমিয়াছে। বেদনামিশ্রিত অশ্রুসিক্ত হাসির উদাহরণও নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে আছে। বৃদ্ধা সনকা সন্তানলাভার্থ সাজিয়া-গুঁজিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়াছে। ঠিক 'হস্তীর পার্শ্বে যেন হস্তিনী উপস্থিতা।' কিন্তু এই স্বয়ং-অভিসারিকার প্রতি স্বামী যখন অগ্রসর হইল, তখন হঠাৎ সনকা বলিয়া উঠিল, 'লাজ নাই চান্দো তোর মুখে পাকাদাড়ি। ঘরেতে জাগয়ে মোর সাত বধূ রাঁড়ী।' সনকার এই অসঙ্গত আচরণে হাসি পায় সত্য। কিন্তু সন্তানহারা জননীর বেদনা এই উক্তির মধ্যে আভাসিত হইয়া উঠে। এই মাতৃহৃদয়ের বেদনা চরম অসঙ্গতির মধ্যে প্রকাশিত হয়, সনকা যখন 'চান্দোরে ব্লিছে বাপ মনের আগুনে।'

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল। ধনপতি সদাগরের দাসী দুর্বলা বাজার করিয়া আসিয়াছে। রাজ্যের যত কানাকড়ি চালাইতে তাহার অনেক সময় চলিয়া গিয়াছে। মাঝপথে সে এবাড়ী ওবাড়ী বেড়াইয়াও আসিয়াছে। বাড়ী ফিরিয়া দেরী হইবার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া বলিল, বাজারে আজ সব কিছুই দুর্মূল্য, ঘুরিয়া ফিরিয়া সস্তায় বাজার করিতে গিয়া তাহার দেরী হইয়া গিয়াছে। এখানে অসঙ্গতি শুধু বাক্যে বা সামান্য আচরণে নয়, একেবারে চরিত্রের মর্মমূলে। মুকুন্দরাম চরিত্রগত অসঙ্গতিজনিত হাস্যরস-সৃষ্টিতে এত সুদক্ষ ছিলেন যে অতি সামান্য ইঙ্গিতে তিনি অপূর্ব হাসির চিত্র রচনা করিতেন। প্রভুর শয়নের জন্য দুর্বলা দাসী বিছানা করিতে গিয়াছে, কিন্তু অমন সুন্দর সুকোমল বিছানা দেখিয়া সে আর লোভ সামলাইতে পারিল না, কেহ না দেখে এমনভাবে একবার গড়াগড়ি খাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। এই ক্ষুদ্র আচরণের মধ্য দিয়া দুর্বলা-চরিত্রের একটি বিশেষ দিক্ কবি ফুটাইয়া

তুলিয়াছেন। দুর্বলা দাসী হইলেও নারী, উত্তম পুরুষের কোমল শয্যা উপভোগের অতৃপ্ত বাসনা রহিয়াছে তাহার অন্তরে, এই অতৃপ্ত বাসনার প্রকারান্তরে চরিতার্থতা হইল এই আচরণের দ্বারা। চরিত্রবিকাশী হিউমারের ইহা একটি চমৎকার উদাহরণ। এখানে প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখা যায় যে মুকুন্দরামের সৃষ্ট ভাঁড়ুদত্ত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কেন চিরকালের সাহিত্যে একটি উৎকৃষ্ট হাস্যরসের উদাহরণ। এমন একটি বাস্তব এবং হাস্যরসসমুজ্জল চরিত্র বাংলা সাহিত্যে আর সৃষ্ট হয় নাই। কেবল ভারতচন্দ্রের 'হীরামালিনী' ইহার কাছাকাছি গিয়াছে মাত্র।

প্রাচীন যাত্রায় মুখ্য অবলম্বন ছিল ভক্তিমূলক পৌরাণিক কাহিনী। দার্শনিকতার গুরুগাম্ভীর্যের মধ্যে লঘুচাপল্যের অবকাশ কম ছিল বলিয়া কাহিনীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি-সম্পর্কযুক্ত হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ যাত্রায় হইতে পারে নাই। তাই জনমনোরঞ্জনের জন্য হাস্যরসের উপাদান অর্বাচীন যাত্রায় কাহিনীর বাহির হইতে আমদানী করিতে হইয়াছে। সেইজন্য শেষের দিকের যাত্রায় ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানী, মেথর-মেথরানী প্রভৃতির চরিত্রের মাধ্যমে যাত্রাওয়ালাকে হাস্যরস-সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। ইহাদের মাধ্যমে উন্নত হাস্যরস-সৃষ্টির অবকাশ যাত্রায় তাই কখনও সৃষ্টি হয় নাই। অর্বাচীন যাত্রায় হাস্যরসের অবতারণায় প্রধান স্থান অধিকার করিল বিদ্যাসুন্দর-যাত্রার 'হীরামালিনী'। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, হীরামালিনী নীচজাতীয়া কুরূপা, বৃদ্ধা কুট্টনীমাত্র। বিদ্যাসুন্দরের দেহ-সর্বস্ব গোপন অনঙ্গলীলার সে দূতী, কৃষ্ণযাত্রার বৃন্দাদূতীর মহনীয়তা তাহার চরিত্রে নাই। তাহাকে অবলম্বন করিয়া যে হাস্যরসের অবতারণা হইবে, তাহা বিকৃত কামের ভোগোন্মত্ত অভিব্যক্তি মাত্র। হইয়াছেও তাহাই। সেই ভোগোপকরণের ক্লেদাক্ত দুর্গন্ধ যাহাতে না আসিতে পারে, তাহার জন্য সাহিত্যিকগণ কিছু অলঙ্কারের সুগন্ধযুক্ত মসলার প্রলেপ দিয়াছেন মাত্র। আর সে অলঙ্কারও প্রধানতঃ শ্লেষালঙ্কার।

মোটামুটি এই কথা বলিয়া রাখা ভাল যে প্রাচীন বাংলা কাব্যে যে উৎকৃষ্ট হাস্যরসের উদাহরণ মাঝে মাঝে পাওয়া গিয়াছে, বাংলা যাত্রায় তাহার দর্শন আমরা পাই না। সংস্কৃত প্রহসনগুলির প্রভাব বাংলা যাত্রায় লক্ষ্য করা যায় না। কারণ, সংস্কৃত প্রহসন এবং বাংলা যাত্রার উৎপত্তির কারণ ও উদ্দেশ্য এক নয়। আধুনিক যুগের নাটকের মতো আধুনিক যুগের প্রহসন কমেডীও ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তবে সংস্কৃত নাটক-প্রহসনের প্রভাবও তাহার উপর কম নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

[বাংলা প্রহসনের উৎপত্তির যুগ—রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু]

রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকখানি নাটকও নহে, প্রহসনও নহে, কিন্তু গ্রন্থখানির মধ্যে হাস্যরস পরিবেশন করা হইয়াছে। সেই হাস্যরসের প্রকৃত বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যে সত্যকারের প্রহসন রচনার পথপ্রদর্শক মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁহার 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রেঁা' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক প্রহসন। পরবর্তী কালে দীনবন্ধু মিত্র প্রহসন-রচনায় কৃতিত্ব দেখাইলেন। দীনবন্ধুর উপর মধুসূদনের প্রভাব পড়িয়াছে, কারণ, দীনবন্ধুর প্রহসনগুলি মধুসূদনের প্রহসন দুইখানির পরে রচিত হইয়াছে। কিন্তু দীনবন্ধুর হাস্যরসসৃষ্টির ক্ষমতা যে মূলতঃ মধুসূদনের প্রভাবনিরপেক্ষ হইয়াই প্রকাশ পাইয়াছিল, 'নীলদর্পণ নাটক' আলোচনা করিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিব। 'নীলদর্পণ' প্রহসন নহে, বিয়োগান্ত নাটক। তবুও এই নাটকের মধ্যে দীনবন্ধুর হাস্যরস-সৃষ্টির দোষগুণ যাহা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই ক্রমবিকশিত হইয়াছে তাঁহার পরবর্তী রচনায়। সুতরাং বাংলা প্রহসনের আলোচনা করিতে হইলে 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' এবং 'নীলদর্পণ' নাটকের আলোচনা অবশ্যই করিতে হইবে।

বাংলা প্রহসনের উৎপত্তিতে রামনারায়ণ তর্করত্নের দান

রামনারায়ণ কৌলীন্যপ্রথার দোষ দেখাইয়া 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক রচনা করিতে অনুরুদ্ধ হন। সুতরাং তাঁহার রচনাটি নিছক লঘুনাট্য হইতে পারে না। কুলীনকন্যাদের দুর্দশার বর্ণনা, কুলীনবধূদের দুর্ভাগ্যের বিবরণ ইহার মধ্যে আছে। কিন্তু নাটকখানির মধ্যে আর একটা দিক্‌ও রহিয়াছে। যাহারা এই কৌলীন্যপ্রথার ধারক এবং বাহক তাহাদের চরিত্রের নির্মম সমালোচনা করিতে গিয়া রামনারায়ণ ব্যঙ্গের আশ্রয় লইয়াছেন। এই চরিত্রগুলির দোষ তিনি নির্মমভাবে উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। ইহাদের আচার-আচরণ, ধারণা-ভাবনার অসঙ্গতি ও কদর্যতার চিত্র তিনি অঙ্কন করিয়াছেন। সমাজ-সংস্কারকের এই সংশোধনী মনোবৃত্তিসঞ্জাত ব্যঙ্গ 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটককে হাস্যরসাপ্লুত করিয়াছে। এই হাস্যরসসৃষ্টিতে রামনারায়ণের মৌলিকতা সামান্য কিছু থাকিলেও পণ্ডিত তর্করত্ন মহাশয় সংস্কৃত প্রহসনের রচনাশৈলীর দ্বারাই

প্রভাবান্বিত হইয়াছেন বেশি। তবে 'ভগবদজ্জুকীয়ম্' বা 'মত্তবিলাসম্'-এর মতো উচ্চাঙ্গের প্রহসনের প্রভাব রামনারায়ণের নাটকে দেখা যায় না।

রামনারায়ণের উপর সংস্কৃতের প্রভাব

'লটকমেলকম্' জাতীয় নিকৃষ্টধরণের প্রহসনই তাঁহার নাটকে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহার কারণও রহিয়াছে—'লটকমেলকম্'-রচয়িতা সমাজের তথাকথিত অভিজাতগণের চরিত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাহাদের আচরণের কদর্যতা উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন, প্রশংসা করিবার মতো তাহাদের চরিত্রে কিছুই পান নাই। আর এই দুর্বলতার মধ্যে মহনীয়তাও এমন কিছুই নাই, যাহার জন্য এই চরিত্রগুলি আমাদের এতটুকু সমবেদনা আকর্ষণ করিতে পারে, তাই এই চরিত্রগুলির প্রতি লেখকের আক্রমণ নির্মম এবং বিদ্বেষপূর্ণ। রামনারায়ণের নাটকেও তাই এই আক্রমণ এবং বিদ্বেষ তীব্রভাবে মূর্ত হইয়াছে। এই ধরনের প্রহসন একটু অতিরঞ্জিত হইতে বাধ্য, রামনারায়ণের রচনায় তাই অতিরঞ্জিতও খানিকটা আছে। ব্যঙ্গ-চরিত্রগুলি চিরদিনই একটু অস্বাভাবিক এবং বিকৃত হয়, 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকের চরিত্রগুলিও তাই একটু অস্বাভাবিক ও বিকৃত হইয়াছে। সব কুলীনই যে শতে শতে বিবাহ করিয়া খাতায় হিসাব রাখিতেন এবং অমুকের কন্যা কি আমার বধূ না পুত্রবধূ এইরূপ সংশয়ে পতিত হইতেন, তাহা নিশ্চয়ই নহে। অথবা বিবাহের পর একদিনের জন্য স্ত্রীর মুখ না দেখিয়া কুলীনদের সকলেরই যে একেবারেই অকস্মাৎ কুড়ি-বাইশ বৎসরের পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইত, তাহাও নহে। তবে প্রহসনকার একটি দুইটি অসঙ্গত চরিত্র বা অবাঞ্ছিত ঘটনাকে মানদণ্ড ধরিয়া সমাজের কদর্যতার রূপকে প্রকট করেন। প্রহসনের ক্ষেত্রে এই ঐকদেশিক দৃষ্টিসঞ্জাত অতিরঞ্জিত ঘটনা বা চরিত্রকে আমরা মানিয়া লইয়া থাকি। কিন্তু প্রহসনকারের এইটুকু লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অতিরঞ্জন এবং অসঙ্গতি যেন একেবারে অবাস্তবতার পর্যায়ে নামিয়া না যায়। এই লক্ষ্যটুকু তিনি যদি না রাখিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার রচনা প্রকৃষ্ট রসসৃষ্টি না হইয়া ইচ্ছাকৃত বিদ্রূপবৃষ্টির নামান্তর হয়। সংস্কৃতে 'লটকমেলকম্', 'হাস্যার্ণব' প্রভৃতি এইজাতীয় রচনাই হইয়াছে। উহাতে রক্তমাংসের মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র 'অনৃতাচার্য', 'অধর্মরুচি', 'বিবাহবণিক' প্রভৃতি চরিত্রও জীবন্ত মানুষ হয় নাই। এই নামগুলি আমাদিগকে 'লটকমেলকম্' প্রহসনের 'কুলব্যাধি', 'জন্তুকেতু', 'ঝগড়সার', 'অজ্ঞানরাশি', 'কলহপ্রিয়া' প্রভৃতি নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। নামগুলি proper name হইলেও non-connotative নয়, ইহাদের বাক্য এবং কার্যও 'লটকমেলকম্'-এর পাত্রপাত্রীগুলির অনুরূপ।

'লটকমেলকম্' নাটকে যেমন মূর্খ ও দুষ্ট চরিত্রগুলি তাহাদের মূর্খতা ও দুষ্টতার পরিচয় নিজেদের মুখেই দিতেছে, 'কুলীনকুলসর্বস্বে'ও তাহাই করিতেছে। ঘটক অনৃতাচার্য তাহার মতো ঘটকের পরিচয় দিতেছে, 'প্রবঞ্চনা-পরায়ণ, মুখে মিষ্টি আলাপন...... বিবাদে নারদ সম, মূর্তিমান্ যেন তম' প্রভৃতি বলিয়া। 'লটকমেলকম্'-প্রহসনে মূর্খবৈদ্য জন্তুকেতু বলিতেছে,—

'ব্যাধয়ো মদুপচারলালিতা মৎপ্রযুক্তমমৃতং বিষং ভবেৎ।
কিং যমেন সরুজাং কিমৌষধৈর্জীবহর্তরি পুরস্থিতে ময়ি॥'

উভয়ের চরিত্র এবং উক্তি একই ধরনের।

হাস্যরস-সৃষ্টিতে রামনারায়ণ মৃচ্ছকটিকের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' গ্রন্থে এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি।

এখানে আর একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। রামনারায়ণের সময়কার দর্শকগণ যে যাত্রার স্থূল হাস্যরস বা ভাঁড়ামি কিছু না কিছু পছন্দ করিত, রামনারায়ণ নিশ্চয়ই তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কুলীন-কুল-সর্বস্বের মূল কাহিনীর সঙ্গে রসিকা নাপিতানীর কোনো ঘনিষ্ঠ যোগ না থাকিলেও তিনি নিতান্ত দর্শকগণের মুখ চাহিয়াই 'বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা'র হীরা মালিনীর আদর্শে এই চরিত্রটির পরিকল্পনা করিয়াছেন। 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' গ্রন্থে উদাহরণ দিয়াছি বলিয়া এখানে আর উদ্ধৃতি দিলাম না।

হাস্যরস-সৃষ্টিতে রামনারায়ণের মৌলিকতাও 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটকে লক্ষ্য করিবার মতো। 'সুমতি' তাহার 'শিশু' এবং 'উদর-পরায়ণে'র চরিত্র-অবলম্বনে রামনারায়ণ সহজ, সরল এবং বিশুদ্ধ হাস্যরস সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১১৩-১১৬) এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ইহাই বাংলা নাট্য-সাহিত্যে প্রথম বিশুদ্ধ হাস্যরস-সৃষ্টি। এই চরিত্র-কয়টিকে অবলম্বন করিয়া রামনারায়ণ দেখাইলেন যে, চরিত্রের সহজ, স্বাভাবিক, বাস্তব অভিব্যক্তির মধ্যেও হাস্যরস নিহিত থাকে। রামনারায়ণ তাঁহার প্রচারমূলক নাটকে এই চরিত্র-তিনটি অবলম্বনে হাস্যরস-সৃষ্টির যে ধারা প্রবর্তন করিলেন, মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনগুলিতে সেই ধারারই সার্থক ক্রমবিকাশ হইল এবং তাহা আরো সৌন্দর্য এবং বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত হইয়া দেখা দিল।

রামনারায়ণের মৌলিকতা

রামনারায়ণ পরবর্তী কালে 'উভয় সঙ্কট', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রভৃতি কয়েকখানি প্রহসন রচনা করেন। উহা যেমন খুব উন্নত ধরনের নয়, তেমনি

উহাতে রামনারায়ণের মৌলিকত্বও কিছুই নাই। এইগুলি রচনার বহুপূর্বে মধুসূদনের প্রহসন দুইখানি এবং দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ'-নাটকখানি রচিত হয়, সুতরাং প্রহসনের ধারা নির্ণয়ে রামনারায়ণের প্রসহনগুলির আলোচনা না করিলেও চলিবে।

এইবার আমরা দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণের অন্তর্গত হাস্যরসের আলোচনা করিব। একজন প্রবীণ অধ্যাপক মন্তব্য করিয়াছেন, 'হাস্য ও করুণ রসের এমন সংমিশ্রণ দীনবন্ধুর পূর্বে দেখা যায় নাই। পরেও খুব অধিক পাওয়া যায় না।'* উক্তিটি সত্য। এই কথাটিই অন্যভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, দীনবন্ধু মিত্রই বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম সার্থক 'হিউমার' সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার হাস্য চরিত্র এবং ঘটনার উপর বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া হয় না, উহা চরিত্রেরই স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি।

একটু আলোচনা করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নীলদর্পণের হাস্যরস-সৃষ্টির প্রচেষ্টা আমাদিগকে 'কুলীন-কুল-সর্বস্বে'র অংশ-বিশেষ মনে করাইয়া দেয়। শ্লেষের সাহায্যে শব্দার্থের ভিন্নতা সৃষ্টি করিয়া (ইংরাজী 'pun' অলঙ্কার, অবলম্বনে) রামনারায়ণ সুমতি এবং তাহার শিশুকে দিয়া হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন। নীলদর্পণ নাটকে আদুরী ও সৈরিন্ধ্রীব কথোপকথনে সেই একই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। সৈরিন্ধ্রী আদুরীকে তামাক-পোড়ার কৌটাটা আনিতে বলিল, কৌটাটা রান্না-ঘরের রকে উঠিতে ডানদিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।

নীলদর্পণে হাস্যরস

আদুরী চাল পর্যন্ত বুঝিতে পারিয়াছে, বাক্যের আর কোনো শব্দই সে অনুধাবন করে নাই। চালে উঠিবার জন্য তাই সে মই আনিতে যাইবে। সৈরিন্ধ্রী বলিল, তুই রক কারে বলে জানিস্‌নে, তুই ডান বুঝিস্‌নে? 'ডান' শব্দটি আদুরীর কানে গিয়াছে। কিন্তু কথাটি সে উলটা করিয়া বুঝিল, 'ডান' শব্দে দক্ষিণ' না বুঝিয়া সে বুঝিল 'ডাইনী'। ডাইনী হইতে আদুরী কিছুতেই রাজী নয়, ডাইনীর দোষগুণ কি, আদুরী তাহা জানে না, তবে এইটুকু সে জানে যে, ডাইনী অতিরিক্ত 'বুড়ী'। আদুরী অত বৃদ্ধা হইতে চায় না, 'মুই কি ডান হবাব মতো বুড়ো হইচি।' কিন্তু চায়না কেন? আদুরী বৃদ্ধা হইলেও নারীজনোচিত স্বাভাবিক দুর্বলতা তাহার আছে। বিগত দিনের দাম্পত্য-জীবনের মধুময় স্মৃতি এখনও তাহাকে ব্যাকুল করে। স্বামীর আদরের

---

* দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ—শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী সম্পাদিত,—অবতরণিকা পৃষ্ঠা (১৪)।

কথা বলিতে গিয়া সে আনন্দে শতমুখ হয়, বৃদ্ধার এই তরুণীজনোচিত পুলকিত প্রেমস্মৃতির আস্বাদন অসঙ্গতিজনিত হাস্যরসের সৃষ্টি করে। এই হাসি আরো প্রগাঢ় হয় এইজন্য যে সৈরিন্ধ্রী যে তাহাকে লইয়া তামাসা করিতেছে, আদুরী তাহা বুঝিতে পারে না। জিজ্ঞাসাটিকে অকপট মনে করিয়া সেও অকপট উৎসাহে নিবিড় সারল্যে আপন দাম্পত্যপ্রেমের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া যায়। কারণ, আদুরী স্বামী এবং যৌবন হারাইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও যুবতীজনোচিত মনোভাবটি হারায় নাই। তাই সে নিজেকে বৃদ্ধা মনে করিতে পারে না, সুযোগ পাইলে সেও এই তরুণী বধূদের মতো নায়িকা সাজিতে পারে। বৃদ্ধার এই তরুণায়ন-বাসনাই হিউমারের সৃষ্টি করিয়াছে। রেবতী যখন বলে, 'ক্ষেত্রকে ছোট সাহেব ·····তার সঙ্গে একবার কুটির বারান্দার ঘরে যাতি বলেছে', তখন আদুরীর মনে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হইল। সাহেবের কুটিতে যাইতে আদুরীর অন্য কোনো দিক্‌ দিয়া আপত্তি নাই, পেঁয়াজের গন্ধটুকু সে সহ্য করিতে পারিবে না। বৃদ্ধার অন্তরস্থিত অভিসার-বাসনার সঙ্গে চিরাচরিত আচরণ-জনিত সংস্কারের দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। পলাণ্ডুরস তখনও উচ্চনীচ কোনো স্তরের হিন্দুগৃহে নিত্য আস্বাদ্য মহাবস্তু হইয়া উঠে নাই; তাই এই হিন্দুবৃদ্ধাটির প্রথম আপত্তি হইল সাহেবের পেঁয়াজের গন্ধে। এখানে অবশ্য ভাবিতে পারি, নিম্নশ্রেণীর এই বিধবার ম্লেচ্ছপুরুষ-সংসর্গে আপত্তি নাই সতীত্বের মর্যাদা তাহার নিকট বড় নহে। ব্যাপারটি ঠিক তাই নয়, অন্তরের অতৃপ্ত আসঙ্গ-লিপ্সার সঙ্গে চিরাচরিত সংস্কারের দ্বন্দ্বও অতি অল্প কথায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। পর-পুরুষের সংস্পর্শ, এমন কি তাহার সঙ্গে বাক্যালাপও হিন্দুনারীর পক্ষে নিন্দনীয়, আদুরী তাহা জানে। 'কুটির বিবির লজ্জা নাই', শরম নাই; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়িয়া সে রাস্তায় বাহির হইয়াছিল। 'বৌ'-মানুষে ঘোড়ায় চাপে, পরপুরুষের সঙ্গে বেড়ায়, আদুরী ইহা কি করিয়া সহ্য করিবে? এদেশে ভাসুরের সঙ্গে ভ্রাতৃবধূ হাসিয়া কথা বলিলেও লোকে নিন্দা করে। অল্পকথায় দীনবন্ধু যেমন আদুরীর মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছেন, তেমনি বৃদ্ধার যুবতীসুলভ প্রেমবাসনার ইঙ্গিত করিয়া অসঙ্গতিজনিত হাস্যরসও সৃষ্টি করিয়াছেন। তবে এই অসঙ্গতি বাহিরের নহে, অন্তরের সংস্কারের,—চরিত্রের। দীনবন্ধুর 'আদুরী' চরিত্রের সমগোত্রীয় চরিত্র বাংলা নাট্যসাহিত্যে পরবর্তী কালে সৃষ্ট হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালের 'রাণা প্রতাপসিংহ' নাটকে 'রেবা'র ধাত্রী এইজাতীয় চরিত্র। 'রেবা' শুনিতে না চাহিলেও সে তাহার দাম্পত্যপ্রেমের ইতিহাস এই রাজ-কুমারীকে শুনাইবেই।

আহুরী বৃদ্ধা হইতে পারে, বোকা হইতে পারে, কিন্তু সে নারী, তাহারও একদিন দাম্পত্যজীবন ছিল। সুতরাং দম্পতীর অন্তরের কথা সে যে বুঝিতে পারে, তাহার একটিমাত্র বাক্যে তাহা চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে। নবীনমাধব নেপথ্য হইতে ডাকিল, 'আহুরী', মাতা সাবিত্রী বুঝিলেন, পুত্র জল চাহিতেছে, তাই শুধু সৈরিন্ধ্রীকে যাইতে বলিলেন। সৈরিন্ধ্রী এই ডাকের অর্থ বুঝিয়াছে, সে তাই তামাসা করিয়া জনান্তিকে আহুরীকে বলিল, 'আহুরী তোরে ডাক্‌ছে।' এই 'তোরে' ডাকটির অর্থ—স্ত্রীর কর্তব্যটি বৃদ্ধা দাসী পালন করিয়া আসুক। আহুরী বুঝিয়াই সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত উত্তর করিল, 'ডাকচেন মোরে, কিন্তু চাচ্চেন তোমারে।' বাক্যটি উৎকৃষ্ট 'হিউমার'। এখানে আর একটি কথা লক্ষ্য করিবার মতো। 'নীলদর্পণ-নাটকে নীলকরদের অত্যাচারের চিত্র অঙ্কন করাই নাট্যকারের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহার মধ্যে নায়ক নবীনমাধবের দাম্পত্যপ্রেমের ইতিহাস রচনা করা সম্ভবপর নয়। নায়ক যে দাম্পত্যপ্রেমেও কতখানি সুখী ছিল, একটি কথায় সামান্য ইঙ্গিতে নাট্যকার তাহার অনেকখানি বলিয়া গেলেন। এমন সুখী পরিবারের সুখী দম্পতীর জীবনের বিষময় পরিণাম দেখিয়া আমরা নিশ্চয়ই বেদনায় অভিভূত হইব। এই হাসি তাই নাট্য-পরিণতির বিষাদের অগ্রদূত। হাস্য ও কারুণ্যের সংমিশ্রণ দীনবন্ধুর নাটকে এমনি করিয়াই হইয়াছে।

হাসি ও অশ্রুর মিশ্রণ ঘটাইয়া দীনবন্ধু উৎকৃষ্ট হিউমার সৃষ্টি করিয়াছেন দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম গর্ভাঙ্কে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর ভাঁড়ুদত্ত যখন বন্যায় ডুবিয়া মরিতেছে, তখন 'চুলে ধরি মাগু' তাহাকে 'উদ্ধার' করিয়াছিল। যে অকাল-কুষ্মাণ্ড পুরুষ আত্মরক্ষা করিতে পারে না, স্ত্রী তাহাকে উদ্ধার করিয়াছে জানিয়া অসঙ্গতি-বোধে আমরা হাসিয়া উঠি। কিন্তু 'নীলদর্পণ'-নাটকের তৃতীয় রায়ৎটি একেবারে স্ত্রীগতবুদ্ধি। মাম্‌দো ভূতে পাইলে ছাড়ে না, একথা যখন স্ত্রী বলিয়াছে, তখন তাহা আর মিথ্যা হইতে পারে না। আমাদের দেশে স্বামীকেই স্ত্রীর থেকে বয়সে, বিদ্যা-বুদ্ধিতে বড় বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, স্ত্রীগণ স্বামীকেই তাই প্রাজ্ঞ জানিয়া অনুসরণ করে। তাহার কথা, তাহার যুক্তিকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করে। তাই রায়ৎটির বেলায় তাহার বিপরীতটি দেখিয়া আমাদের হাসি পায়। কিন্তু যখন রোগ সাহেবের 'পায়ের গুঁতা' খাইয়া এই রায়ৎটি 'বউ তুই কনেরে, মোরে খুন করে ফেললো, মারে, বউরে, মেলেরে' বলিয়া পড়িয়া যায়, তখন এই মাতা ও স্ত্রীর উপর একান্ত নির্ভরশীল সরল লোকটির প্রতি সমবেদনায় আমাদের অন্তর কাঁদিয়া উঠে

একটি উৎকৃষ্ট হিউমারের পরিচয় পাই চতুর্থ রায়তের উক্তিতে। রায়ৎটি একবার স্বরপুরে আসিয়া 'বসু মহাশয়'কে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। 'আহা কি দয়ার শোরীল, কি চেহারার চটক, কি অপরূপ রূপই দেখলাম, বসে আছেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী'। অসঙ্গতিবোধে আমরা না হাসিয়া পারি না। কারণ, যিনি বসিয়া থাকেন, তিনি একেবারেই গমনশূন্য,—সুতরাং গজেন্দ্রগমনের কোনো কথাই তাঁহার পক্ষে উঠিতে পারে না। তারপর দ্বিতীয় অসঙ্গতি হইল এই যে 'বসু মহাশয়' পুরুষ। তাঁহাকে 'গজেন্দ্রগামিনী' বলিয়া 'নারী' করিয়া দিবার সঙ্গত কোনো কারণ নাই। কিন্তু হাসিটি এখানে নিছক বহিরঙ্গ অসঙ্গতির পরিচয়ই বহন করে না, ইহা বক্তার চরিত্রের একটি বিশেষ দিকের ইঙ্গিত করে। রায়ৎটি লেখা-পড়া জানে না। হয়তো যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী ইত্যাদি সে শুনিয়াছে। নিশ্চয়ই শ্রীমতী রাধিকাকে 'গজেন্দ্রগামিনী' বলা হইয়াছে, রায়ৎটি শব্দটির অর্থ কিছুই বুঝে নাই, কিন্তু শব্দটি যে অতি পূজনীয় কোনো গুরুজন, দেবজনকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, তাহা সে জানে। গুরুজনদের সম্মান দিতে হইলে যে সাধুজনের মুখনিঃসৃত সাধুভাষা ব্যবহার করিতে হইবে, ইহাও সে জানে। সুতরাং বসু মহাশয়ের উদ্দেশ্যে তাহার অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধা বিমথিত করিয়া এই 'গজেন্দ্রগামিনী' শব্দটি বাহির হইয়া আসিয়াছে। এই অসঙ্গতি চরিত্রেরই গভীর অভিব্যক্তি, তাই ইহা উৎকৃষ্ট হিউমারের উদাহরণ।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'নীলদর্পণ'-নাটকে হাস্যরস-সৃষ্টির যে স্বকীয় দক্ষতার পরিচয় দিলেন, তাহাই সার্থকভাবে বিকশিত হইয়াছে তাঁহার পরবর্তী নাটক-প্রহসনে। অবশ্য মধুসূদনের দ্বারাও তিনি প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।* দীনবন্ধুর প্রহসনগুলির আলোচনা করিবার পূর্বে তাই মধুসূদনের প্রহসন দুইখানির আলোচনা করিব।

প্রহসনকার মধুসূদন

✓মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম সার্থক এবং সুন্দর প্রহসন। ঐ গ্রন্থখানিই বাংলা প্রহসন-সাহিত্যের পথপ্রদর্শক। বই দুইখানি সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অজিতকুমার ঘোষ প্রভৃতি বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনার পুনরাবৃত্তি

---

* মধুসূদনের প্রহসন দুইটিতে নাট্যকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যে সংকীর্ণ ব্যবহার দেখা গেল, তাহা ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হইল দীনবন্ধু মিত্রের নাটক-প্রহসনগুলিতে। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ডাঃ সুকুমার সেন, পৃষ্ঠা ৫৫

করিয়া গ্রন্থের কলেবর অকারণ বৃদ্ধি করিতে চাহি না। তবে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে গোটা কয়েক কথা বলিবার প্রয়োজন আছে মনে করি।

সংস্কৃত এবং ইংরেজী প্রহসনের মধ্যে যে উৎকৃষ্ট ধরনের হাস্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়, মধুসূদনের প্রহসনের মধ্যে তাহার সন্ধান মিলে না—এ কথা সত্য। বিষয়বস্তু যেমন সহজ ও সাধারণ, তেমনি তাহার রূপায়ণও স্বাভাবিক। মধুসূদন কাহিনী বা চরিত্র কোনোটিকে অতিরঞ্জিত করিয়া অবিশ্বাস্য করিয়া তোলেন নাই। তিনি আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু আক্রমণ বিদ্বেষের বিষ বর্ষণ করে নাই। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় যেমন তিনি ইয়ং বেঙ্গলদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে তিনি বৃদ্ধ বক-ধার্মিকদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু উভয় প্রহসনেই লেখকের সংযমবোধ তাঁহার শিল্পসৃষ্টির সহায়ক হইয়াছে।

পরিস্থিতি এবং চরিত্রগত সাধারণ স্বাভাবিক অসঙ্গতিই প্রহসন দুইটিতে হাস্যরস-সৃষ্টির মূল কারণ। রামনারায়ণের প্রহসনগুলির মতো ইহা কর্মহীন বিবৃতি-মাত্রে পর্যবসিত হয় নাই। পাত্রপাত্রীগণের বাক্য ও আচরণের মধ্য দিয়া কাহিনী কর্মময় ঘটনা-রূপে বিবৃত হইয়াছে।

'একেই কি বলে সভ্যতা'য় ঘটনার জটিলতা অবশ্য মোটেই নাই। কিন্তু কর্তা মহাশয়ের আগমনজনিত ভয়ে নববাবু ও কালীবাবুর আলাপ অল্প কথায় তাহাদের চরিত্র প্রকাশ করিয়া দেয়। কর্তা মহাশয়কে বুঝাইবার জন্য নববাবুর পরামর্শে কালীবাবুর জনৈক বৈষ্ণবের আত্মীয় বলিয়া পরিচয়দানরূপ প্রতারণার দৃশ্য সংক্ষিপ্ত হইলেও উপভোগ্য। কালীবাবু ব্যঙ্গোক্তির মাধ্যমে তাহার মতো ইয়ং বেঙ্গলদের যে পরিচয় উদ্ঘাটন করে, অল্পকথায় তাহা এই উচ্ছৃঙ্খল যুবকদের স্বরূপ ধরাইয়া দেয়—'আমি বিওরের—মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ—সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না শ্বশুর নয়—শত শাশুড়ীর আলয়—আর উইলসনের আখড়ায় নিত্য প্রসাদ পাই।' মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব বাংলার কতখানি পরিবর্তন এই ইয়ং বেঙ্গলদের আমলে হইয়া গিয়াছে—সামান্য কথায় তাহার বাস্তব রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহারা যে দেশের নিকটতম প্রতিবেশীদেরও কোনো খোঁজ রাখে না, কালীবাবুর কথাতে তাহা বুঝা যায়। 'আমি ভাই গরাণহাটার প্যারী আর তার ছুকড়ি বিন্দী ছাড়া আর কাউকেই চিনি না।' এই প্যারী এবং বিন্দী নাম দুইটিও ইচ্ছাকৃত সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। আমাদের বৈষ্ণব সাহিত্যের 'শ্রীমতী বিনোদিনী প্যারী' এবং তাঁহার প্রধান প্রেমদূতী 'বৃন্দা'র পবিত্র নাম এই বাবুদের আমলে বেশ্যালয়ের শোভা বর্ধন করিয়াছে। দেশের কৃষ্টি এবং আপন

গুরুজনদের প্রতিও ইহাদের অশ্রদ্ধার অন্ত নাই। কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ নামে কালীবাবুর এক কাকা বৈষ্ণব ছিলেন এবং বৃন্দাবনে মারা যান। বৈষ্ণবতা এবং তীর্থমৃত্যুর জন্যই তিনি কালীবাবুর নিকট 'একটা ওল্ড ফুল' ভিন্ন কিছুই নহেন। মধুসূদনের তীব্র ব্যঙ্গ-সৃষ্টির পরিচয় এই ছোট প্রহসনখানিতে অনেক আছে। কালীবাবুকে নব্যবাবু পরামর্শ দিতেছে—'তবে বেশ হয়েছে, তুমি তাঁরই পরিচয় দিও, বাপের নামটা চেপে যাও।' প্রয়োজন হইলে যে এই নব্য বাবুরা পিতৃনামও ভুলিয়া যাইতে পারেন, মধুসূদন তাহারই ইঙ্গিত করিতেছেন।

দ্বিতীয় অঙ্কে বাবাজী এবং সারজনের প্রসঙ্গটি হাস্যোদ্দীপক। প্রহসনের কাহিনীর মধ্যে উহা একটু বৈচিত্র্য আনয়ন করিয়াছে সত্য। কিন্তু এই ধরনের পুলিশী চরিত্র-সৃষ্টিতে মধুসূদনের মৌলিকত্ব বিশেষ কিছুই নাই। কালিদাসের শকুন্তলা-নাটকেও আমরা এই জাতীয় পুলিশচরিত্র পাইয়াছি, তবে চরিত্রটি জীবন্ত, কিন্তু মূল কাহিনীর সঙ্গে প্রসঙ্গটির কোন যোগ নাই॥ যাত্রাগানের মধ্যে যেমন মাঝে মাঝে অপ্রাসঙ্গিক সঙের অবতারণা করা হয়, ইহাও সেইরূপই হইয়াছে।

প্রহসনটির আসল বক্তব্য দ্বিতীয় অঙ্কে। মধুসূদন এখানে ক্ষুদ্র পরিবেশে, অল্প কথায় সুন্দর চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। ব্যঙ্গও এখানে সুনির্বাচিত। সভ্যগণ যেখানে মিলিত হইয়াছেন, তাহার নাম 'জ্ঞানতরঙ্গিণী সভা'। ইংরাজী সভ্যতা বাঙ্গালীর জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিয়াছে, বাঙালীকে অন্ধ কুসংস্কার হইতে মুক্তি দিয়াছে। যাহাদের মধ্যে এই মুক্তির জোয়ার আসিয়াছে, তাহারা এই নব্যবঙ্গের যুবক। সেই যুবক-সম্প্রদায়েরই একটি বৃহত্তর অংশ জ্ঞানের নামে কি অনাচার এবং দুশ্চরিত্রতায় মাতিয়া উঠিয়াছে, তাহাই মধুসূদন দেখাইয়াছেন। লক্ষ্য করিতে হইবে এই যে, যাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া সত্য সত্যই জ্ঞানলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, মধুসূদন তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করেন নাই। গণ্ডূষ জলমাত্রে অবগাহন করিয়া যাহারা শফরীর মতো ফরফর করিতেছিল, মধুসূদনের ব্যঙ্গ তাহাদিগকে লইয়া। ইহারা আচার-আচরণে কথাবার্তায় সাহেব হইতে চেষ্টা করিতেছিল, বাঙালীর গন্ধ গা হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারিলেই ইহারা ধন্য হইত। ইহাদিগকে বাংলা করিয়া 'মিথ্যাবাদী' বলিয়া গালাগালি করিলে ইহাদের গায় লাগে না কিন্তু ইংরাজীর মতো পবিত্র এবং মহনীয় ভাষায় 'লায়ার' বলিলে ইহাদিগের জাতি নষ্ট হয়। আবার, ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান ইহাদের কত মধুর! বাংলা বাক্যে হাজার গণ্ডা ইংরাজী শব্দ ইহারা ব্যবহার করিবে। একখানি চিঠি লিখিতে

গেলে ইংরেজ বৈয়াকরণের শ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িবে। একটি শব্দও ইহারা শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিতে পারে কি না সন্দেহ। 'স্পীচ' না বলিয়া 'ইস্‌পীচ' বলিয়াই ইহারা সারিয়া দেয়। প্রকৃত জ্ঞানলাভের পরিবর্তে ইহাদের মধ্যে যে হীনম্মন্যতা-দোষ প্রবেশ করিয়াছে, মধুসূদন সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। সাহেবেরা হিন্দুর পূজাপার্বণকে পৌত্তলিকতা বলে, হিন্দু জাতিকে সুপারষ্টিশাস্‌ বলে। ইহারাও সাহেবদের সেই বুলি আওড়াইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে। 'জ্ঞানতরঙ্গিণী-সভা'য় যাহারা মিলিত হয়, তাহাদের অজ্ঞতা কতদূর পৌঁছাইয়াছে! "জেণ্টলম্যেন্‌ আমাদের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরিষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করিনে, জ্ঞানের বাতি দ্বারা অজ্ঞানের অন্ধকার দূর হয়েছে।" 'জ্ঞানতরঙ্গিণী-সভা' নামটিই ইহাদের অজ্ঞতাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। ইহারাই আবার মুখে 'রিফরমেশান্‌' বা সমাজ-সংস্কারের বুলি আওড়ায়।

ইহাদের অধঃপতন এতদূর গড়াইয়াছে যে অন্তঃপুরের পবিত্রতা ও শান্তি ইহাদের উচ্ছৃংখল আচরণে নষ্ট হইয়াছে। লম্পট নববাবু শুধু বেশ্যাসক্তি ও মদ্যপানেই সন্তুষ্ট থাকিতেছে না, মাতাল অবস্থায় বাড়ী ফিরিয়া বয়স্কা ভগিনীকে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করে। সেই নির্লজ্জ পাশব আচরণকে আবার ইংরেজী সভ্যতার দোহাই দিয়া সমর্থন করে।

কোনো কোনো সমালোচক এই দৃশ্যে ননদ-ভাজের আলাপে অশ্লীলতা ও অস্বাভাবিকতার গন্ধ পাইয়া বলিয়াছেন, বাঙালী সমাজের সঙ্গে বহুদিন পূর্ব হইতেই যোগাযোগ হারাইয়াছেন বলিয়া মধুসূদন ননদ-ভাজের আলাপের এইরূপ অস্বাভাবিক দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন।* প্রথম কথা, দৃশ্যটি অস্বাভাবিক নয়। ইংরেজের মন্দ-অনুকরণপ্রিয় উচ্ছৃংখল মদ্যপ নববাবুর পক্ষে ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ, বাঙালীর ঘরে ননদ-ভাজের এই ধরনের কৌতুকালাপ বঙ্গদেশের চিরাচরিত ব্যাপার। 'ইয়ং বেঙ্গল'দের প্রতিনিধি নববাবুর চরিত্র-উদ্‌ঘাটনে প্রসঙ্গটির বিশেষ নাট্যোপযোগিতা রহিয়াছে।

নাট্যকারের অভিযোগ তীব্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছে 'হরকামিনী'র উক্তিতে। 'এ সব দেখে শুনে আমার ইচ্ছে করে যে গলায় দড়ি দিয়ে মরি।' এখানে মধুসূদন শুধু হাসিতে পারেন নাই, বেদনায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছেন। লেখক এখানে সমাজের নিরপেক্ষ দর্শক না থাকিয়া প্রচারক-সংস্কারকে পরিণত হইয়াছেন।

* বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ১৪৭

'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির কাহিনী আরো ব্যাপক। চরিত্রের সংখ্যা যেমন বেশি, তেমনি চরিত্রগুলি স্ববৈশিষ্ট্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানে ব্যঙ্গ চরিত্রকে আরো গভীরভাবে স্পর্শ করিয়াছে। 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনখানিই তাই প্রকৃত প্রস্তাবে দীনবন্ধুর প্রহসনগুলির অগ্রদূত। হাস্যরসাত্মক চরিত্রের মধ্যে যে আপন অসঙ্গতিজনিত একটা দ্বন্দ্ব থাকে, দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনের বহু চরিত্রে আমরা তাহা দেখিয়াছি। মধুসূদনের 'ভক্তপ্রসাদ' চরিত্রেই বাংলা প্রহসনে সর্বপ্রথম এই দ্বন্দ্ব ফুটিয়া উঠিল। সংস্কৃত প্রহসনগুলিতে আমরা এই ধরনের দ্বন্দ্ব দেখি না, সুতরাং এইখানে মধুসূদনের মৌলিকতা। দীনবন্ধু ইহা মধুসূদনের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাকে ইংরেজী প্রহসনের প্রভাব বলিতে পারিতাম, কিন্তু যে পরিবেশে যেমন স্বাভাবিকভাবে বাঙালীর চিরপরিচিত জীবন হইতে মধুসূদন তাঁহার প্রহসনখানির উপকরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি, জীবন্ত কোনো আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, সন্ধানী-দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মধুসূদন চরিত্রটিকে অবিকল আঁকিয়া তুলিয়াছেন। অন্য কোনো সাহিত্যে আলোচিত চরিত্রের প্রভাবে তাহাকে এতটুকুও রঞ্জিত করেন নাই। অথচ ভক্তপ্রসাদের চরিত্রের মর্মমূলে মধুসূদনের দৃষ্টি যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-সম্বন্ধে আলোচনা

প্রহসনখানি বিশ্লেষণ করা যাক।

হানিফ গাজি একজন সাধারণ কৃষক, ফসল হয় নাই বলিয়া সে জমিদারের খাজনা দিতে পারিতেছে না, কিন্তু জমিদার ভক্তপ্রসাদ খাজনার এক পয়সাও ছাড়িবে না, তাহা তাহার জানা আছে। ভক্তপ্রসাদ পরম সাধুর ন্যায় ঘন ঘন মালা জপ করিতেছে, অথচ প্রজাপীড়নে ওস্তাদ। অর্থের প্রতি অত্যধিক লিপ্সা ধর্মপথের অন্তরায়, ভক্তপ্রসাদ বাহিরে ধার্মিক, কিন্তু অন্তরে অসৎ এবং কামলোলুপ পিশাচ। হাতে সে মালা জপিতেছে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে পৈশাচিক অভিসন্ধি আঁটিতেছে। চরিত্রের ভিতর ও বাহিরের বৈপরীত্য মধুসূদন সামান্য কাব্যে খুব সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছেন। গদাধর ভক্তপ্রসাদের উপযুক্ত ভৃত্য। সে প্রভুর লাম্পট্যের খোরাক যোগায়। প্রভুকে সে বলিল, হানিফকে এবারকার মত মাপ করা হউক, কারণ, হানিফের স্ত্রী অতি সুন্দরী। শুনিয়া ভক্তপ্রসাদ 'মালা শীঘ্র জপিতে জপিতে' বলিল 'অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলিস্ কিরে?' ভক্তপ্রসাদের মনে যখনই পরনারীসঙ্গের লোভ জাগিতেছে, তখনই আবার নিজের অজ্ঞাতসারে বিবেকের নিষেধও আসিতেছে। ঘন ঘন মালাটি

জপিয়া বৃদ্ধ অন্তরের এই দ্বন্দ্বটিকে কোনমতে এড়াইতে চাহিতেছে। ভক্ত-প্রসাদের যেটুকু ধর্মজ্ঞান, তাহা সমাজের কতকগুলি ধরাবাঁধা আচার-অনুষ্ঠান এবং সাম্প্রদায়িক রীতিনীতি, খাদ্যাখাদ্য-বিচারে সীমাবদ্ধ। পৌরাণিক প্রসঙ্গ এবং চরিত্রের অপব্যাখ্যাও ইহার মধ্যে যুক্ত হইয়াছে। লাম্পট্যে ভক্তপ্রসাদের আপত্তি নাই, তবে যবনী-সংস্পর্শেই শুধু পরকাল নষ্ট হইবার ভয় রহিয়াছে। গদাধরের কথায় ভক্তপ্রসাদ ভরসা পাইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে গোয়ালাদের লইয়া যখন কেলি করিতে পারিয়াছেন, তখন ভক্তপ্রসাদের অসুবিধা কি? ভক্তপ্রসাদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। স্বয়ং ভগবান্‌ও যখন তাহার দলে, তখন আর চিন্তার কারণ কি? এখন সে ভগবানের উপরই নির্ভর করিল—'দীনবন্ধো, তুমিই যা কর।' রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার উদাহরণ যে কি করিয়া কতকগুলি কপটভক্তের লাম্পট্যের সমর্থন যোগাইয়াছে, এখানে তাহার উদাহরণ মিলিতেছে। যাক্, ভক্তপ্রসাদ হানিফের স্ত্রীর আশায় তাহার খাজনা মাপ করিল। কিন্তু এখানেও তাহার বিষয়বুদ্ধির পরিচয় কম নয়, হানিফ যাহা লইয়া আসিয়াছে, তাহা রাখিয়া এবং বাকি টাকা পরে দিবার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া তবে সে হানিফকে ছাড়িল। কিন্তু এখানে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হইতেছে, তাই হাস্যরস জমিয়াছে ভাল। হানিফ খাজনার পয়সাটা পুরাপুরিই লইয়া আসিয়াছিল, আর একটু পীড়াপীড়ি হইলেই দিয়া দিত, সুতরাং হানিফ কৌশলে চোরের উপর বাটপাড়ি করিল। ভক্তপ্রসাদ-চরিত্রকে আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য বাচস্পতি-চরিত্রের আমদানী করা হইয়াছে। লম্পট কৃপণ জমিদার, কুড়িটা টাকা লাম্প্যটের জন্য ব্যয় করিতে তাহার প্রাণ ফাটিয়া যায় সত্য, তবুও সে এই ব্যাপারে কুড়ি টাকা কেন, পঞ্চাশ টাকাও ব্যয় করিয়া ফেলে। কিন্তু এই লম্পট ধর্মধ্বজীটি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র অপহরণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই, ব্রাহ্মণের মেয়ের সর্বনাশ অবাধে করিয়াছে। ব্রাহ্মণের মাতৃশ্রাদ্ধে একটি পয়সা সাহায্য করিতে সে রাজি নয়। মধুসূদন চরিত্রটিকে ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটন করিয়া পরিণতির দিকে লইয়া চলিয়াছেন।

এই যুগে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর-জাতীয় গ্রন্থও যে এই তথাকথিত সনাতন-পন্থী বৃদ্ধদের লাম্পট্যের সহায়তা করিয়াছে, মধুসূদন সেদিকেও ইঙ্গিত করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। পঞ্চীকে আসিতে দেখিয়া ভক্তপ্রসাদ আওড়াইতেছিল 'মেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া'...... ইত্যাদি।

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের প্রয়োগ মধুসূদন করিয়াছেন দ্বিতীয় অঙ্কে। আনন্দবাবুর নিকট ভক্তপ্রসাদ নিজের পুত্র অম্বিকাপ্রসাদের স্বভাবচরিত্র এবং চালচলনের

কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। পরম অধার্মিক ভক্তপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিতেছে, "অম্বিকা তো অধর্মাচরণ শিখছে না ?" আনন্দবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ্ঞে, অধর্মাচরণ কি ?" প্রশ্নটি একটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ। সত্যকারের ধর্মজ্ঞান এবং ধর্মনিষ্ঠা যাহার আছে, সে অবাধে ব্যভিচার করিতে পারে না; ভক্তপ্রসাদের মতে অধর্ম হইল দেবব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খ্রীষ্টিয়ানি মত। ভক্তপ্রসাদের মতো লোক কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবকেই ধর্ম বলিয়া বুঝিয়াছে, কিন্তু শাশ্বত মানব-ধর্মের মূল ভিত্তি ইহাদের চরিত্রে নাই। এই অধার্মিকেরাই আবার আশা করে যে তাহাদের সন্তানগণ ভক্ত প্রহ্লাদ হইবে। নাট্যকার চরম ব্যঙ্গ করিয়াছেন ভক্তপ্রসাদের মুখে কয়েকটি কথা দিয়া। "আমার বোধ হয় অম্বিকাপ্রসাদ কখনই এমন কুকর্মাচারী হবে না—সে আমার ছেলে কি না।" এই 'আমার ছেলে কি না' উক্তিটি মারাত্মক। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়' কথাটি শুধু চৈতন্যদেবের ধর্মজীবন-সম্বন্ধেই উক্ত নয়, উহা সার্বজনীন সত্য। পুত্রকে তৈয়ার করিতে হইলে পিতারও তদনুরূপ হওয়া দরকার, নহিলে 'বাপকা বেটা' হওয়াই স্বাভাবিক। ভক্তপ্রসাদ নিজ চরিত্রের দুর্বলতার জন্য পুত্রকে চরিত্রবান্ দেখিতে আশা করিতে পারে না, মনে মনে সে একথা অবশ্যই বোঝে, তাই পুত্রের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে মুখে গর্ব করিলেও অন্তরে অন্তরে তাহার যে সন্দেহ আছে, ইহাও সত্য। "প্রভো! তুমিই সত্য।" উক্তিটি এই সন্দেহ এবং ভয় হইতেই জাত। মধুসূদন ভক্তপ্রসাদের চরিত্রের কদর্যতা এবং ধর্মবোধের অসঙ্গতি আরও একটু বিশ্লেষণ করিলেন। কলিকাতার হিন্দুরা ভক্তপ্রসাদের মতে ধর্মহীন হইয়া পড়িয়াছে, কারণ, তাহারা হিন্দু হইয়া নেড়ের ভাত খায়। এই উক্তিগুলিও ভক্তপ্রসাদের মুখে মানায় না। কারণ, ভক্তপ্রসাদ প্রবীণতার খোলস আকড়াইয়া ধরিলেও সে কলিকাতার ঐ নব্য হিন্দুদের চেয়ে বেশি কদাচারী। সে মুসলমানীর সঙ্গে লাম্পট্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। চাকর গদাধর পাওে ব্যাপারটি বুঝিয়াছে। "নেড়ের ভাত খেলে জাত যায়, কিন্তু তাদের মেয়ে নিলে কিছু হয় না। বাঃ! বাঃ! কত্তাবাবুর কি বুদ্ধি!"

যাক্। হানিফ্ গাজি স্ত্রী ফতেমার মুখে ভক্তপ্রসাদের কুট্টনী পাঠানোর খবর পাইয়া রাগিয়া আগুন হইয়া আছে। স্ত্রীর মর্যাদার চেয়ে পঞ্চাশ টাকা কেন, পাঁচশ টাকাও তাহার কাছে বড় নয়। চরিত্রচিত্রণের দিক্ হইতে হানিফ্ দীনবন্ধু মিত্রের তোরাপের গোত্রপুরুষ। গ্রাম্য কৃষকের অসংস্কৃত কথ্যভাষায় নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে, পরিবেশের যথাযোগ্য সঙ্গতি রাখিয়া হানিফ চরিত্রটি

বিকশিত হয়, কিন্তু তোরাপের চরিত্রে যেটুকু গ্রাম্যতাজনিত অশ্লীলতা আছে, হানিফের চরিত্রে তাহা নাই।—এইখানে মধুসূদনের শালীনতার পরিচয়। হানিফ রাগিয়া খুন হইয়া আছে, তবুও 'পেরেকের মার প্যাট করে'-জাতীয় কথা বলে নাই। দীনবন্ধুর তোরাপ-চরিত্র যত স্বাভাবিকই হউক না কেন, এবং যিনিই তাহাকে যত দিক্ দিয়া সমর্থন করুন না কেন, দীনবন্ধু মধুসূদনের ন্যায় শালীনতা বজায় রাখিয়া চরিত্রটি অঙ্কিত করিতে পারেন নাই। হানিফ অতি সংক্ষেপে, সহজে অনেক বড় কথা বলিয়াছে। "এমন গরুখোর হারামজাদা কি হেঁদুদের বিচে আর দুজন আছে?·········বেটা কাফেরকে আমি গোরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো।········· আমার বাপ-দাদা নওয়াবের সরকারে চাকুরী করেছে আর মোর বুন্ কখনো বায়রে গিয়ে তো কসবিগিরি করেনি। শালা!"—হিন্দুকে গোরু খাওয়ানোর চেয়ে বড় শাস্তি হানিফের মতে আর হইতে পারে না। হানিফ যে সময়ের লোক, তখন বিফ্-মাটন্-ভক্ত আধুনিক হিন্দুরা সমাজে গৃহীত হইবার আশা পোষণ করিতে পারিতেন না। হানিফ মনে করিল, ভক্তপ্রসাদ যখন তাহার জাতি নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়াছে, তখন এই হিন্দু জমিদারকে গোরু খাওয়াইয়া তাহার জাতি নষ্ট করাই হইবে চরম প্রতিশোধ। সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইস্লাম-সংস্কারও জাগিয়া উঠিয়াছে, বিধর্মী ভক্তপ্রসাদ তাহার দৃষ্টিতে 'কাফের'। তাহার মর্যাদাবোধও যথেষ্ট, তাহার পূর্বপুরুষ নবাব-সরকারে চাকুরী করিয়াছে। আজ সে গরীব হইলেও ভক্তপ্রসাদের চেয়ে তাহার মর্যাদা-বোধ এবং কুলগরিমা অনেক বড়। তাহার বোন কখনও ভ্রষ্টা হইয়া গৃহত্যাগ করে নাই। এখানে উক্তিটি নিশ্চয়ই ভক্তপ্রসাদের কোনো ভগিনীকে উদ্দেশ্য করিয়া। এত বলিয়াও হানিফ রাগ সামলাইতে পারিতেছে না, কিন্তু তবুও সে অভদ্র গালাগালি করিয়া ইতরতার পরিচয় দেয় নাই, শুধু 'শালা' বলিয়াই সে থামিয়া গিয়াছে। এই নিম্নস্তরের অশিক্ষিত মুসলমান চরিত্রগুলির তুলনায় শিক্ষিত ভদ্র হিন্দু পরিবার যে কত জঘন্য, মধুসূদন মাত্র সামান্য কয়েকটি কথায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ফতেমা পুঁটিকে বলিতেছে,—"মোরা রাঁড় হল্যে নিকা করি, তোরা ভাই কি করিস্ বল্ দেখি।" উক্তিটির মধ্য দিয়া হিন্দু বিধবাদের বাহিরের সংযমের ভড়ং এবং গোপন ব্যভিচারের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। উক্তিটির তাৎপর্য এই যে অমন সংযমের ভণিতার চেয়ে প্রকাশ্য বিধবাবিবাহ ভাল। হানিফ-চরিত্রে সংযম যথেষ্ট আছে। বাচস্পতি মহাশয়ের পরামর্শে পরে সে ধৈর্য ধরিয়া সুকৌশলে ভক্তপ্রসাদের অপমানের ব্যবস্থা করিয়াছে, কিন্তু অল্প কথায় সে অন্তরের সুতীব্র জ্বালাও প্রকাশ করিয়াছে।

পুঁটিকে আসিতে দেখিয়া হানিফ বলিয়াছে, "হারামজাদীর মাথাটা ভাঙ্গি, তা হলো গা জুড়য়। ... দেখিস্ ফতি, যা কয়ে দিচ্ছি যেন ইয়াদ থাকে, আর তুই সমঝে চলিস্, বেটা বড় কাফের, যেন গায়-টায় হাত দিতে না পায়।" হানিফ একাই ব্যবস্থা করিতে পারিত। কিন্তু কার্যকারণের যোগাযোগে বাচস্পতি মহাশয়ের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। হানিফ বুঝিল, বাচস্পতিকে দিয়াই কাজ হইবে। কারণ, ভক্তপ্রসাদ বাচস্পতির প্রতিও চরম অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে। তাঁহার ব্রহ্মত্রা কাড়িয়া লইয়াছে, তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধে মাত্র পাঁচটি টাকা দিয়াছে। দুই নির্যাতিত মিলিয়া প্রতিশোধের চেষ্টা করিতে লাগিল।

ভক্তবাবুর এই অভিনব অভিসারের সংকেতগৃহ এক ভাঙা শিবমন্দির, কারণ, ভাঙা শিবে দেবত্ব নাই। প্রয়োজনবোধে ভক্তবাবুর মতো লোক নূতন উদ্ভট নীতির পাঁতি যোগাড় করিতেও ওস্তাদ। অন্ধকারে ফতেমার ভয় হইয়াছে, তাই সে বারে বারে চলিয়া যাইতে চাহিতেছে এবং মাঝে মাঝে পিছনে তাকাইতেছে। উদ্দেশ্য হানিফ কখন আসিবে। বিগতযৌবনা কুট্টনী পুঁটির মনেও এমনি অভিসারের গোপন বাসনা রহিয়াছে, কিন্তু তাহার উপায় নাই। "হায়, আমার কি এখন সেকাল আছে? তালশাঁস পেকে শক্ত হলে আর তাকে কে খেতে চায়?" দিন থাকিলে ফতেমার বদলে সে-ই অভিসারে আসিত।

শিবমন্দিরের মধ্যে শব্দ হওয়ায় ফতেমার সাহস হইল। সে কপট বিষণ্ণতা অবলম্বন করিয়া বলিল, 'তুই যদি না ছাড়িস্ ভাই, তবে আর কি করবো; এখন আল্লা যা করে!' আল্লার বিচার সুরু হইল। ভক্তবাবু আসিয়াছে। প্রেমনিবেদন করিতেছে। ফতেমা যদিও জানে যে, ইহা সত্য সত্যই অভিসার নয়, তাহার স্বামীর প্রেরণায় এক দুর্বৃত্তকে নাকাল করিতে ষড়্যন্ত্র করিয়াই সে এখানে আসিয়াছে, তবুও নারীর স্বাভাবিক লজ্জা এবং পরপুরুষসংস্পর্শের ভয় তাহাকে পাইয়া বসিল। সে বলিল, 'পুঁটিদিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি, তুই মোকে হেথা থেকে নিয়ে চল।' সুতরাং নাট্যকার বুঝিলেন, ইহাকে আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করানো যায় না। ভক্তপ্রসাদ অসম্মতা ফতেমার অঞ্চল ধারণ করিয়া 'তুমি প্রাণ, তুমি ধন' বলিয়া তোষামোদ করিল। পুঁটির কথায় তাহাকে লইয়া মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবে। যে হিন্দুয়ানির জন্য সে পুত্রের কলিকাতা থাকিয়া লেখাপড়া বন্ধ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই, "এমন স্বর্গের অপ্সরীর জন্যে" সে সেই 'হিন্দুয়ানি' ত্যাগ করিতেও ইতস্তত: করিবে না। ভক্তপ্রসাদ যে প্রকৃত ভণ্ড, এই কথায় তাহা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইল, সুতরাং

প্রহসনকার তাহার চরিত্র আর বেশি উদ্ঘাটন করার প্রয়োজন বোধ করিলেন না। এমন সময়ে নেপথ্যে গম্ভীর গর্জন শুনা গেল, ভূতের ভয়ে সমস্ত পরিবেশ উলটপালট হইয়া গেল। 'ভাঙা শিবমন্দিরে দেবত্ব নাই' মুখে বলিলেও শিব যে অনাচার-ব্যভিচারের শাস্তি দেন এবং সে কাজ যে তাঁহার সঙ্গী ভূতগণ দিয়াই করাইয়া থাকেন, ভক্তপ্রসাদ মন হইতে সে ধারণা মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। তাই "করযোড় করিয়া সকাতরে" "বাবা! আমি কিছু জানিনে, দোহাই বাবা, আমাকে ক্ষমা কর" বলিয়া "অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত" করিল। দৃশ্যটি কৌতুককর হইয়াছে। কারণ, দর্শকগণ জানিতেছে, ইহা প্রকৃত ভূতের ভয় নয়। যাহা হউক, গদাধর এবং ভক্তপ্রসাদ ছদ্মবেশী হানিফের হাতে কিছু বকশিস্ পাইল।

কিন্তু ব্যাপারটি এখানেই থামিল না। "মায়ের এই তো বিচার বটে", বলিয়া রামপ্রসাদী গান গাহিতে গাহিতে বাচস্পতি প্রবেশ করিলেন। এখানে দৃশ্যটি আরও কৌতুকাবহ হইয়াছে। কারণ, ভক্তপ্রসাদ, গদাধর, পুঁটি কেহই বাচস্পতির সত্যকারের আগমনের কারণ জানিতে পারে নাই। ব্রাহ্মণের আগমনে ভূত পলাইয়া যাইবে এই আশ্বাসে ইহারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছে। কিন্তু অদৃষ্টের তীব্র পরিহাস, এই 'সরিষা'ই ভূতকে ডাকিয়া আনিয়াছে। যাহা হউক, ভক্তপ্রসাদ ভাবিল, একমাত্র বাচস্পতি যখন ব্যাপারটা জানে, তখন তাহাকে খুসী করিলেই জাতিমান রক্ষা হইবে। সুতরাং বাচস্পতিকে ব্রহ্মত্র ফিরাইয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু সেই সময়ে যে হানিফ স্ববেশে প্রবেশ করিবে, তাহা ভক্তপ্রসাদ ভাবিতে পারে নাই, এখন হানিফকে কিছু দান করিয়া সে নিষ্কৃতি পাইতে চায়। হানিফ উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছে, সে বলিল, 'সে কি কত্তাবাবু, আপনি যে নাড়্যেদের এত গাল পাড়তেন, এখনে আপনি খোদ সেই নাড়্যে হতি বসেছেন, এর চায়ে খুসীর কথা আর কি হতি পারে? তা একথা তো আমার জাত কুটুমগো কতিই হবে।"

অবশেষে হানিফকে দুইশো টাকা দিয়া ভক্তপ্রসাদ রক্ষা পাইল। কিন্তু এই ব্যাপারে তাহার যে শিক্ষা হইল, তাহা চরম শিক্ষা। তবে প্রহসনের উপসংহারে ভক্তপ্রসাদের উক্তি অপ্রয়োজনীয়। উহা লেখকের উদ্দেশ্যপ্রবণতা ধরাইয়া দেয়।

বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনের মূল্য অনেক। ইহা শুধু শ্রেষ্ঠ প্রহসনের উদাহরণই নয়। চরিত্রচিত্রণের স্বাভাবিকতা, ঘটনার গতিমুখরতা এবং সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক্ দিয়া ইহা বাংলা

নাট্যসাহিত্যের অগ্রদূত। মধুসূদনের বহু পরেও বাংলা নাট্যসাহিত্যে রোমান্টিক কল্পনা এবং বাস্তবাতিক্রমী অতিরঞ্জনপ্রিয়তা অনুসৃত হইয়াছে। কিন্তু সহজ-সরল অনতিরঞ্জিত বাস্তব জীবনের কাহিনী লইয়া এমন সুন্দর নাট্য-প্রহসন-রচনার প্রয়াস বহুদিন যাবৎ দেখা যায় নাই। দীনবন্ধু মিত্র মধুসূদনের যোগ্য উত্তরাধিকারী হইলেও এই দিক্ দিয়া মধুসূদনকে সম্যক্ অনুসরণ করিতে পারেন নাই।

আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা প্রয়োজন। সংস্কৃত প্রহসনে সমাজের ও ধর্মের দোষত্রুটির সমালোচনা করিয়া যে কারণে প্রহসন রচিত হইয়াছিল, বাংলা প্রহসনের উৎপত্তিও ঠিক সেই একই কারণে হইয়াছিল। কিন্তু রামনারায়ণ সংস্কৃত প্রহসনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও মধুসূদনের প্রহসনে সংস্কৃত শৈলীর প্রভাব মোটেই নাই। সুতরাং বাংলা প্রহসনের সত্যকারের স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁহারই প্রদর্শিত পথে বাংলার প্রহসনকারগণ অগ্রসর হইলেন।

দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন-সাহিত্য

মধুসূদনের উত্তরাধিকারী দীনবন্ধু মিত্র। দীনবন্ধু চারখানি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী' এবং 'জামাইবারিক' যথেষ্ট প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ'-এর মধ্যে আলোচনা করিবার মতো বিশেষ কিছুই নাই। "'বিয়ে পাগলা বুড়ো' দীনবন্ধুর সর্বপ্রথম প্রহসন। নিঃসন্দেহে ইহা মধুসূদনের 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র আদর্শে রচিত হইয়াছিল"* বলিয়া কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে 'প্রহসন-সৃষ্টিতে দীনবন্ধুর সম্মুখে মাইকেলের আদর্শ থাকিলেও, দীনবন্ধুর সৃষ্টি-কল্পনা মাইকেল হইতে ভিন্ন।'† ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় লিখিতেছেন, " 'সধবার একাদশী'-প্রহসন রচিত হয় 'নবীন তপস্বিনী'র পরেই কিন্তু প্রকাশিত হয় 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'-প্রহসনের পর (১৮৬৬)। 'সধবার একাদশী' 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অনুসরণে লেখা।"‡ মোট কথা দীনবন্ধুর প্রহসনে মধুসূদনের প্রভাব যে পড়িয়াছিল, ইহা সকলেই মোটামুটি স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রভাবের মাত্রা কতখানি এবং দীনবন্ধুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কি, তাহাই আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। মধুসূদনের 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'

---

* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক সম্পাদিত 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র ভূমিকা।

† বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস—ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২০৯।

‡ বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ডাঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ৫৯।

প্রহসনের আলোচনা-প্রসঙ্গে এ বিষয়ে দুই-চারিটি কথা আগেই বলিয়াছি। এখানে প্রসঙ্গতঃ আরো দুই চারিটি কথা বলিব।

'সধবার একাদশী' এবং 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র মধ্যে কোন্‌খানি দীনবন্ধুর প্রথম রচনা, ইহা লইয়া মতভেদ থাকিলেও 'সধবার একাদশী' যে 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' হইতে সাহিত্যাংশে অনেক উৎকৃষ্ট সৃষ্টি, একথা অস্বীকার করিবার কারণ নাই। যে বাস্তবতা-প্রীতি দীনবন্ধুর সহজাত গুণ, 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র মধ্যে তাহা পূর্ণ মাত্রায়ই বিদ্যমান। সেইজন্য প্রহসনখানির পাত্রপাত্রীর চরিত্র তিনি একটুকুও সংস্কার করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। হাতের কাছে 'কাঁচা-মাল'-হিসাবে তিনি যাহা পাইয়াছেন, তাহা দিয়া যাহা সম্ভব, তাহাই তিনি গড়াইয়াছেন। এজন্য দীনবন্ধুর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অনেকে করিয়াছেন। এ-ব্যাপারে দীনবন্ধু সত্য-সত্যই প্রশংসার যোগ্য। কারণ, সহজ সত্যের মধ্যে যে স্বাভাবিক সৌন্দর্য বিদ্যমান থাকে, তাহাকে যথাযথভাবে দেখানো নিশ্চয়ই যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয়। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, যাহাই বাস্তব এবং সত্য, তাহাই অকপটে প্রকাশ করা সব সময়ে রুচি-সঙ্গত বা শ্লীল নয়। সৃজন-প্রগতি অব্যাহত রাখিবার জন্য নর-নারীর যৌনমিলনের মতো অতিপ্রয়োজনীয় চিরন্তন বাস্তব সত্য আর নাই, কিন্তু অশ্লীলতার যত প্রশ্ন ওঠে উহারই প্রকাশের তারতম্যের উপর ভিত্তি করিয়া।

কোন্‌টা শ্লীল, কোন্‌টা অশ্লীল সাহিত্যে এ মীমাংসা এখনও হয় নাই। সুতরাং কোন্‌টি বিশুদ্ধ হাস্যরস এবং কোন্‌টি ভাঁড়ামি, তাহাও ঠিক ঠিক নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে মোটামুটি একটা কথা মনে হয়—যে বর্ণনা আমাদের মনকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুনিচয়ে একান্তভাবে আবদ্ধ করে এবং আমাদের চরিত্রের পাশব দিক্‌টিকেই শুধু অভিব্যক্ত করে, ঐ ভোগ্যবস্তু হইতে মনকে কোনো বৃহত্তর ভাবলোকে বা সৌন্দর্যলোকে মুক্তি দেয় না, তাহাই অশ্লীল। নারীর সৌন্দর্য-বর্ণনা অশ্লীল নয়, কিন্তু সৌন্দর্য-বর্ণনার নাম করিয়া নগ্ন দেহ-বিলাসকেই অশ্লীল বলিব। রসিকতা যখন এমনি ধরনের স্থূল ইন্দ্রিয়াসক্তির পরিচায়ক হয়, তখনই তাহাকে শালীনতাহীন ভাঁড়ামি বলিতে বাধ্য হই। তেমনি যে পরিহাসের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা, সংস্কৃতি ও ভব্যতার ছাপ নাই, তাহাকেই গ্রাম্য বলিয়া ধরা হয়।

দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র মধ্যে হাস্যরসের নামে এই গ্রাম্যতার প্রয়োগই আমরা বেশি দেখিতে পাই। শুধু 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো' কেন, দীনবন্ধুর কোনো প্রহসনই এই গ্রাম্যতাকে একেবারে বিসর্জন দিতে পারে নাই। এ-বিষয়ে

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর রচনার মধ্যে পার্থক্য অনেক, মধুসূদনের হাস্যরসে গ্রাম্যতা-দোষ নাই। এখানে একটি বড় যুক্তি অনেকে উপস্থাপিত করিবেন—যে সমস্ত লোক লইয়া দীনবন্ধু তাঁহার প্রহসন রচনা করিয়াছেন, তাহাদের চরিত্রের মধ্যেই ঐ গ্রাম্যতাদোষ বিদ্যমান, দীনবন্ধু চরিত্রগুলির সবটুকু লইয়াছেন বলিয়া কিছুই সংস্কার করেন নাই। তাহা করিলে 'ভাঙা তোরাপ' 'ছেঁড়া আদুরী' হইত। যুক্তিটি অস্বীকার করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি কথাও আমরা বলিয়া রাখিবার প্রয়োজন মনে করি। মধুসূদনের 'ভক্তপ্রসাদ' এবং দীনবন্ধুর 'রাজীবলোচন' দুইজনেই গ্রামের মাতব্বর বৃদ্ধ, দুইজনের চরিত্র প্রায় একই রকমের। 'ভক্তপ্রসাদ' লম্পট, 'রাজীবলোচন' লম্পট না হইলেও 'বিয়ে পাগ্‌লা', অর্থাৎ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র; 'হানিফ' ও 'তোরাপ' উভয়েই মুসলমান রাইয়ৎ, তোরাপের চেয়ে হানিফের ক্রোধের কারণ প্রচণ্ড। মধুসূদন 'ভক্তপ্রসাদ' বা 'হানিফ' কাহারও চরিত্রে ও বাক্যে গ্রাম্যতার চিহ্নমাত্র না দেখাইয়া চরিত্র দুইটিকে যতখানি আকর্ষণীয় ও জীবন্ত করিয়াছেন, 'রাজীবলোচন' ও 'তোরাপ' তাহা হইতে বেশি জীবন্ত হয় নাই। তোরাপের উক্তি—'দুত্তোর প্যারেকের মার্ প্যাট করে.....সমিন্দিরি ভাতার মারির মাঠে পাই, এম্‌নি থাপ্লোর ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিটে আস্‌মানে উড়ায় দিই, ওর গ্যাড-ম্যাড করা হের ভিতর দে বার করি।' নিতান্ত স্বাভাবিক; জীবন্ত। কিন্তু গ্রাম্য কৃষকের এই অশ্লীল গালাগালিগুলির প্রয়োগ না করিয়াও যে অশিক্ষিত মুসলমান কৃষকের রাগ কতখানি জীবন্ত করিয়া ফুটানো যায়. মধুসূদন তাহা দেখাইয়াছেন হানিফের চরিত্রে—'বেটা কাফেরকে আমি গোরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো।'...'মোর বুন্ কখনো বারয়ে গিয়ে তো কসবিগিরি করেনি।' প্রভৃতি উক্তি তোরাপের উক্তির চেয়ে কম জোরালো নয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো—মধুসূদন যেখানে গ্রাম্যতাদোষ পরিহার করিয়া চলিয়াছেন, দীনবন্ধু সেখানে ইচ্ছা করিয়া, অনেক সময়ে অপ্রয়োজনেও, গ্রাম্যতার আশ্রয় লইয়াছেন। তোরাপের উল্লিখিত ঐ মাঠটি 'ভাতার মারি'র না হইয়া অন্য কোনো মাঠ হইলেও ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু হইত না। দীনবন্ধু মনে করিতেন, এই সকল চরিত্রের মুখে এই জাতীয় অপশব্দ বেশি তুলিয়া দিলেই উহারা স্বাভাবিক এবং আকর্ষণীয় হইবে, কিন্তু 'সর্বমত্যন্তগর্হিতম্' কথাটি দীনবন্ধুর ভুলিয়া যাওয়া উচিত হয় নাই।

মধুসূদনের 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র মধ্যে যে উৎকৃষ্ট satire কিংবা দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'র মধ্যে যে উন্নত humour-এর উদাহরণ আমরা পাইয়াছি, দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো'র মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ আমরা কোথাও পাই না,

কিন্তু 'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর সার্থকতম প্রহসন, satie এবং humour-এ ইহা পূর্ণ, সর্বোপরি এই প্রহসনে চরিত্র আছে। নিমচাঁদের মতো চরিত্র দীনবন্ধুর আগে-পরে কেহ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, রাজীবলোচনের মধ্যে আপন বার্দ্ধক্য ঢাকিয়া যুবক সাজিবার প্রচেষ্টা এক শ্রেণীর বৃদ্ধের চিরকালের স্বাভাবিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক, পেঁচোর মার চরিত্র স্বাভাবিক, সঙ্গত এবং সুন্দর—এই সকল কথা মানিয়া লইয়াই আমরা বলিতেছি।

অনেকে আবার 'সধবার একাদশী'কে অনেক বেশী মূল্য দিয়াছেন।* আমরা ততখানিও স্বীকার করতে চাহি না। দীনবন্ধুর প্রহসনগুলির মধ্যে 'সধবার একাদশী' যে সর্বশ্রেষ্ঠ একথা অবশ্যই স্বীকার করি। নিমচাঁদ-চরিত্র-সৃষ্টিতে দীনবন্ধু শেক্‌স্‌পীরীয় নির্লিপ্ততা, মমত্ববোধ ও শিল্পগুণ অবলম্বন করিয়াছেন, একথাও সত্য। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ার নাটকের প্রত্যেকটী চরিত্রের প্রতি যে সমানুপাতিক মমত্ব প্রকাশ করিয়া, ঘটনা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়া নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে প্রত্যেকটি চরিত্রকেই স্ববৈশিষ্ট্যে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গড়িয়া তোলেন, সেই সমানুপাতিক মমত্ববোধ দীনবন্ধুর নাটকে নাই, থাকিলে শেক্‌স্‌পীয়ারের কমেডীর মতো দীনবন্ধুর প্রহসনগুলিও সার্থক কমেডী হইত।

শেক্‌স্‌পীয়ারের জীবনদৃষ্টি অনেক ব্যাপক। তিনি মানুষের চরিত্রে একাধারে হাসি ও বিষাদের সমন্বয় দেখিয়াছেন। জীবনের সমস্যামুক্ত দক্ষ-চলনে অভ্যস্ত মানুষ যেমন প্রসন্নচিত্তে হাসিতে পারে, তেমনি অভাব-অপ্রাপ্তি জীবনের দুরপনেয় অসঙ্গতির বেদনা চাপা দিবার জন্যও মানুষ হাসে ও নিজের অদৃষ্টকেই ব্যঙ্গ করে। সে হাসি অশ্রুসজল, স্নিগ্ধ, গম্ভীর। নিমচাঁদ-চরিত্রে দীনবন্ধু শেক্‌স্‌পীয়ারের অনুসরণে অমনি ধরণের ব্যথার হাসি সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকে যেমন এই ধরনের চরিত্রের মধ্যে ট্র্যাজেডীর বেদনাও মূর্ত হইয়াছে, ট্র্যাজেডী এবং কমেডীর অপূর্ব মিলন হইয়াছে, দীনবন্ধুর নিমচাঁদ-চরিত্রে তাহা নাই। কারণ, এই নাটক-রচনায় দীনবন্ধু নির্লিপ্ত ছিলেন না। নিমচাঁদ-চরিত্রকে সর্বতোভাবে ফুটাইতে গেলে এই নাটকে নিমচাঁদই নায়ক হইত।

* আসলে শিল্পসৃষ্টি-হিসাবে 'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর সার্থকতম নাটক, 'নীলদর্পণ' অপেক্ষা এখানেই ইহার শ্রেষ্ঠত্ব। দীনবন্ধু এই নাটকটিতে স্বীয় ক্ষমতার চরম প্রকাশ দেখাইয়াছেন। মানুষ-চরিত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতাপ্রসূত নির্লিপ্ততা বা detachment এই ক্ষুদ্র নাটকটিকে প্রায় শেক্‌স্‌পীরীয় করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ সকল দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে বাংলা ভাষায় একমাত্র 'সধবার একাদশী'কেই খাঁটি নাটক আখ্যা দেওয়া যায়।

—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ 'সধবার একাদশী'র ভূমিকা, পৃ. ।৶০

কিন্তু 'সধবার একাদশী' নাটকে নিমচাঁদ আমাদের দৃষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেও সে এই নাটকের নায়ক নয়। কারণ, দীনবন্ধু মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির কুফল দেখাইবার জন্য এই উদ্দেশ্যমূলক নাটকখানি রচনা করিয়াছিলেন। অটলকে তিনি এই নাটকের নায়ক করিয়াছেন। নায়ককে অতিক্রম করিয়া আমাদের শ্রদ্ধা অন্যতম চরিত্র নিমচাঁদ আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। ইহার কারণ, দীনবন্ধু অটল-চরিত্র-চিত্রণে সতর্ক ও সহানুভূতিসম্পন্ন হন নাই। শেক্‌স্‌পীয়ার হইলে অটলের চরিত্রে তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করিতে পারিতেন। অটল প্রথমে ভাল ছেলে ছিল, কুসঙ্গে পড়িয়া সে মদ্যপ ও বেশ্যাসক্ত হইয়াছে, শেক্‌স্‌পীয়ার এই সুযোগ লইয়া অটলের মধ্যে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সংঘাত সৃষ্টি করিতে পারিতেন। কুমুদিনীর সচ্চরিত্রতা এবং বঞ্চিতজীবনের বেদনা, অটলের মাতা ও পিতার শুভেচ্ছা, দুশ্চিন্তা প্রভৃতি এই সংঘাতকে আরও জটিল করিয়া তুলিত, অটলের চরিত্রও সংঘাতের মাধ্যমে গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পাইত। তখন গোকুলবাবুর স্ত্রীকে আনিবার সময়ে ভুল করিয়া কুমুদিনীকে বৈঠকখানায় আনায় অটলের মানসিক দ্বন্দ্ব চরমে উঠিত। নাটকটির সমাপ্তি নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে ঘটিত। ইহা না হওয়ার জন্যই নাটকখানি শেষ হইয়াও শেষ হয় নাই। উহা কোন সঙ্গত পরিণতির ইঙ্গিত দেয় না। কোন পূর্ব-প্রস্তুতি না করিয়া হঠাৎ অটলের মতি-পরিবর্তন কি করিয়া সম্ভবপর? তাই মনে হয়, নাটকখানি শেক্‌স্‌পীরীয় কমেডীর সম্ভাবনা বহন করিয়াও সার্থক কমেডী হয় নাই; একখানি প্রহসন হইয়াছে মাত্র।

কতখানি হইয়াছে, তাহাই আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি—

প্রথম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক। কাঁকুরগাছা নকুলেশ্বরের উদ্যানের বৈঠকখানায় নকুলেশ্বর এবং নিমে দত্ত প্রবেশ করিল। আলোচনা আরম্ভ হইল মদ খাওয়ার বিষয়ে। অটল নামক এক ব্যক্তি মদ ধরিয়াছে। নাটকের আরম্ভেই আমরা তিনটি মদ্যপায়ীর সন্ধান পাই,—অটল কেবল মদ্যপান সুরু করিয়াছে, নিমে দত্ত পূর্ণ মদ্যপায়ী, নকুলেশ্বর মদ্যপান করে, কিন্তু মদ খাওয়ার পক্ষপাতী নয় বা প্রশংসাও করে না, বরং মদ ছাড়িয়া দিবে বলিয়া মনে করিতেছে। নকুলেশ্বরের মুখেই শুনা গেল, 'সুরাপান-নিবারণী সভা' নামক একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অনেকে এই সভার প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া মদ্যপান ত্যাগ করিতেছে। নিমে দত্ত মাতাল, মদ্যপান ত্যাগ করার পক্ষপাতী সে নয়, এই সভার কার্যাবলী তাই সে সমর্থন করে না। মাতালদের সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা নকুলেশ্বরের চেয়ে অনেক বেশী। সে জানে, অনেকে অনুরোধে পড়িয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করে,

কিন্তু মদ দেখিলেই আবার আগাইয়া আসে. আবার, যাহারা মদ্যপানজনিত নানাবিধ ব্যাধিতে জর্জরিত হইয়াছে, তাহারা 'অষ্টম হেন্‌রির ক্যাথারাইন্‌-পরিত্যাগের ন্যায়' মদ ছাড়িয়া দেয়। নিমে দত্তের মতে এই লোকগুলি নেমকহারাম। নিমে দত্ত লোকচরিত্র জানে, এই তথাকথিত মদ্যত্যাগীদের প্রতি তাহার এতটুকুও শ্রদ্ধা নাই, এই লোকগুলিকে সে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করে, এবং তাহার ব্যঙ্গ অনেক সময়ে শালীনতার মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। নকুলেশ্বর যখন বলে, 'আমার সংস্কার হয়ে পড়েছে, এখন আর ছাড়া দুষ্কর, তা নইলে আমি সভায় নাম লিখিয়ে মদ ছাড়তাম,' তখন নিমচাঁদ বলে 'তোমার স্ত্রীরও কি সংস্কার হয়েছে?' এই অশ্লীল তামাসা মাতালের উপযুক্ত। মদ্যপান সুরু করিয়া নিমচাঁদ যে পরিবেশে নামিয়া গিয়াছে, তাহার কথাবার্তা ও আচার-আচরণও তদনুরূপ অশ্লীল হইয়াছে। কিন্তু নিমচাঁদ মদ এবং মাতাল উভয়কেই ঠিক চিনিয়াছে। নকুলেশ্বর যখন বলিল, 'তুই দেখিস্‌, আমি ত্বরায় সভায় নাম লেখাব, তখন নিমচাঁদ ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মতো বলিয়া দিল যে, তাহা সম্ভবপর নয়—'বাবা ব্রাণ্ডির ভাঁটিতে না চোঁয়ালে তোমার ক্ষুধা হয় না, তুমি নাম লেখালে, সাড়ে তিন হাত ভূমির মৌরসি পাট্টা নিতে হবে।' মদ্যপানের পরিণতি সে জানে, তবুও কোনো ধনীর ছেলে নূতন মদ্যপান আরম্ভ করিলে নিমে দত্ত বাধা দেয় না, তাহার কারণ আছে, মদ তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। নিজের কিনিয়া খাইবার মতো পয়সা নাই, কিন্তু 'এক ব্যাটা বড় মান্‌সের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।' আর এই ধনীর ছেলেরা বাপের অর্থের অপব্যয় করিলেও নিমচাঁদের মন্তব্য হইল, 'ওর বাপ অনেকের সর্বনাশ করে বিষয় করেছে, টাকাগুলো সৎকর্মে ব্যয় হক্‌।' নিমচাঁদ তাই অটলকে সুকৌশলে মদ্যপান শিখাইতেছে এবং বেশ্যাসক্তির জন্য উৎসাহিত করিতেছে। কিন্তু সে নিজে বেশ্যাসক্ত নয়, কারণ, এই বারনারীদের চরিত্র তাহার চিরপরিজ্ঞাত। কাঞ্চন প্রবেশ করিলে নিমচাঁদ ব্যঙ্গ করিয়া তাহার যে স্তব করিল, তাহাতেই আমরা বেশ্যা-সম্বন্ধে তাহার ধারণা জানিতে পারি। অটল যে পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মদ্যপান আরম্ভ করিল, নিমে দত্ত সমস্ত অন্তর দিয়া তাহা সমর্থন করে নাই। অটলের পরিণাম সে বুঝিয়া ফেলিয়াছে, সুরা আর নারী এই মূর্খ ধনীর নন্দনটিকে গ্রাস করিবে, নিমচাঁদ তাহা জানে। তাই সে অটলকে বলিল, 'তুই ব্যাটা পাজির ধাড়ী, তখন পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন কল্লি, এখন অনায়াসে বেশ্যার উচ্ছিষ্ট খেলি—তোর সঙ্গে যদি আর কথা কই কাঞ্চন যেন আমার মাগ হয়।' এই ব্যঙ্গের অর্থ বুঝিবার মতো বুদ্ধি অটলের নাই।

অটলকে নিমে দত্ত ধরিয়া ফেলিয়াছে, "dunce...all the days of his life."

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক। অটলের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে। মাস দুই তিনের মধ্যে সে ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। মায়ের একমাত্র আদুরে ছেলে সে। সুতরাং মায়ের স্নেহদুর্বলতার সুযোগ সে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে। মরণের ভয় দেখাইলেই মায়ের নিকট হইতে টাকা আদায় করা যায়। বাবা ছেলেকে শাসন করিতে গেলে মা 'আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেন'। অটলের পিতা জীবনচন্দ্র ছেলেকে পথে আনিবার জন্য বৈবাহিক গোকুলচন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়াছেন। অটলকেও ডাকিয়া আনা হইয়াছে। অটল গুরুজনের সামনে যেরূপ আচরণ করিল এবং যে ভাষায় আলাপ করিল, তাহাতে তাহাকে একটি নরপশু ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। দীনবন্ধুর সমবেদনা হইতে এই চরিত্রটি বঞ্চিত হইয়াছে। মদ্যপান ও বেশ্যাসক্তির যন্ত্রহিসাবে দীনবন্ধু এই চরিত্রটিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই অটল দোষেগুণে রক্তমাংসের মানুষ হইয়া দেখা দেয় নাই, নিমেদত্তের নিকট তাই সে একেবারে নিষ্প্রভ। অটল অধঃপতনের চরমে নামিয়াছে, তাই সে বাবা এবং শ্বশুর কাহারও মর্যাদা রাখিয়া কথা বলে না, বেশ্যার অশ্লীল ছড়া সে গুরুজনের মুখের উপর আবৃত্তি করে। অটলের আর ফিরিবার রাস্তা নাই।

দ্বিতীয় অঙ্ক-সম্বন্ধে একটি বিশেষ কথা এই যে, এই অঙ্কে অটলের চরিত্রের বিশেষ কিছু ক্রমবিকাশ দেখানো হউক আর না হউক, অটলের পরিবেশটিকে ফুটাইয়া তুলিতে নাট্যকার তৎপর হইয়াছেন বেশি। অটলের স্ত্রী কুমুদিনীর মনোবেদনা দিয়া অঙ্কটির আরম্ভ হইয়াছে। কুমুদিনী সেকালের বাঙালী ঘরের বধূ, স্বামীর দুশ্চরিত্রতার সক্রিয় এবং তীব্র প্রতিবাদ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কারণ, শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি ভক্তি বজায় রাখিয়া, তাঁহাদের কথা মানিয়া চলাই তখন কল্যাণী বধূর বৈশিষ্ট্য ছিল, এজন্য যদি স্বামিসৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, বাধ্য হইয়া সে যাতনাও তাহাদের সহ্য করিতে হইত। শাশুড়ী অসন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া সে স্বামীর দুশ্চরিত্রতার প্রতিবাদ করে না, কিন্তু সহ্য করাও তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই ননন্দা সৌদামিনীর সঙ্গে রহস্যালাপ করিয়াই সে মনের ব্যথা লাঘব করিতে চায়। কুমুদিনী ও সৌদামিনীর আলাপের মধ্যে গ্রাম্যতা আছে, অশ্লীলতা নাই। 'নীলদর্পণ' এবং 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র হাস্যরস থেকে 'সধবার একাদশী'র হাস্যরস যে অনেকখানি পরিমার্জিত, একথা বেশ বুঝা যায়।

দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে অধঃপতিত অটলকে তাহার কদর্য পরিবেশে প্রকাশ করিয়া দেখানো হইয়াছে। অটল তখন বাড়ীর বাহিরে গিয়া মন্থপায়ীদের সঙ্গে মেশে না, তাহার রক্ষিতাকে নিজের বাড়ীর বৈঠকখানায় আনে এবং তাহার সঙ্গিগণ এইখানেই আসিয়া মিলিত হয়। দীনবন্ধু এখানে মন্থপায়ীর একটি ছোটখাটো জগৎ টানিয়া আনিয়াছেন। এই চরিত্রগুলি আসিয়া নাটকের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই দৃশ্যে নাটকটির কৌতুকরস জমিয়াছে ভাল। বাঙ্গাল রামমাণিক্য, ডেপুটি কেনারাম, ভোলাচাঁদ প্রভৃতি মিলিয়া দৃশ্যটিকে হাস্যমুখর করিয়াছে। চরিত্রগুলি আকর্ষণীয়। কিন্তু অটল চরিত্রের ক্রমবিকাশে নিমচাঁদ এবং কাঞ্চনের চরিত্রই একমাত্র আলোচ্য।

বারবনিতার চরিত্র-হিসাবে কাঞ্চনচরিত্র স্বাভাবিক হইয়াছে। চরিত্রসৃষ্টিতে দীনবন্ধুর পরিমিতি-জ্ঞানের প্রশংসা এই প্রসঙ্গে করিতেই হইবে। কাঞ্চন বেশী কথা বলে না, কিন্তু যে কয়টি বাক্য সে উচ্চারণ করে, তাহাতে একটি ব্যবসায়-বুদ্ধিসম্পন্না বেশ্যাকেই আমরা চিনিতে পারি। ধনীর ছেলে অটল, তাহাকে আয়ত্তে আনিতে পারিলে কাঞ্চনের সৌভাগ্যের সীমা থাকিবে না। তাই প্রথম দিকে সে অটলের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া আলাপ করিয়াছিল, তাহার ভাষাও ছিল অনেকখানি ভদ্র ও সঙ্কোচ-সম্ভ্রম-মিশ্র। "অটলবাবু আমার প্রতি বড় নির্দয়—উনি সাতদিন ভাঁড়িয়ে একদিন যান। উনি বড় মানুষ, আমরা গরীব, আমাদের বাড়ীতে উনি গেলে ওর মনের খর্ব হয়—আমরা নাচতে জানিনে, গাইতে জানিনে, কিসে ওঁর মনোরঞ্জন করবো?"—[১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]। শেষের দিকের বাক্যটির অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত লক্ষ্য করিবার মতো। অটলের অর্থ থাকিলেও কাঞ্চনেরও যে তাহাকে মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে, একথাও কাঞ্চন প্রকারান্তরে বলিয়া দিল, বিনয়ের ভাষার ছলনায় অহঙ্কার প্রকাশ করিল। কিন্তু অটল এখন তাহার বশে আসিয়াছে, সে অটলের বাড়ীতে প্রবেশাধিকার পাইয়াছে। কাঞ্চন রাগ করিয়া চলিয়া গেলে অটলের 'বাবা' গিয়া তোষামোদ করিয়া ফিরাইয়া আনে, সুতরাং কাঞ্চন জানে, অটল তাহার নিকট এখন পালিত মেষশাবকের মতো, এবং তাহাকে লইয়া যতদিন ইচ্ছা খেলাইয়া সে আপন স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু পথের একমাত্র বাধা হইতেছে 'নিমে দত্ত'। নিমচাঁদ মাতাল, কিন্তু বেশ্যাসক্ত নয়। মাতালের সঙ্গে বেশ্যার সংস্পর্শে না গেলে তাহার মদ জুটে না, তাই সে বেশ্যার সংস্পর্শে আসে, কিন্তু সে নিজে লম্পট নয়, লাম্পট্য সে পছন্দ করে না। বেশ্যার চরিত্র তাহার ভাল করিয়া জানা আছে, তাই কেহ

বেশ্যাসক্তিতে ঢলিয়া পড়িলে অন্তরে অন্তরে নিমচাঁদ তাহা সমর্থন করে না। কাঞ্চন চতুরা গণিকা, নিমে দত্তকে সে চেনে। প্রথম প্রথম সে নিমে দত্তের সম্বন্ধে জোরালো ভাষায় কিছু বলে নাই, কিন্তু এখন যখন সে বুঝিতে পারিয়াছে যে, অটলকে সে যাহা বলিবে, অটল তাহাই শুনিবে, তখন সে ধীরে ধীরে নিমে দত্ত-সম্বন্ধে অটলের মন বিষাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে। কারণ, নিমচাঁদকেই সে সবচেয়ে ভয় করে,—নিমচাঁদ হয়তো কোনোদিন অটলের মোহ ভাঙাইয়া দিয়া তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইবে। তাই অটলের যেখানে দুর্বলতা, সেইখানে আঘাত দিয়াই কাঞ্চন নিমচাঁদকে অটলের অপ্রিয় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছে—"তুমি যদি নিমে দত্তকে আমার বাড়ী আর নিয়ে যাও, তাহলে আমি কিন্তু বাড়ীর ভিতর গিয়ে মায়ের কাছে বলে দেব।······ ব্যাটা, ভাই বড় বিরক্ত করে—ব্যাটা মাতাল হ'লে আমার বড় ভয় করে।" "ব্যাটা, ভাই বড় বিরক্ত করে" কথাটিই কাঞ্চনের ব্রহ্মাস্ত্র, অর্থাৎ কাঞ্চন অটলকে ভয় দেখাইতে চায় যে নিমচাঁদ তাহাকে রক্ষিতা করিতে চায়। ঐ-খানেই অটলের দুর্বলতা। কিন্তু নিমে দত্তকে অটল বিশ্বাস করে—"আমি তোমায় যেদিন থেকে রেখেছি, সেইদিন থেকে নিমচাঁদ তোমায় ত মাসী বলে জানি।" কাঞ্চন অতি সহজেই অটলের এ ধারণা ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, কারণ, তাহার হাতের কাছে উদাহরণ আছে। অটলও একদিন তাহাকে 'মাসী' বলিত। 'আমার কপালে বন্‌পো উপপতিই ঘটে। প্রিয়শঙ্কর যখন আমায় রাখলে, তখন রমানাথ আমায় মাসী বলতো, তারপর সেই রমানাথ আমায় সেবাদাসী করলেন, পাছে রমানাথ মনে কিছু ভাবে, তুমি আমায় যা বলতে মনে আছে? এখন আমি তোমার জানী হইচি।' নিজের আচরণে অটল বোধ হয় একটু লজ্জিত হইল, আগেকার 'মাসী' বর্তমানে 'জানী' হইয়াছে, সংস্কারে একটু আটকায়। তাই প্রসঙ্গটি উড়াইয়া দিবার জন্য সে গীত আরম্ভ করিল— "হায় কি কল্যে মাসী ব'লে,······তুমি যে মাসী হাঁরে মালিনী ফিরে চাও···।" কাঞ্চন বুঝিল তাহার যাহা বলিবার ছিল তাহা বলা হইয়াছে, কাজ হয় উহাতেই হইবে, তাই অটলের মন জয় করিবার জন্য সেও রসিকতায় যোগ দিল। গাড়ী প্রস্তুত হইলে কিছু পরেই কাঞ্চনকে লইয়া অটল বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে অটল ও নিমে দত্ত ফিরিয়া আসিল। এইবার মাতালের বৈঠক সুরু হইল—ভোলাচাঁদ, বাঙাল রামমাণিক্য, ডেপুটী কেনারাম প্রভৃতি ধ্বংসপথের যাত্রিগণ মিলিয়া নরক গুলজার করিতেছে। নিমচাঁদ ইহাদের মধ্যে

থাকিয়াও ইহাদের থেকে দূরে। তাই সে নিরপেক্ষ দ্রষ্টা-হিসাবে ইহাদিগকে দেখিতেছে এবং ইহাদের পরিণাম লইয়া করুণামিশ্রিত ব্যঙ্গ করিতেছে। মদ্যপান করিয়া রামমাণিক্য অচেতন হইয়া পড়িয়াছে, দামা তাহার অচৈতন্য দেহটি খাটে শোয়াইবার জন্য টানিয়া লইয়া যাইতেছে। নিমচাঁদ এই অচৈতন্যের মধ্যে মৃত্যুর পূর্বরূপ উপলব্ধি করিতেছে—

"নলিনী-দলগত-জলবৎ তরলং"—
"যেই শিরে বান্ধো সোনার পাগড়ি
শ্মশানেতে যাবে গড়াগড়ি।"

'আহা! কি পরিতাপ—"নয়ন মুদিলে সব শব রে"—gone to the undiscovered country, from whose bourne no traveller returns.'

মাতালের এই পরিণাম! মদের নেশায় মত্ত হইয়া অমূল্য জীবনটি সে অকারণ আস্ফালন করিয়া পৈশাচিক আনন্দে অপব্যয় করে। আর, একদিন মৃত্যু আসিয়া ভোগের জগৎ ও জীবন হইতে তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া যায়, অমূল্য মানবজন্ম পাইয়াও সে তাহার সদ্‌ব্যবহার করিতে পারে না। এই মদের নেশায় নিমচাঁদকেও পাইয়াছে, কিন্তু তাহার কারণ অন্য, তাহার জীবনের এক বিরাট ব্যর্থতার বেদনাই তাহাকে মদ্যাসক্ত করিয়াছে। সে কথা আমরা পরে জানিব।

নিমচাঁদ মদের জন্য অটলের সঙ্গী হইলেও অটলের বেশ্যাসক্তি সে সমর্থন করে না। এই মূর্খ ধনীর দুলাল একটি নিরেট বোকা, নিমচাঁদ তাহা বুঝে। সে মাতাল হইলেও ইহাদের চেয়ে যে সে বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, এমন কি বংশ-গরিমায়ও কুলীন, এ জ্ঞান তাহার আছে। তাই ইহাদের সকলের যাহা নাই, নিমচাঁদের তাহা আছে, তাহার আত্মমর্যাদাবোধ আছে। মূর্খের মুখে ইংরেজী শুনিলে সে তাহা সহ্য করিতে পারে না। অটল যখন নিজের মূর্খতা ঢাকিবার জন্য বলিল, 'আমি এখন ঘরে বসে পড়ি।' নিমে দত্ত উত্তরে বলিল, 'মদের দোকানের ক্যা লগ?' অটল আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য বলিল 'ঘরে পড়লে বুঝি বিদ্যে হয় না?' নিমে দত্তের উত্তরটি চমৎকার—'তুমি যে কেতাব ধরেচ, বিদ্যেও হবে, সুন্দরও হবে।' ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের উল্লেখ করিয়া নিমচাঁদ অটলের বেশ্যাসক্তির প্রতি বিদ্রূপ করিতেছে, এরূপ উচ্ছৃঙ্খল বেশ্যাসক্তের বিদ্যা হয় না, মনুষ্যত্ববোধ থাকে না, ইহাই নিমে দত্তের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা।

এতখানি যে নিমচাঁদ বোঝে, সে নিজে কেন মদ্যপায়ী হইল এবং এমন

দুশ্চরিত্রের দলে মিশিল? তাহার উত্তর নিমচাঁদের উক্তিতেই আছে। কেনারাম হাকিমকে দেখিয়া নিমচাঁদ বলিতেছে, "চিকিৎসা করতে জান? Canst thou not minister to a mind diseased, pluck from the memory a rooted sorrow, raze out the written troubles of the brain......" নিমচাঁদের মন কেন অসুস্থ এবং কোন্ যন্ত্রণা তাহার মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা জানিতে না পারিলে তাহার চরিত্র বুঝা যাইবে না। এই দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কেই তাহার উত্তর আছে।

কেনারামের নিকট আত্মপরিচয় দিতে গিয়া নিমচাঁদ গর্ব অনুভব করিয়াছে—যে "দত্ত কারো ভৃত্য নয়" নিমচাঁদ তাহারই বংশধর। নিমচাঁদ এমন 'মর‍্যাল কারেজের ছেলে', কিন্তু তাহার জীবনের সবচেয়ে বড় কলঙ্ক এই যে, এমন মর্যাদাসম্পন্ন দত্ত-বংশের সন্তানকেও শ্যালকের বাড়ীতে বাস করিতে হয়। পুরুষ "শালার নামে অধমাধম"। শ্যালকের বাড়ীতে থাকে বলিয়া নিমচাঁদ মনে করে, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি এবং বংশগরিমা থাকা সত্ত্বেও সে 'অধমাধম' এবং অটলের চাকর 'ধামার-ধামা দামার চাইতেও অধম'।

এই প্রসঙ্গেই আমরা জানিতে পারিলাম, নিমচাঁদের স্ত্রী জীবিত আছে, কিন্তু নিমচাঁদ তাহার সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়া এমনি করিয়া বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। নিমচাঁদ-চরিত্রের সমস্ত সমস্যার মূল এইখানে। এই সমস্যার উদ্‌ঘাটন করিতে গেলে নাটকটি ট্র্যাজেডী হইত, আর প্রহসন থাকিত না, সেইজন্য নাট্যকার নিমচাঁদের জীবনের এইদিকে ইঙ্গিত করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন, কিন্তু নিমচাঁদ-চরিত্রের ক্রমবিকাশ দেখাইতে তিনি ত্রুটী করেন নাই। আর, যে অটলকে লইয়া নাটকের প্রধান আয়োজন, সেই অটলের চরিত্রের যতটুকু বিকাশ-বিবর্তন আমরা আশা করি, নাট্যকার ততটুকু হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন। তাই নাটকীয় কাহিনী-হিসাবে এই নাটকের গল্পাংশের ক্রমবিকাশ এবং সঙ্গত পরিণতি নাই।

দ্বিতীয় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক হইতে নাট্যকারের সমবেদনা নিমচাঁদ চরিত্রের উপর সমধিক পতিত হইয়াছে, এই গর্ভাঙ্ক হইতে নিমচাঁদের চরিত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে। যাহা এতদিন চাপা ছিল, দ্বিতীয় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্কে যাহার আভাস মাত্র পাওয়া গিয়াছিল, এখন হইতে তাহাই উচ্ছ্বসিত অভিব্যক্তি লাভ করিয়া ব্যঙ্গ-হাসি-প্রধান প্রহসনকেও অনেকখানি ট্র্যাজেডীর বেদনায় মণ্ডিত করিয়াছে। কিন্তু শেক্স্‌পীয়ারের হাতে যেমন Serio-Comedy বা Tragi-Comedy্র সৃষ্টি হইয়াছে, দীনবন্ধু তাহা তৈরী করেন নাই। কারণ, এই নাটকে পূর্ব হইতে

তেমন প্রস্তুতি ছিল না। তবুও নিমে দত্তের চরিত্র অনুধাবন করিতে গিয়া আমরা অসঙ্গতির জন্য হাসিতে হাসিতে জীবনের ছুরপনেয় বেদনা-বোধে সমবেদনায় কাঁদিয়া ফেলি। ইহার আগে বাংলা প্রহসনে বা নাটকে এই বেদনাবোধ দেখি নাই। তাই বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুই সর্বপ্রথম সার্থক humour-স্রষ্টা। তাঁহার হিউমার বোধ চরিত্রের মর্মস্থল স্পর্শ করিয়াছে। নিমে দত্তের জীবনের দুঃখময় দিক্‌টি স্পষ্ট হইয়া উঠে তাহার কথায়—মদের নেশায় নিমচাঁদ সুরকি-বিছানো রাস্তায় শুইয়া পড়িয়াছে। একটি দাসী জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার এমন দশা হয়েছে কেন?' নিমচাঁদ উত্তর করিতেছে, "This is the state of man! To-day he puts forth the tender leaves of hope, to-morrow blossoms—তার পরেই আমার দশা।" দশাটি এই, 'বারুণীর স্নেহগর্ভ আলিঙ্গনে রাস্তার সুরকি আমার কুসুমশয্যা অপেক্ষাও সুকুমার বোধ হচ্ছে।' কথাটির মধ্যে অনুতাপ-জনিত গভীর বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। অনুতাপ আছে, কিন্তু অনুতাপ-জনিত বেদনায় আত্ম-সংশোধনের প্রয়াস নাই, কারণ নিমচাঁদ নিজেকে চেনে, সে জানে যে তাহার আর ফিরিবার উপায় নাই।

তবে সে এমন অনুতাপই বা করিতেছে কেন? কারণ, সে 'হিমাদ্রি-অঙ্গজ মৈনাক, পাখার জ্বালায় জলে' ডুবিয়া রহিয়াছে। এই বেদনা-মিশ্রিত অনুতাপের উক্তিটি নিমচাঁদ-চরিত্রে সবচেয়ে বেশি মাহাত্ম্য আরোপ করিয়াছে। নিমচাঁদ আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন 'দত্ত'-বংশধর, সে বিদ্বান্, মনের জ্বালায় সে মদ্যপান করে, মাতাল হইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকে। তাহার এই মনের জ্বালা কি?

তৃতীয় অঙ্কে ধীরে ধীরে আমরা তাহার পরিচয় পাইব। নকুলেশ্বরের উদ্যানের বৈঠকখানায় বসিয়া নিমে দত্ত দেওয়ালস্থ ক্লিওপ্যাট্রার ছবির স্তব করিতেছে। তাহার প্রলাপোক্তির মধ্য দিয়া এই স্তবের অন্তর্নিহিত অর্থটি সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না, তবে মোটামুটি অনুমান হয় যে, নিমে দত্তের নিকট নারী যেন ক্লিওপ্যাট্রার প্রতিনিধি। যে সকল নারীকে নিমে দত্ত দেখিয়াছে, তাহারা সৌন্দর্যময়ী বটে, কিন্তু তাহাদের সেই সৌন্দর্য পুরুষের সর্বনাশ করিয়াছে, কল্যাণ করে নাই। কল্যাণী 'ভদ্রা বধূ' নারীর জন্য নিমে দত্তের অন্তরে চাহিদা ছিল, কিন্তু এমন নারীকে সে কখনও পায় নাই। 'কলিকাতার লোকে স্বর্ণখুরে গর্দভকে কন্যাদান করবে, তবু সদ্‌গুণবিশিষ্ট বিষয়হীন সুপাত্রকে মেয়ে দেবে না।' নিমচাঁদের বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু তাহার স্ত্রী নিশ্চয়ই তাহার যোগ্যা ছিল না, থাকিলে নিমচাঁদ অবশ্যই এমন অধঃপতিত হইত না। 'গোক্‌লো ব্যাটা ভারি মাগ্-কপালে, কিন্তু ছুঁড়ি ভাতার-কপালে নয় বাবা—

এ রত্ন আমার হাতে পড়লে, রাইট্ ম্যান্ ইন্ দি রাইট্ প্লেস্ হতো।'—নেহাৎ ঠাট্টা নয়, আমরা উহাকে নিমচাঁদের মনের কথা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। দাম্পত্যজীবনের এই অতৃপ্ত বাসনাই যে নিমচাঁদের মন্তাসক্তির কারণ, তাহা অনুমান করা অন্যায় নয়। তবে নিমচাঁদ-চরিত্রের মাহাত্ম্য অনেক—সে বেশ্যাসক্ত হয় নাই, লম্পট হয় নাই, গৃহস্থবধূদের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা অপরিসীম। গোকুলের স্ত্রী অটলের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিতে চাহিয়াছে—এই কথা শুনিয়া নিমচাঁদ বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না। সে বলে 'মূর্খের সঙ্গে লোকে স্বর্গে যায় না, সে তোমার সঙ্গে নরকে যেতে রাজি হয়েছে? আমার ত কিছুমাত্র বিশ্বাস হয় না। তোমার জন্যে কুলাঙ্গনারা গোরুর বাঁটে গোবর দেওয়ার ন্যায় গায় কালি দিতে পারে, কিন্তু কুলে কালি দিতে পারে না।'

নিমচাঁদ ঠিকই বলিয়াছে। অটল দুশ্চরিত্রতার চরমে নামিয়াছে—স্ত্রী তাহাকে ঘৃণা করে, ভগিনী তাহাকে ভয় করে, সে নির্লজ্জ, কাঞ্চনকে নিজের বাড়ী আনিয়াছে। তাহার নির্লজ্জতা এবং পশুত্বের চরম পরিচয় হয়, যখন সে কাঞ্চনকে বলে, 'ঘরের মাগ বেরয়ে গেলেও আমার মুখ হেঁট হয় না—তুমি কেন গেলে তা বলো।' কথাটি একটি উৎকৃষ্ট dramatic irony. কারণ এই দৃশ্যেই (৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক) অটলের ভুলে তাহার স্ত্রীকেই বৈঠকখানায় আনা হইবে এবং আমরা দেখিব, অটলের মন সত্য সত্যই বিচলিত হইয়াছে।

এই দৃশ্যটি নাটকের শেষ দৃশ্য, এবং অটলের অধঃপতনের চরম রূপ দেখানো হইয়াছে এই দৃশ্যে। অটল কাঞ্চনকে যতখানি আদর-আবদারের মধ্য দিয়া ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, তাহা যে বোকামির নামান্তর, অটল তাহা বোঝে না। কিন্তু নিমচাঁদের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। নিমচাঁদ অটলকে সতর্ক করিবার জন্য বলিল, 'বাবা, তুমি বোকারাম অকালকুষ্মাণ্ড, তুমি বেশ্যার বজ্জাতির অন্ত পাবে?....তোমার কাঞ্চন যত সতী তা পায়েসে প্রকাশ।' কাঞ্চন অন্য উপপতির প্রতি আসক্ত জানিয়া অটল গলায় রুমাল জড়াইয়া মোড়া দিতে দিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। কাঞ্চন 'ক্রোড়ে করিয়া অটলকে ধারণ' করিল। একদিকে মূর্খ, মোহমুগ্ধ, অটলের বোকামি, অন্যদিকে কাঞ্চনের এই কপট ভালবাসা দুইটিই যে অর্থহীন, নিমচাঁদ তাহা জানে। তাই সে ব্যঙ্গ করিয়া উড়িয়া ভাষায় গান ধরিল,—'গোকুড়ে যশোদা কোড়ে দোড়ে নীড়মণি' ইত্যাদি। কাঞ্চনের এই ভালবাসার অভিনয় যে কতখানি অবাস্তব, তাহা

বুঝাইবার জন্যই ব্যঙ্গ করিয়া নিমচাঁদ যশোদার মাতৃস্নেহের উল্লেখ করিতেছে। কাঞ্চনের স্বরূপ প্রকাশ পাইল যখন গিন্নি ও সৌদামিনী প্রবেশ করিল। কাঞ্চন অটলকে ভালবাসিয়া ক্রোড়ে ধারণ করে নাই, তাহার সাক্ষাতে অটল মরিলে তাহাকেই হত্যার দায়ে জেলে যাইতে হইবে, তাই কাঞ্চন নিজেকে বাঁচানোর পথ দেখিয়াছিল। এবার যখন সে দেখিল, অটল মরে নাই, তখন সে মায়ের ছেলেকে মায়ের জিম্মায় রাখিয়া পলাইয়া বাঁচিল।

অটল যেন খানিকটা ফিরিবার মতো ভাব দেখাইল, সে নিমচাঁদকে বলিল, 'তুই বস, আমি মাকে দেখা দিয়ে আসি।' নিমচাঁদ ভাবিল, অটল সংশোধিত হইলে তাহার মদ ফুরাইবে, তাই সে হতাশ হইয়া পড়িল—'মহাদেব, ব্যোম্ ভোলানাথ! নিস্তার কর মা, তোমার গণেশের মুণ্ডু শনির দৃষ্টিতে উড়ে গেল বাপ।' নিমচাঁদ এইবার নিজের অসহায় অবস্থা এবং মদ্যপজীবনের কদর্যতা স্মরণ করিয়া অনুতাপ করিতেছে। কিন্তু এই অনুতাপ নিতান্ত আকস্মিক, পূর্বপ্রস্তুতি বিশেষ কিছুই নাই। নিমচাঁদ-চরিত্র যেভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মদ্যপজীবনের কদর্যতা-সম্বন্ধে কোন অনুতাপের বাষ্পও তাহার মধ্যে দেখি নাই। দাম্পত্যজীবনের ব্যর্থতার জন্য যে উক্তি, তাহা অকপট নগ্ন অনুশোচনা নয়, সুতরাং এখন এই নিতান্ত সাধুভাষায় যাত্রার সংলাপের অনুসরণে একখানি অনুতাপমূলক দীর্ঘ স্বগতোক্তি সমগ্র নাটকের পরিবেশে নিতান্ত অসঙ্গত এবং অসংলগ্ন হইয়াছে বলিয়াই অসার্থক হইয়াছে।

যাক্। অটলের কিছুটা যেন চৈতন্য হইতেছে। তাহার মোহ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। "নকুলবাবুকে আমি জানতেম ভাল মানুষ, এখন বোধ হচ্ছে উনি লম্পট।' অটলের উক্তি শুনিয়া নিমচাঁদ বলিল, 'লম্পটের মানে জান?' এক চরিত্রহীন আর একজনকে লম্পট বলিতেছে, নিমচাঁদ কি করিয়া তাহা সহ্য করিবে? নিমচাঁদ আর যাহাই হউক, লম্পট নয়, সুতরাং অটলকে ব্যঙ্গ করিবার অধিকার তাহার আছে। অটল এবং নিমচাঁদ উভয়েই মাতাল, কিন্তু দুইজনের মধ্যে বেশ খানিক পার্থক্য আছে। জ্ঞাতে হউক, অজ্ঞাতে হউক, নাট্যকার নিমচাঁদ চরিত্রকে অটলের সম্পূর্ণ বিপরীত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অটল মূর্খ, নির্বোধ, ধনীর দুলাল, সুন্দরী সাধ্বী স্ত্রী থাকিতেও সে নিতান্ত মূর্খজনোচিত বাহাদুরী দেখাইতে বেশ্যাসক্তি ও মদ্যপানে মত্ত হইয়াছে, ব্যক্তিত্ব হারাইয়া সে প্রবৃত্তির নেশায় গা ঢালিয়া দিয়াছে। নিমচাঁদ উপযুক্ত স্ত্রীর অভাবেই ঘরের বাহির হইয়াছে, মদ্যপান আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু অন্যের স্ত্রীর প্রতি সে আসক্ত হয় নাই বা বেশ্যার দাস হয় নাই। অধঃপতনের মধ্যেও

ব্যক্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। অটলকে তুলনার মধ্য দিয়া প্রকট করার জন্যই নিমচাঁদ চরিত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। অটলের চরিত্র এতদূর নামিয়াছে যে, সে নিজের খুড়-শাশুড়ীকে, গোকুলবাবুর স্ত্রীকে, বাহির করিয়া আনিবার মতলব করিতেছে। নিমচাঁদ এমন কদর্য প্রস্তাব সমর্থন করিতে পারে না। 'গৃহস্থের মেয়ে বার করবার মতলব কর না বাবা, ইহকাল পরকাল দুই যাবে, কাঞ্চনকে না রাখ তোমার মেগের কাছে যাও।'—এই উক্তি নিমচাঁদ-চরিত্রের মহত্ত্বেরই পরিচায়ক। কিন্তু অটল যখন একটি হিজড়ার সহায়তায় গোকুলবাবুর স্ত্রীকে বৈঠকখানায় আনিবার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল, তখন নিমচাঁদ ইহা সমর্থন করিতে পারিল না। ন্যায়া-ন্যায়বোধ তাহার এতটুকুও অবলুপ্ত হয় নাই, অটলকে সে চরম সাবধানতার বাণী শুনাইয়া দিল। 'তুমি ভদ্রলোকের অপমান করেছ বাবা, তুমি ব্রাহ্মণের গলায় মরা সাপ দিয়েছ বাবা ব্রহ্মশাপ হয়েছে, তোমার নিস্তার নাই।' ভবিষ্যতে যাহা ঘটিতে যাইতেছে, নিমচাঁদের মুখ দিয়া তাহা ভবিষ্যৎ বাণীর মতো বাহির হইয়া আসিল,—"The inequities of the husband are visited on the wife on the third and fourth generation." অটলের এই অপরাধের ফল যে তাহার নিজের স্ত্রীর অপমানের মধ্য দিয়া ফলিতে আরম্ভ করিবে, নাট্যকার সুকৌশলে তাহাই বলিয়া দিলেন।

অটল গোকুলবাবুর স্ত্রীকে বৈঠকখানায় আনাইতে গিয়া ভুল করিয়া নিজের স্ত্রী কুমুদিনীকেই আনাইয়া ফেলিল। নিমচাঁদ আর যাহাই করুক না কেন, এমন অন্যায় কাজ চক্ষে দেখিতে পারিবে না। তাই 'গোকুল, তুই আলাপচারী কর, আমি ওঘর থেকে কাপড় ছেড়ে আসি বাবা—নিতান্ত নারাজ নয়।' বলিয়া চলিয়া গেল। অটল যখন বুঝিতে পারিল, সে ভুল করিয়া নিজের স্ত্রীকেই আনাইয়া ফেলিয়াছে, তখন তাহার শ্মশান-বৈরাগ্যের মতো একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সে বলিল, 'ভাল আপদে পড়িচি—মদ খেতে শিখে আমার এই সর্বনাশ হলো—সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দিন কতক কাশী যাই।' কিন্তু এ বৈরাগ্য নিতান্ত সাময়িক, কাশীর পরিবর্তে অটল বাগানেই চলিল।

অটল চরিত্রের রূপায়ণে নাট্যকার খুব উন্নত শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারেন নাই। একটি সাধারণ মূর্খ, নীতিজ্ঞানহীন, বিবেচনাশূন্য মদ্যপ, উচ্ছৃঙ্খল ধনীর দুলাল করিয়াই তিনি অটলকে আঁকিয়াছেন। এই চরিত্রটিকে যেমন করিয়া আঁকিলে তাহার মধ্যে পিতৃভক্তি, পত্নীপ্রেম এবং মদ্যাসক্তি-বেশ্যাসক্তির দ্বন্দ্ব আসিতে পারিত এবং শেষ পর্যন্ত একটি দুর্বৃত্ত পরিবর্তিত দেবতা হইতে পারিত, তেমন করিয়া দীনবন্ধু ইহাকে আঁকিতে পারেন নাই। পারিলে ইহা

উৎকৃষ্ট শেক্‌সপীয়রীয় ধরনের কমেডী হইত। কিন্তু নিমচাঁদের চরিত্র-অঙ্কনে তিনি নাটকের উপসংহারে বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। ভদ্রঘরের বধূকে বাহির করিয়া আনার জন্য রামধনবাবু যখন নিমচাঁদকে প্রহার করিতেছে, নিমচাঁদ তখন হাসিমুখে মার খাইয়া যাইতেছে। এই প্রহারকে অদৃষ্টের দান মনে করিয়া সে ব্যঙ্গকৌতুকের মাধ্যমে ইহার জ্বালা লাঘব করিতেছে। নিমচাঁদের উক্তি, 'আমরা তো মদ মারি, আপনি যে মাতাল মারেন,' পরিস্থিতির গুরুত্বকে শুধু যে এক ঝলক হাস্যে ভরপুর করিয়া দেয়, তাহাই নহে, ইহা নিমচাঁদের অসীম ধৈর্য এবং সংযমের পরিচয় বহন করে। বরং সূক্ষ্মভাবে সে রামধনবাবুকে ব্যঙ্গ করিতেছে। 'রামবাবু, আপনি অতি বিজ্ঞ, অনেক পরিশ্রমে বিদ্যালাভ করেছেন, মহাশয়ের কিল-কলাপ কি পর্যন্ত জ্ঞানপ্রদ, তা যারা অধ্যয়ন করেছে, তারাই বল্‌তে পারে, আপনার পদাঘাত-পুঞ্জ প্রকৃত পীযূষ, And the last, though not the least, আপনার অর্ধচন্দ্রগুলিন যারপরনাই edifying, আপনার অর্ধচন্দ্রে আমার বুদ্ধি যেরূপ মার্জিত হয়েছে, Locke on Human Understanding পড়ে এরূপ হয়নি।' প্রচণ্ড মার খাইয়া তাহা এমন করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া অবশ্যই ধৈর্যের পরিচায়ক। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হইল এই যে নিমচাঁদ বলিতে চায়, মার দিয়া তাহার মতো মাতালকে সংশোধন করিবার প্রচেষ্টা বৃথা। এই প্রসঙ্গে নিমচাঁদের মর্যাদাবোধও লক্ষ্য করিবার মতো। রামধনবাবু যখন নিমচাঁদকে অভিযুক্ত করিয়া বলিলেন, 'তুই ব্যাটা মেয়ে সেজে বাড়ীর ভিতর গিয়ে বউ বার করে নিয়ে এলি?' তখন নিমচাঁদ সজোরে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, 'Damned lie, সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, আপনাকে কে বলেছে?' রামবাবু বলিলেন, 'অটল বলেছে?' নিমচাঁদ আশা করে নাই যে অটল মিথ্যা কথা বলিবে, কারণ, নিমচাঁদ জানে, যাহার এতটুকু লেখাপড়া জ্ঞান আছে, সে কখনও মিথ্যা কথা বলিতে পারে না। নিমচাঁদ বুঝিল, অটল ইয়াগোর চেয়েও ভীষণ শয়তান। তাই হঠাৎ তাহার মুখ হইতে ওথেলোর তীব্র ঘৃণাব্যঞ্জক উক্তি বাহির হইয়া আসিল। "I look down towards his feet,—but that's a fable; if thou be'st a devil, I cannot kill thee." মৃত্যুও এমন জঘন্য মিথ্যাবাদী শয়তানের চরম শাস্তি নয়। কিন্তু নিমচাঁদ রাগ করিবে কাহার উপর? অটল মূর্খ। তাহার উপর রাগ করিলে রাগেরই অপমান হইবে।

এই শেষ দৃশ্যে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। নাটকখানি আরম্ভ করিবার পূর্বে দীনবন্ধু motto-হিসাবে শেক্‌স্‌পীয়ার, বারেট্ এবং কলিন্‌স্-এর

তিনটি উক্তি উদ্ধার করিয়া মদ্যপানের দোষ ঘোষণা করিয়াছেন। তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে দীনবন্ধুর নাটকখানি উদ্দেশ্যমূলক। যুবক-সম্প্রদায়ের এই মদ্যাসক্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ-হিসাবে দীনবন্ধুর নিজের কিছু বক্তব্য আছে। নাটকের অন্য কোন পাত্রের মুখে দীনবন্ধু তাঁহার নিজস্ব মন্তব্য আরোপ করিতে পারেন না, কথাগুলি তিনি তুলিয়া দিয়াছেন নিমচাঁদের মুখে। নিমচাঁদ মাতাল, কিন্তু সে বিদ্বান্। এই বিদ্যার অহঙ্কার এবং বংশগরিমা তাহাকে দুশ্চরিত্র বা বেশ্যাসক্ত হইতে দেয় নাই। সে ভদ্রসন্তান, সভ্যতা ও ভব্যতা-জ্ঞান তাহার আছে, তাহার দুশ্চরিত্র সঙ্গীদের তাহা ছিল না। নারী-প্রগতির নামে ইহারা যে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিতেছে, নিমচাঁদ তাহা জানে। তাই কথা-প্রসঙ্গে তাহার মুখ দিয়া নাট্যকার বলাইলেন, 'সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়।' নিমচাঁদের ব্যঙ্গপূর্ণ উক্তি, "আপনার উপযুক্ত ভাইপো সভ্যতার অনুগামী হয়ে তাঁর হৃদয়প্রিয় বন্ধুর সহিত আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলেন—Female emancipation is not a bad thing among gentlemen." এই উচ্ছৃঙ্খল যুবকেরা যাহাকে সভ্যতা বলিয়া মনে করে, তাহা আদৌ সভ্যতা নয় এবং অটল 'gentleman' অবশ্যই নয়। নিমচাঁদ অটলকে চিনিত, কিন্তু সে এতখানি অধঃপতিত হইতে পারে, ইহা নিমচাঁদ ভাবিতে পারে নাই। নিমচাঁদ তাই Paradise Lost আওড়াইয়া অটলকে ভর্ৎসনা করিল। অটল তিরস্কৃত হইয়া নিমচাঁদকেই অভিযোগ করিয়া বলিল, 'ওঁরা আমাকে মজালেন, আবার রাগ কচ্চেন।' উত্তরে নিমাইচাঁদ যাহা বলিল, তাহাতে তাহার চরিত্রের মহানুভবতাই প্রকাশ পায়। 'বাবা, আমি মদ খাই আর যা করি, তোকে বারংবার বলিচি, রাত্রে কখন বাইরে থাকিস্‌নে, আপনার ঘরে গিয়ে শুস।' নিমচাঁদ অটলকে মদ ধরাইয়াছে, কারণ, ধনীর সন্তান মদ্যপায়ী হইলে সেও বিনা পয়সায় মদ্যপান করিতে পারিবে। অটল কাঞ্চনকে রাখিলে তাহার পিতার অসদুপায়ে অর্জিত অর্থের কিছু ব্যয় হইবে বটে, কিন্তু পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যাওয়ায় এমন কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু নিমচাঁদ অটলকে কখনও স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যের অবহেলা করিতে উপদেশ দেয় নাই। মানবচরিত্রে নিমচাঁদের যতটুকু জ্ঞান আছে, অটলের তাহার কণামাত্রও নাই। সে ভাবিয়াছিল, অটল রাত্রে বাড়ী থাকিলে নিমচাঁদ কাঞ্চনের বাড়ীতে রাত কাটাইবে। এইবার এই মহামূর্খকে নিমচাঁদ কঠোর সত্য শুনাইয়া দিল—"তোমার বুদ্ধির পরিধিতে টাউন হলের থামে ছুপেঁছ হয়। আপনি কাছে থেকে যেন রাত বাঁচালে, দিন বাঁচাবার উপায় কি, নকুলের বাগানের উপায় কি? কাঞ্চনের সতীত্ব যেন

চৌকি দিয়ে রক্ষা কল্যে, তোমার মেগের সতীত্ব বুঝি বাবার উপর বরাৎ? ক্যাডাভরাস্।"

নিমচাঁদের চরিত্র-সম্বন্ধে শেষের বাক্যটি লক্ষ্য করিবার মতো। 'তোমার মেগের সতীত্ব বুঝি বাবার উপর বরাৎ?' নিমচাঁদ জানে, স্বামী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া স্ত্রীকে উপেক্ষা করিলে স্ত্রীও প্রবৃত্তির দায়ে বিপথগামিনী হইতে পারে। অথবা তাহা না হইলেও স্ত্রীকে নির্মমভাবে উপেক্ষা করিয়া তাহার জীবন বিষময় করিবার ধর্মসঙ্গত অধিকার স্বামীর নাই। এত জানিয়াও সে নিজের স্ত্রীকে কেন উপেক্ষা করিল? একবার স্বগতোক্তিতে সে স্ত্রীর প্রতি সমবেদনা জানাইয়াছিল। কিন্তু ইহাও আমরা দেখিয়াছি যে, এই স্ত্রীর সংস্পর্শে যাওয়ার ইঙ্গিতমাত্র শুনিয়া নিমচাঁদ আহত হইয়াছে। অথচ সুস্থ দাম্পত্যজীবনের লোভ যে তাহার ছিল, একবার তাহার প্রলাপোক্তির মধ্য দিয়া এবং অটলের সঙ্গে গোকুলবাবুর স্ত্রী-সম্বন্ধীয় আলাপে আমরা তাহাও জানিতে পারিয়াছি। অথচ কোন্ প্রচণ্ড আঘাতের ফলে বা দাম্পত্যজীবনের কোন্ গুরুতর অসঙ্গতির জন্য নিমচাঁদের জীবন এমন ছন্নছাড়া হইল, সে দেবতা হইয়াও ইচ্ছা করিয়া অমানুষ হইল, অমানুষ হইয়াও মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে পারিল না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। নিমচাঁদ চরিত্রের হাস্যমুখরতার মধ্যে ট্র্যাজেডীর যে গভীর বিষণ্ণতা লুকাইয়া আছে, নাট্যকার তাহার আভাসমাত্র দিয়াছেন। কিন্তু এই ট্র্যাজেডীকে তিনি মোটেই গুরুত্ব দেন নাই, তাই বিশ্লেষণও করেন নাই। 'সধবার একাদশী' তাই একখানি উৎকৃষ্ট শেক্স্পীরীয় নাট্যের সম্ভাবনা বহন করিয়াও সার্থক নাটক হইতে পারিল না। উহা দীনবন্ধুর অপূর্ব শক্তিমত্তার পরিচয় বহন করিয়াও অনুপেক্ষণীয় শক্তিহীনতার পরিচায়ক হইয়া রহিল। তবে দীনবন্ধুর প্রহসন-কয়খানির মধ্যে যে 'সধবার একাদশী' সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, আর সেই শ্রেষ্ঠত্ব শুধুমাত্র নিমচাঁদ চরিত্রের গৌরবে। 'জামাই-বারিক' অত উন্নত সৃষ্টি হয় নাই।

'জামাই বারিক' নাটক-লক্ষণাক্রান্ত। 'সধবার একাদশী' নাটকে ঘটনার ক্রমবিকাশ বিশেষ কিছুই নাই। নায়ক অটলের চরিত্রের পরিবর্তন বিশেষ কিছুই হয় নাই। ফলে নাটকীয় ঘটনা যেখান হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল,—সমস্যার সমাধান কিছুই হইল না। 'জামাই বারিকে' আরম্ভ ও পরিণতি দুইই আছে। দীনবন্ধু বলিতে চাহেন, "Of all the blessings on earth the best is a good wife; a bad one is the bitterest of human life." ঘটনা ও চরিত্র-চিত্রণের মধ্য দিয়া তিনি

এই সত্যকে রূপায়িত করিতে পারিয়াছেন। অবশ্য উহা কতখানি শিল্পসম্মত হইয়াছে, তাহাও আমরা আলোচনা করিয়া দেখিব।

'জামাই বারিক' প্রহসন নয়, কমেডী। নাট্যকার তাঁহার নাটকের পাত্র-পাত্রীর জীবন লইয়া হাসিতে হাসিতে গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছেন। জীবনের অসঙ্গতিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে না পারিয়া তিনি কান্নার আয়োজন করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনাকে বিষাদময়ী পরিণতির দিকে চালিত না করিয়া তিনি চরমে মিলন ঘটাইয়াছেন। এই মিলন জোরজুলুম করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হয় নাই। ঘটনা ও চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের মধ্য দিয়াই এই পরিণতি আসিয়াছে, তাই ইহার মধ্যে অসঙ্গতি এতটুকুও নাই। অবশ্য হাস্যরস সৃষ্টি করিতে গিয়া নাট্যকার কোথাও কোথাও বাস্তবসীমা অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয়। প্রসঙ্গতঃ সে বিষয়ে আলোচনা করিব।

'জামাই বারিক' প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। ইহা অবশ্য বাংলা সাহিত্যে প্রথম কমেডী নয়। ইহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে কয়েকখানি ভালোভালো মিলনান্ত নাটক রচিত হইয়াছে। মধুসূদনের 'পদ্মাবতী', দীনবন্ধুর নিজের লেখা 'নবীন তপস্বিনী' ও 'লীলাবতী' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে 'লীলাবতী'ই প্রথম সামাজিক নাটক যাহাকে রচনা-হিসাবে মোটামুটি সার্থক বলা যাইতে পারে। কিন্তু উহার সঙ্গে 'জামাই বারিক'-এর তুলনামূলক পার্থক্যটুকুও লক্ষ্য করিবার মতো। 'লীলাবতী'র নায়িকা-চরিত্রে বাস্তবতার অভাব নাটকখানিকে দুর্বল করিয়াছে। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা সর্বজন বিদিত। সেদিক্ দিয়া দীনবন্ধুর 'জামাই বারিক' বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম সার্থক মিলনান্ত সামাজিক নাটক, যাহার মধ্যে নায়ক নায়িকা-চরিত্রে বাস্তবতাগুণ এতটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, অর্থাৎ নাট্যকারের রোমান্স-প্রিয়তা কল্পনার অতিচার সৃষ্টি করিয়া আমাদের বাস্তব জগতের প্রত্যক্ষদৃষ্ট চরিত্রগুলিকে রূপকথার পাত্রপাত্রী করিয়া তোলে নাই। 'জামাই বারিক'-রচনায় দীনবন্ধু শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। সুদক্ষ স্রষ্টার যে সংযমের প্রয়োজন, এই নাটকের রচনায় দীনবন্ধুর সেই সংযমের পরিচয় আমরা পাইতেছি। কৌলীন্যপ্রথার দোষ এবং বহুবিবাহের কুফল দেখানোই দীনবন্ধুর উদ্দেশ্য, কিন্তু এই উদ্দেশ্য অতিপ্রকট হইয়া নাট্যকারের সৃষ্টিকেই ব্যর্থ করিয়া দেয় নাই। লেখকের নিজের কথা বলিবার জন্য চরিত্রগুলিকে উপায়মাত্র-হিসাবে তিনি ব্যবহার করেন নাই, পাত্রপাত্রীগণের নিজ নিজ কার্য ও বাক্যের মধ্য দিয়া নাটকীয় ঘটনা স্বাভাবিকভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

'বগি-বিন্দির চুলোচুলি'র যে চিত্র এই নাটকে আছে, তাহার মধ্যে যেটুকু আতিশয্য নাট্যকার সৃষ্টি করিয়াছেন, কৌতুককর চরিত্রে তাহা মোটামুটি মানিয়া লওয়া যায়। অবশ্য বগলা ঝগড়া করিতে করিতে পদ্মলোচনের পা কাটিয়া দিল, ইহা সত্যই কল্পনার অতিমাত্রিকতা।

এইবার আমরা নাটকের কাহিনী ও চরিত্রগুলির আরম্ভ, ক্রমবিকাশ ও পরিণতির ধারা লক্ষ্য করিব।

নাট্যারম্ভে চরিত্র-চিত্রণে এবং সংলাপ-সৃষ্টিতে রামনারায়ণের 'কুলীনকুল-সর্বস্বে'র প্রভাব আছে। পাত্রের রূপগুণ-বর্ণনায় দীনবন্ধুও রামনারায়ণের মতো ছড়া ("কৃষ্ণবর্ণ কটাচুল……কুললক্ষ্মী অন্ধ করুণায়।") ব্যবহার করিয়াছেন। কুলীনদের বিরুদ্ধে কটূক্তিও রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-নাটক স্মরণ করাইয়া দেয়। 'রামচন্দ্র বললেন, হে বীরশ্রেষ্ঠ বালিরাজাত্মজ! তোমার প্রার্থনা অবশ্য ফলবতী হইবে ; তোমার প্রকাণ্ড শরীর তিন খণ্ডে বিভক্ত হ'য়ে কলিযুগে তিনটি অবতার হবে, সেই তিন মহাত্মা তোমার লেজবিনির্মিত আসন প্রচলিত রাখবেন।' প্রভৃতি উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' নামক রস-রচনার অনুরূপ। এই তীব্র-আঘাত-জর্জরিত বাক্যগুলি দেখিয়া প্রথমতঃ মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দীনবন্ধুর এই নাটকখানিও রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্বে'র মতো ব্যঙ্গপ্রধান, প্রচারমূলক রচনায় পর্যবসিত হইবে। কিন্তু প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে আসিয়া আমরা শুধু ব্যঙ্গকৌতুকের সাক্ষাৎই পাইলাম না, এখানে দেখিলাম, হাসি-তামাসার অন্তরালে বেদনার যে আগুন চাপা ছিল, তাহার দুই-একটা জ্বালাময় স্ফুলিঙ্গ বৃত্তি-প্রবৃত্তির দমকা হাওয়ায় মাঝে মাঝে উড়িয়া আসিতেছে। কামিনীর শয়নঘরে বসিয়া কামিনী ও ভবি ময়রাণী আলাপ করিতেছে। এই আলাপে স্থূলতা বা গ্রাম্য রসিকতা যেটুকু আছে, তাহা ঐ গ্রাম্য নারীদের স্বাভাবিক বাক্যালাপের অঙ্গ। দীনবন্ধু এখানেও তাহা ঘষিয়া-মাজিয়া উজ্জ্বল করিবার জন্য অস্বাভাবিক কিছু করিতে যান নাই। বরং ঐ গ্রাম্যতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া তিনি যে হাস্যমিশ্রিত বেদনার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার মতো, অথচ ইহার মধ্য দিয়া নাট্যকারের উদ্দেশ্যমূলকতাও সার্থক হইয়াছে।

কেশবপুরের জমিদার বিজয়বল্লভ বাছিয়া বাছিয়া কুলীন আনিয়া 'ঘর-জামাই' রাখিতেছেন। ইহার দ্বারা তিনি বংশগৌরব রক্ষা করিতেছেন। কৌলীন্য-প্রথার যে কী শোচনীয় অধঃপতন হইয়াছে, 'লীলাবতী'-র দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে দীনবন্ধু স্পষ্টভাষায় তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু 'জামাই বারিক'-এ তিনি সেবিষয়ে এতটুকুও বক্তৃতা করেন নাই। পরিস্থিতি-অবলম্বনে চরিত্র-

বিকাশী সংলাপের মাধ্যমে তিনি সমস্যাটিকে সত্য ও প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংলাপে চরিত্রের এক-একটি দিক্ প্রকাশ্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ভবি ময়রাণী ও কামিনীর আলাপ :

"ভবি। ভাতার যে তোর মনে ধরিনি।

কামিনী। তা বলে তো আর আমি বিয়ে করিনি

ভবি। পথ থাক্‌লে কর্‌তিস্।

কামিনী। না থাক্‌লেও কর্‌বো।

ভবি। কাকে লো?

কামিনী। যমকে।"

কথাগুলি সংক্ষিপ্ত; কিন্তু গভীর বেদনা-পূর্ণ। কুলীনকন্যার দাম্পত্যজীবনের করুণ চিত্র এখানে অঙ্কিত হইয়াছে। কৌলীন্য-প্রথা যখন প্রবর্তিত হয়, তখন 'আচার-বিনয়-বিদ্যাদি'-নবগুণ-ভূষিত শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকেই কুলীন আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। নারীগণ এই পুরুষদিগকে বর্ণে, বংশে, বিদ্যায়, যোগ্যতায় 'বর' বা সর্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহাদিগের উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ সন্তানলাভের জন্য ইহাদিগকে বরণ করিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিত। এই শ্রেষ্ঠ পুরুষদের পত্নীত্বের গৌরব অর্জন করার জন্য তাহারা ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-গৌরব কিঞ্চিৎ খর্ব করিয়াও সপত্নী থাকা সত্ত্বেও অনেক সময়ে ইহাদিগকে বরণ করিত। তাই কৌলীন্যের সঙ্গে বহু-বিবাহেরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হইয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী কালে এই কৌলীন্যপ্রথা এতই বিকৃত হইল যে কুল-লক্ষণের পরিবর্তে কুলীন-জন্মই কৌলীন্যের মর্যাদা পাইল। আর, যোগ্যতা বা গুণ থাকুক আর না থাকুক, কুলীনের বংশে জন্মিলেই তাহাকে রাশি রাশি কন্যাদানের প্রথা দাঁড়াইয়া গেল। কিন্তু তাহার ফল হইল সম্পূর্ণ অশুভ। 'জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে' নারী কখনও গ্রাহ্য করিতে পারে না, যাহাতে তাহার নারীত্বেরই অপমান হয়। তাই কুলীন-বধূগণ তাহাদের এই অযোগ্য স্বামী লইয়া যন্ত্রণাময় জীবন যাপন করিয়াছে, অথচ এই জীবন হইতে অব্যাহতি-লাভের উপায়ও নাই। ভারতীয় নারীর 'সতীত্ব অমূল্য-নিধি', কোনো অবস্থায়ই সে অমূল্য-নিধি বিসর্জন দেওয়া যায় না। পত্যন্তর-গ্রহণের প্রশ্নই সেখানে উঠিতে পারে না। পছন্দ হউক আর না হউক, পতিকে 'পরম গুরু'-হিসাবে পূজা করিতে হইবে; তিনি গৌরবে প্রতিষ্ঠিত 'গুরু' না হইয়া অপদার্থ 'গরু' হইলেও স্ত্রীর বলিবার কিছুই নাই। কামিনীর মেজদিদি এই পন্থা অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পিতার বিরুদ্ধ আচরণে পারে নাই বলিয়া

আত্মহত্যা করিয়াছে। কামিনীও ভাবিতেছে, হয়তো দিদির পথে তাহাকেও যাইতে হইবে।

কামিনী যে তাহার স্বামীকে একেবারেই পছন্দ করে না, তাহা নহে অন্যান্য জামাইদের তুলনায় তাহার স্বামী অভয়ের একটু পার্থক্য আছে। সে মত্তপ নয়, সুতরাং তাহাকে শ্রদ্ধা করিবার একটু অবকাশ আছে। আর এইটুকু আছে বলিয়া নাটকের শুভপরিণামের পথ খোলা রহিল। কামিনী তাহার স্বামীকে অবজ্ঞা করে, তাহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। 'কন্যা কাময়তে রূপম্।' অভয় আদৌ পরিচ্ছন্ন নয়। কামিনী স্বামীর এই মলিন বেশবাস এবং অপরিচ্ছন্নতা পছন্দ করে না। এই মনোবৃত্তির পশ্চাতে যে স্বাভাবিক মনোবৃত্তি আছে, তাহা হইতেছে এই যে নারী দেহমনঃপ্রাণে সুন্দর পুরুষকে অবলম্বন করিয়া নিজেও সুন্দর হইয়া উঠিতে চায়। পুরুষ নারীর আত্মবিকাশের অবলম্বন। সুন্দর পুরুষের অবলম্বনের অভাবে তাহার নিজের জীবনের বিকাশে বাধার সৃষ্টি হয় বলিয়া সে ক্ষুন্ন হয়, ক্ষিপ্ত হয়। তাহার রোষ বাধাহত, অতৃপ্ত প্রেম হইতে উৎপন্ন হয়। কামিনীরও তাহাই হইয়াছে।

দ্বিতীয় কারণটি আরও স্বাভাবিক ও মনস্তত্ত্ব-সম্মত। নারী স্বভাবতঃ চায় পূরণধর্মী পুরুষকে অবলম্বন করিয়া বৃদ্ধি পাইতে। তাই যে পুরুষ আত্মনির্ভর, উপার্জনশীল, স্ত্রীকে সর্বতোভাবে পরিতৃপ্ত করিয়া সচ্ছল সুন্দর গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিতে পারে, তেমন পুরুষকে স্বামি-হিসাবে পাইয়া নারী সুখী হয়, নিজেকে ধন্য মনে করে। কিন্তু যে সহায়-সম্বলহীন, স্ত্রীর আত্মীয়ের দয়ার উপর একান্ত নির্ভরশীল, স্ত্রী তাহাকে স্বভাবতঃই পছন্দ করিতে পারে না। সে জানে, ইহাকে লাথি মারিলেও চলিয়া যাইবে না, পেটের দায়ে পালিত কুকুরের মতো আবার চলিয়া আসিবে। তাই সে স্বামীর উপর স্বামিনী সাজিয়া বসে; প্রভুত্বের চরম শক্তি দেখাইয়া লয়। কামিনীও তাহাই করিয়াছে। সে জানে, "ঘর-জামায়ের মান আর অপমান—ঘরজামায়ের গা, না গণ্ডারের গা, মারলেও দাগ পড়ে না—তাদের মন লোহার গঠন, অপমানের হুল বেধে না, বরং ভোতা হয়ে যায়।" অভয়ের 'তেঁজ' তাই সে সহ্য করিতে পারে না। স্বামীকে সে অপমান করিবার সাহস পায়, কারণ, সে জানে, অভয় রাগ করিয়া বেশিদিন বাড়ী গিয়া থাকিতে পারিবে না, 'জঠোরের' 'আগুনে তাহাকে টানিয়া আনিবে।

ঘর-জামাইরা তাহাদের অবস্থা জানে। 'আমরা যেন ভাই কুক্ সাহেবের আড়গড়ার মেল্ গ্যাণ্ডার ফিমেল গুস্'—ঘরজামাইয়েরা প্রজননের উপায়নবিশেষ; তাহাদের জীবনের অন্য কোনো মূল্য নাই। জানিয়া-শুনিয়াও ঘর-জামাইরা এত

অপমান, নির্যাতন, অবহেলা সহ্য করিয়াও শ্বশুরবাড়ী থাকে কেন? অভয়ের উক্তিতে সেকথা প্রকাশ পায়। 'যদি খাবার সংস্থান থাকে, তাহ'লে কি আর সেখানে যাই।' পেটের দায়ে অন্ত জামাইরা স্ত্রীর চাকর হইয়া থাকে, কিন্তু অভয় দরিদ্র, বেকার ঘরজামাই হইলেও তাহার আত্মমর্যাদাবোধ আছে, স্ত্রীর আধিপত্য সে সহ্য করিবে না—'মাগ মনিব। এবারে যদি কিছু অহঙ্কারের চিহ্ন দেখি, তাহ'লে মুখে নাতি মেরে বৃন্দাবনে চলে যাব।'

কামিনীর অহঙ্কার, অতৃপ্তি এবং অভয়ের অপমানাহত অভিমান এবার চরম মুহূর্তের সম্মুখীন হইল—তৃতীয় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক—দৃশ্যটিতে নাটকীয় ঘটনার চরমোত্থান (climax)।

কামিনী ভাবিল, তাহার জয় হইয়াছে। অভয় যদিও 'রাগ করে গেল, থাকৃতে তো পাল্যে না, তু করে ডাকৃতেই তো আবার এয়েচে।' কিন্তু অভয় আসিলেও কামিনীর মনে বিরক্তি বই আনন্দের সঞ্চার হয় নাই—'বালিশের ওয়াড়গুলিন মল্লিকা ফুলের মত ধপ্‌ধপ্‌ কচ্চে, একদিন শুলেই ক্ষিতি মেথরানীকে ডাকৃতে হবে।' নিজের রূপযৌবন-সম্বন্ধে সে সজাগ। আয়নার নিকট দাঁড়াইয়া সে নিজের সৌন্দর্য এবং প্রসাধন দেখিতেছে, আর ভাবিতেছে, এ সমস্তই তাহার জীবনে বিফল হইয়াছে। তাহার বাবা দেশে তাহার উপযুক্ত বর খুঁজিয়া না পাইয়া এই 'শ্যাওড়াগাছের কেলেসোণা' ধরিয়া আনিয়াছে।

কামিনীর যখন মনের এইরূপ অবস্থা, তখন তাহার শয়নকক্ষে অভয়কুমার প্রবেশ করিতেছে। কামিনী যতখানি উত্তেজিত হইয়া আছে, অভয়কুমারের মনের অবস্থা ঠিক তাহার বিপরীত। সে ঘরে ঢুকিয়াই, আদরের স্বরে বলিল, 'কামিনী, এখনো যে জেগে রয়েছ?' কিন্তু কামিনীর প্রভুজনোচিত আদেশ অভয়ের ভাল লাগিল না। কামিনী যখন বলিল, 'টেবিলের উপর এক বোতল গোলাপ জল আছে, ওটা সব তোমার গায়ে ঢেলে দাও, আতর-ল্যাভেণ্ডার মুখে রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে মাখ, তারপর আমার কাছে এস।' অভয়ের তাহা ভাল লাগিল না। সে সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, 'আমি তা করবো না।' স্ত্রীর আদেশে চাকরের মতো খাটিতে অভয় প্রস্তুত নয়। অন্য জামাইয়েরা বউএর হাতে বাঁদর নাচে, 'তারা জামাই-বারিকের জাম্বুবান, অভয় তাহাদের মতো ব্যক্তিত্বহীন নয়। এত অপমান অভয়ের সহ্য হইতেছে না, তাহার অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছে, তবুও মুখে সে-কথা সে প্রকাশ করিতেছে না। অভয়ের পৌরুষ জাগিয়া উঠিল, সে বলিল, 'কামিনী, তুই এমন নির্দয় কেন?' এই 'তুই' সম্বোধন আদরের পরিচায়ক নহে। অভয় পুরুষ, অবজ্ঞাকারিণী স্ত্রীকে

সে যে ঘৃণা করিতে পারে, হেলায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, এই দৃঢ় উক্তি তাহারই পূর্বাভাস ; আবার, ঐ 'এমন নির্দয় কেন' উক্তির মধ্যে এই কথা লুক্কায়িত আছে যে, অভয় তাহাকে সত্যই ভালবাসে, অনাদর করিলে বা নির্দয়তা প্রকাশ করিলে সেই ভালবাসা আর থাকিবে না। কামিনী ইহার অর্থ না বুঝিয়া হঠাৎ এক বিপরীত কাণ্ড করিয়া বসিল, সে নাক টিপিয়া নাকিস্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। অভয় ভাবিল কামিনীকে পেত্নীতে পাইয়াছে, তাই সে 'মলেম রে, মেরে ফেল্লে রে' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। চিৎকারে বাড়ীর বৌ, চাকরানীরা সব আসিয়া জুটিল। 'বৌমা' কামিনীকে দুইকথা শুনাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। এতখানি কেলেঙ্কারী হইবে কামিনী তাহা কল্পনাও করিতে পারে নাই, সকালে উঠিয়া সে লজ্জায় কাহারও নিকট মুখ দেখাইতে পারিবে না। এই বিষয়ে নিশ্চয়ই নানারূপ আলোচনা হইবে, তাহার মতে অভয়ই এই সমস্ত অনর্থের কারণ। তাহার যত রাগ গিয়া অভয়ের উপর পড়িল, সে বলিল, 'আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন, খাটে উঠবে আর ন'দিদির মতো করবো, নাতি মেরে নাব্‌য়ে দেব।' অপমানে, আত্মগ্লানিতে অভয়ের অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। সে জানে, এই দাম্পত্যজীবনের অভিনয় আজই তাহাকে এইখানেই শেষ করিতে হইবে, স্ত্রীর এতখানি অহঙ্কার সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছে না। তাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বলিয়া উঠিল, 'বটে—এতদূর !'

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। দীনবন্ধু তাঁহার নাটকে সংলাপ-রচনায় অনেক জায়গায় রামনারায়ণের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। দীর্ঘ দীর্ঘ উক্তি এবং পয়ার ত্রিপদী ছড়া ব্যবহার করিয়া রামনারায়ণ তাঁহার নাটকে যাত্রা-পাঁচালী-কথকতার প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। দীনবন্ধু রামনারায়ণের অনুসরণে নিজের নাটকেও ঐগুলির ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু কোনো কোনো নাটকে দীনবন্ধু এই প্রভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং উৎকৃষ্ট নাট্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। 'জামাই-বারিক'-এর এই দৃশ্যটি তাহার একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। এখানে সংলাপের ভাষা চরিত্র-বিকাশী হইয়াছে, অন্তরের ভাব সম্যক্ প্রকাশ করিয়াছে, কিন্তু সে ভাষা সংযত, যথাপরিমিত। অভিমান এবং ক্রোধ একসঙ্গে মিলিয়া অভয়ের মনকে এত আলোড়িত করিয়াছে যে, তাহার মুখে ভাষা আসিতেছে না, তাই অভয়ের উক্তি খুব সংক্ষিপ্ত। ইহাই চরিত্র-বিকাশী স্বাভাবিক সংলাপ, এখানে অভয় বিরাট বক্তৃতা করিলেই তাহা অস্বাভাবিক হইত।

যাক্। অভয়ের উক্তি কামিনীর ভাল লাগিল না, ইহা তাহার নিকট অপদার্থের আস্ফালন বলিয়াই মনে হইল। তাই সে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, 'চক রাঙ্গাচ্চ, মার্‌বে না কি?' অভয়ের নিকট হইতে কামিনী যেমন উত্তর আশা করিয়াছিল, ঠিক তাহার বিপরীতটিই পাইল। অভয় দরিদ্র হইলেও অসভ্য, অপদার্থ নয়। সে বলিল, 'গোঁয়ার হ'লে মাত্তেম্।' প্রবল উত্তেজনার মুহূর্তেও অভয় অপূর্ব সংযত-বাক্, সে অতি অল্পকথায় কামিনীকে জানাইল, 'কামিনী, আমি তোমার স্বামী—কামিনী, আমি জন্মের মতো যাই, তোমাকে একটি কথা বলে যাই, তোমার কথায় আমার চক্ষু দিয়ে কখনও জল পড়েনি, আজ পড়্‌লে।' এই চক্ষের জল দুর্বলের অশ্রু নয়, অভিমানাহত পৌরুষের বেদনার নির্যাস। কামিনী অন্যান্য জামাইদের তুলনায় নিজের স্বামীর পার্থক্য-টুকু বুঝিতে পারিল, তাই সে অভয়কে শান্ত করিতে গিয়া বলিল, 'আমার মাথা খাও, রাগ ক'রো না, খাটে এস।' কিন্তু অভয় এত আঘাত পাইয়াছে যে, সে আর এমন স্ত্রীর সংস্পর্শে থাকিবে না। তাই সে অতি সংক্ষেপে দৃঢ়ভাবে তাহার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করিয়া বলিয়া গেল—'এ শরীরে আর না।'

মুহূর্তে প্রলয় হইয়া গেল। কামিনীর অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে; স্বামীর পৌরুষ ও ভালবাসা উভয়ের সন্ধানই সে পাইয়াছে। তাহার স্বামী 'জামাই-বারিক'-এর 'জাম্বুবান'ও নয়, 'গোঁয়ার'ও নয়, সে পুরুষ; পুরুষ বলিয়াই সে স্ত্রীর নিকট অপমানিত হইয়া নীরবে সহ্য করিল না, কামিনী তাহা বুঝিল। স্বামী যে তাহাকে ভালবাসিত, অল্প কথায় সে তাহাও জানাইয়া গেল। কামিনী বুঝিল, সে ভুল করিয়াছে, অনুতাপে তাহার চক্ষেও জল আসিল। দুঃখের জালা জ্বলিয়া উঠিতে না উঠিতেই দ্বিতীয় অপমানের পালা আসিল। অভয় নীরবে চলিয়া যায় নাই, যাইবার সময়ে কামিনীর পিতার নিকট তাহার গুণবতী কন্যার কীর্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছে,—শুনিয়া 'কর্তা মহাশয়' নিজের গালে নিজে চড় খাইয়াছেন। মনের দুঃখে কামিনী গৃহত্যাগ করিল। এই আকস্মিক প্রস্থান শেষ পর্যন্ত আমাদের সন্ত্রস্ত কৌতূহল জাগরিত রাখে। কামিনী কোথায় গেল? সত্য সত্যই তাহার মেজদিদির মতো আত্মহত্যা করিতে গেল কি?

চতুর্থ অঙ্কটি নাটকটির পরিণতি। পদ্মলোচন বগি-বিন্দির নির্যাতন হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বৃন্দাবনে আসিয়া বৈষ্ণব হইয়াছে। অভয় এবং পদ্মলোচন উভয়েই স্ত্রীর দৌরাত্ম্যে সংসার ত্যাগ করিয়া বৈরাগী সাজিয়াছে, কিন্তু এই বৈরাগ্য ভগবৎপ্রেমের আকর্ষণে নয়, তাই ফেলিয়া-

আসা সংসারের প্রতি মন বারে বারে ছুটিতেছে। এই অবস্থায় সম্প্রতি বৃন্দাবনে আগন্তুক মাধব বৈরাগীর কন্যাটির দিকে অভয়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে। শেষ পর্যন্ত মাধবের কন্যার সঙ্গে অভয়ের বিবাহ হইল। মাধব বৈরাগী—'ময়রা বুড়ো', আর তাহার কন্যাটি—'কামিনী'। বিবাহের ছলে কামিনী নিজের স্বামীকে ফিরিয়া পাইল।

অবশ্য চতুর্থ অঙ্কে নাট্যকারের শক্তিমত্তার পরিচয় বিশেষ কিছুই নাই, নাটকের পরিণতি অনেকটা উপকথার মতো শেষ হইয়াছে। ঘটনাসৃষ্টির পরিবর্তে নাট্যকার এখানে কাহিনীর বিবৃতি দিয়াই সারিয়া দিয়াছেন। তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। পদ্মলোচন ও তাহার স্ত্রীদ্বয়ের কাহিনীটি তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত একটি বিচ্ছিন্ন গৌণ-কাহিনী-হিসাবে নাটকে চলিয়া আসিতেছিল, অভয়-কামিনীর জীবনের সঙ্গে বা জামাই-বারিকের প্রধান কাহিনীর সঙ্গে ইহার যোগাযোগ বিশেষ কিছুই ছিল না। বৃন্দাবনে আসিয়া উভয় কাহিনীর অনিবার্য মিলন হইয়াছে। সুতরাং কাহিনী-বিন্যাসে নাট্যকারের শক্তিমত্তার পরিচয় আছে।

দীনবন্ধুর এই নাটক-প্রহসনগুলির সম্বন্ধে একটি কথা আমাদের বিশেষ করিয়া মনে আসে। ইংরাজী বা সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ বা অনুকরণ করিতে গিয়া বিশেষ কোনো সাহিত্যিক মান প্রবর্তন করিবার জন্য দীনবন্ধু নাটক রচনা করেন নাই। বাঙালীর জীবন যেমন যেমন ঘটনা ও চরিত্র লইয়া দীনবন্ধুর দৃষ্টিতে ধরা দিয়াছিল, তিনি নাটক ও প্রহসনাকারে তাহাই সাজাইয়া তুলিয়াছেন। তাই দীনবন্ধুই বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম বাঙালীর নিজস্ব সার্থক নাট্যকার। মনোমোহন এবং গিরিশচন্দ্র সামাজিক নাটকে বাঙালীর এই নিজস্ব জীবনধারাকেই রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

[বুদ্ধিপ্রধান ব্যঙ্গমূলক প্রহসন-রচনায় মলিয়ারের অনুসরণ]

রামানারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধুর রচনায় যে যুগের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাকে বাংলা প্রহসন-সাহিত্যের আদিযুগ বা উন্মেষযুগ বলা যাইতে পারে। ইহাদের প্রভাব পরবর্তী কালের প্রহসন-সাহিত্যে যে পড়ে নাই, তাহা নহে। তবে পাশ্চাত্ত্য দেশীয় একজন মহাশক্তিমান্ নাট্যকারের রচনার প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে নূতন ধারার প্রহসন-কমেডী রচিত হইতে আরম্ভ করিল। ইনি ফরাসী নাট্যকার মলিয়ার (Jean Baptiste Poquelin de Molie're)।

মোটামুটি ভাবে মলিয়ারের গ্রন্থের অনুবাদ দিয়াই বাংলা প্রহসন-সাহিত্যের এই দ্বিতীয় যুগ বা মধ্যযুগের সূচনা হয়। কেহ কেহ মলিয়ারের অনুসরণে স্বাধীনভাবে নাটক রচনা করিয়াছেন, কেহ বা মলিয়ারের বিষয়বস্তুকে পৌনে-ষোল-আনা বজায় রাখিয়া তাঁহার নাটকের স্থান-কাল ও পাত্র-পাত্রীর নাম-ধাম পরিবর্তিত করিয়া উহাকে দেশোপযোগী করিয়া লইয়াছেন। সে যাহাই হউক, মলিয়ার যে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, একথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। হেরাসিম্ লেবেডেফ যখন বাংলা রঙ্গমঞ্চের ও অভিনয়ের সূচনা করেন, তখন তিনি 'Love is the Best Doctor' বইখানির অনুবাদ দিয়াই তাঁহার অভিনয়ের সূচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু এই গ্রন্থখানি মলিয়ারের L' Amour Mede'cin-এর অনুবাদ কিনা, তাহা জানা যায় না। তবে রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু যখন নাটক ও প্রহসন-রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেই সময়েই বাঙালী নাট্যকার মলিয়ারের অনুকরণ এবং অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের (যতীন্দ্রমোহন বসুর নামে প্রচলিত) 'বুঝলে কি না?' প্রহসন বাংলা ১২৭৩ সালে রচিত হয়। বাংলা ১২৮৮ সালে রাজকৃষ্ণ দত্ত মলিয়ারের 'Le Medicin Malgre Lui' 'The Mock Doctor'-অবলম্বনে তাঁহার 'যেমন রোগ তেমনি রোজা' প্রহসনখানি রচনা করেন। ইহাকে রচনা না বলিয়া আক্ষরিক অনুবাদ বলিলেই ভাল হয়। মলিয়ারের অনুসরণ করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামক প্রহসনখানি রচনা করেন ১৮৭২ খৃস্টাব্দে। তাঁহার দ্বিতীয় প্রহসন 'এমন কর্ম আর করব না'

বাংলা সাহিত্যে মলিয়ারের প্রভাব

(১৮৭৭ খৃঃ) পরবর্তী কালে 'অলীক বাবু' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁহার তৃতীয় মৌলিক প্রহসন 'হিতে বিপরীত' (১৮৯৬ খৃঃ)। মলিয়ারের 'লা বুর্জোয়া জাঁতিয়াম' এবং 'মারিয়াজ্ ফোর্সে'-অবলম্বনে তিনি যথাক্রমে 'হঠাৎ নবাব' এবং 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' নামক প্রহসন রচনা করেন।

এই প্রসঙ্গে আমরা একটি বিষয়ের আলোচনা করিব। শেক্স্পীয়ারের কমেডী এবং ইংরাজী সাহিত্যের 'Restoration comedy'-গুলি বাদ দিয়া বাঙালী নাট্যকার মলিয়ারের অনুসরণ এবং অনুকরণের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন কেন? ইহার অতি সহজ ও স্বাভাবিক উত্তর এই যে, মলিয়ারের রচনায় বাঙালী নাট্যকারগণ আপন যুগোচিত ধারণা-ভাবনা এবং তাহার প্রকাশের উপযুক্ত বাহনের সন্ধান পাইয়াছিলেন। মলিয়ারের রচনার উদ্দেশ্য এবং প্রকাশভঙ্গীর আলোচনা করিলেই আমরা তাহা বুঝিতে পারিব।

মলিয়ার মুখ্যতঃ ব্যঙ্গরসিক। তাঁহার ব্যঙ্গের উদ্দেশ্য কি? কাহাদের উপর তাঁহার ব্যঙ্গবাণ বর্ষিত হইয়াছে? তিনি কি ভাঙিতে চাহিয়াছেন, না গড়িয়াছেন? এই সকল প্রশ্নের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা মলিয়ারের নাট্য-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তাহা হইলে আমরা দেখিতে পাইব যে, বাংলা নাট্যসাহিত্যে মলিয়ারের অনুকরণ এবং অনুসরণ কতখানি প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

মলিয়ারের বৈশিষ্ট্য

মলিয়ার ছিলেন সবচেয়ে 'Anti-Romantic' বা অকারণ ভাবোচ্ছ্বাস-বিরোধী, নিছক 'বাস্তবধর্মী' নাট্যকার। সমাজ-জীবনের বা ব্যক্তি-জীবনের কোনো প্রকার উৎকেন্দ্রিকতা, অতিমাত্রিকতা বা অতিচারিতা তিনি সহ্য করেন নাই। সমাজের কল্যাণকর শাশ্বত রূপে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষ তাহার ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা, লোভ, কপটতা, বোকামি এবং দুরাশা প্রভৃতির বশবর্তী হইয়া সমাজের কল্যাণকর নীতি যখনই অতিক্রম করিতে চাহিয়াছে, তখনই তাহার আচরণ অশোভন, অসঙ্গত ও হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে। আবার, সমাজের বা ধর্মের নীতির নামে যাহারা জনগণকে প্রতারিত করিয়াছে, মলিয়ার তাহাদিগকেও ক্ষমা করেন নাই। মলিয়ার ব্যক্তি-জীবনে ও সমাজ-জীবনে স্বাধীনতার পূজারী, কিন্তু স্বাধীনতা-অর্থে স্বেচ্ছাচারিতা নয়। সমাজনীতির নামে যাহারা অজ্ঞ ও অন্ধ জনগণকে প্রতারণা করিয়াছে, মলিয়ার তাহাদিগের কদর্য-স্বরূপ মানুষের সম্মুখে উদ্ঘাটন করিয়াছেন। আবার, যে অযোগ্য ব্যক্তি প্রকৃত গুণে বড় না হইয়া অকারণ অসঙ্গত অন্ধ অনুকরণের

যারা ময়ূরপুচ্ছধারী কাক সাজিয়া প্রকৃত বড়ত্বকে ব্যঙ্গ করিয়াছে, মলিয়ার তাহাকে লইয়া বাঁদর-নাচ নাচাইয়াছেন। তিনি সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মের প্রকৃত ন্যায়-নীতিকে ব্যঙ্গ করেন নাই; ব্যঙ্গ করিয়াছেন উহার বিকৃতিকে।* মলিয়ারের রচনায় সমাজের ব্যাপক রূপ দেখিতে পাই। সামান্য কাঠুরিয়া হইতে রাজ-পুরোহিত পর্যন্ত তাঁহার রচনায় স্থান পাইয়াছে। রাজতন্ত্রের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও রচনার দিক্ দিয়া মলিয়ার ছিলেন গণতন্ত্রী। মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁহার রচনায় বেশী স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে।**

মলিয়ারের বিষয়বস্তুর জন্য তাঁহার রচনায় আঙ্গিকেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাইয়াছে। মলিয়ার তাঁহার পূর্ববর্তী গ্রীক ও রোমান নাট্যকার প্লটাস, টেরেন্স্ প্রভৃতির শৈলী যেমন গ্রহণ করিয়াছেন, তেমনি নিজস্ব সৃজনী প্রতিভার বলে উহার পরিবর্তন ও বিবর্ধনও করিয়াছেন অনেকখানি। ইংরেজী রেস্টোরেশান্ কমেডীর উপর মলিয়ারের প্রভাব পড়িয়াছিল কি পড়ে নাই—ইহা লইয়া সমালোচক-মহলে মতভেদ যথেষ্টই রহিয়াছে। তবুও একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, রেস্টোরেশান্ কমেডীর শৈলী হইতে মলিয়ারের রচনাশৈলীর ভিন্নতা রহিয়াছে। সেই ভিন্নতাটুকুর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিলে আমরা বুঝিতে পারিব বাঙালী নাট্যকারগণ জন্‌সন্, গোল্ডস্মিথ্, সেরিডান্ প্রভৃতিকে অনুসরণ না করিয়া কেন মলিয়ারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন।

কোন বিশেষ ব্যক্তির চরিত্রের অসঙ্গতিই শুধু মলিয়ারের নাটকের হাস্যরস উৎসারিত করে নাই, ঐ চরিত্রকে মলিয়ার বৃহত্তর সামাজিক

---

* Moliere is the supreme anti-romantic and all his work is a defence of the social order against the inroads of individualism. He ruthlessly tears down the meretricious veil which fools, hypocrites and romantics would interpose between man and reality of life··· Moliere talks to the plain man in the language which he undestands, the language of calm common sense......Freedom for him is not the right to sacrifice society to one's amour de soi, nor it is necessary......to "betray one's soul" in a blind subservience to the demands of the crowd. Freedom is for Moliere a very sacred thing...... He pointed out that the function of the comic author was not to satirise ideals, but the vicious distortion of ideals.

Introduction by Prof. F. C. Green to Moliere Comedies, translated by H. Baker and J. Miller, pp. xv-xvii.

** Despite the royal patronage accorded to Moliere, therefore, and despite the writing of several of his plays specially for the detectation of the court, the strength of this Classical French drama rests in its power to take into account all classes in the community.

—World Drama, A Nicoll, p. 335.

পটভূমিকায় স্থাপন করিয়া তাহাকে সমাজের প্রতিনিধি-হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাই মলিয়ারের সৃষ্ট চরিত্রগুলির আবেদন ব্যাপক। এই চরিত্রগুলি যে শুধু অসঙ্গতিজনিত হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা নহে, উহাদের সৃষ্ট হাস্য, জগৎ, জীবন ও সমাজ-সম্বন্ধে গুরু-গম্ভীর চিন্তার উদ্রেক করে।[১] অধ্যাপক নিকলের ভাষায় বলিতে গেলে, মলিয়ারের সৃষ্ট চরিত্রগুলি আমাদিগকে শুধু তরল হাস্যই পরিবেষণ করে নাই, বিপজ্জনক চরিত্র-সম্বন্ধে আমাদিগকে সাবধান করিয়াছে।* মলিয়ার শুধু রস-স্রষ্টা নহেন,—সমাজ, ধর্ম ও রাষ্ট্র-সংস্কারের গুরুদায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহার হাস্যরসাত্মক রচনায়। তিনি শুধু তাঁহার সময়কার সমাজের ব্যক্তি ও সমষ্টির চরিত্রের ভুলটুকু ধরাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, তিনি ব্যক্তি ও সমাজকে সংশোধন করিয়াছেন। তাই অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে মলিয়ারের নাটকে ঘটনার ঘনঘটা, চরিত্রের জটিলতা ও বৈচিত্র্য সংলাপের মুখরতায় ঢাকা পড়িয়াছে। নাট্যকারের বক্তব্যই চরিত্রগুলির মুখে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।[২] এই দিক্ দিয়া মলিয়ার ইব্‌সেন, অস্কার ওয়াইল্ড্ এবং বার্ণার্ড্ শ'র অগ্রদূত। অবশ্য ইহাদের সঙ্গে যুগগত, ভাবগত এবং তাহার ফলে শৈলীগত পার্থক্যও মলিয়ারের অনেকখানি আছে। মলিয়ার শ'এর মতো বুদ্ধি-সর্বস্ব না হইলেও, তিনিই প্রথম নাটকে সমাজ ও ব্যক্তির চরিত্রগত অসঙ্গতি, দুর্বলতা, কপটতা, স্বার্থপরতা ধরাইয়া দিয়া আধুনিক কালের বুদ্ধিসর্বস্ব সমস্যানাট্যের সূত্রপাত করেন। তাঁহার Man-hater (Le Misanthrope)-নাটকখানির মধ্যে যে শ'এর নাট্যশৈলীর পূর্বাভাস রহিয়াছে—একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। মলিয়ারের অন্যান্য রচনার মতো ইহা লঘুনাট্য নয়, ভাবে ও ভাষায় ইহা নিতান্ত গুরুগম্ভীর।

যখন সমাজে দুই বিপরীত ভাবধারার মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়, তখন একটি বিপত্তির বা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। একদল লোক থাকে যাহারা কিছুতেই সমাজের বিবর্তন বা পরিবর্তন মানিয়া লইতে পারে না, ঘুণে-ধরা, পচা, জীর্ণ, প্রাচীন পদ্ধতি, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ধারণা-ভাবনা তাহাদিগকে ভূতের মতো পাইয়া বসে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রাখিয়া তাহারা চলিতে পারে না। তাই তাহাদের আচরণে রাশিরাশি অসঙ্গতির সৃষ্টি হয়।

* In Tartuffe Moliere seeks to arouse laughter that he may warn his fellows of an insidious danger. —World Drama, A. Nicoll, p. 327.

ঐ অসঙ্গতি চরিত্রের দুর্বলতাপ্রসূত, তাই উহা ব্যঙ্গহাস্যের উদ্রেক করে। আবার, অত্যুৎসাহী অতিপ্রগতিবাদিগণও অন্ধ, তাহারা প্রাচীনতার সব-কিছুকে পরিহার্য আবর্জনা বলিয়া মনে করে। তাই ধীরস্থিরভাবে বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া তাহারা কোন কিছুকে গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারে না। তাহারা একটা ঝোঁক বা আবেগের বশে অন্ধ অনুকরণে তৎপর হয়, তাহাদের চরিত্রের অসঙ্গতিও তাই বিজ্ঞজনের হাসির উদ্রেক করে। অচলপ্রতিষ্ঠ প্রাচীনতা-প্রীতি এবং যুক্তিবিহীন উগ্র-আধুনিকতা—এই উভয়বিধ অতিচারিতাই তীব্র অসঙ্গতির পরিচায়ক। তাই দুই বিপরীতমুখী সভ্যতার সন্ধিক্ষণে কমেডী-প্রহসনের উৎপত্তি এবং উন্নতি হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক।

এই সন্ধিযুগে মানুষের কয়েকটি প্রবৃত্তির অপব্যবহারও হয়। শুধু সন্ধিযুগে নয়, উহা বোধ হয় সর্বযুগেই হইয়া থাকে। মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইল শ্রেষ্ঠদের অনুসরণ করা। আর, এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষ বিচারবুদ্ধির ধার বড় একটা ধারে না। তাহারা যাহাদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে, বিনা বিচারে, বিনা প্রমাণে তাহাদের অনুসরণ করিয়া চলে। প্রসঙ্গতঃ, শ্রীকৃষ্ণের একটি প্রসিদ্ধ উক্তি এখানে আমরা স্মরণ করি,—'স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।' আবার, সংস্কার যখন বহুদিনের আচরিত কুলক্রমাগত বিশ্বাসে পরিণত হয়, তখন তাহা সবচেয়ে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। চোখে আঙুল দিয়া স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়া দিলেও অনেক সময়ে মানুষ চিরাচরিত ধারণার বাহিরে যাইতে পারে না। বিশেষ করিয়া ধর্মনীতির ব্যাপারে এই অন্ধত্ব অতি প্রবল। ইহা শুধু সাধারণ অসঙ্গতি-জনিত হাস্যরস সৃষ্টি করে না, মানুষের চরিত্রের এই অন্ধ বিশ্বাসজনিত দুর্বলনের অসঙ্গতির সুযোগ লইয়া স্বার্থপর ধর্মধ্বজিগণ যখন নিজেদের কাম ও বিষয়-বাসনা চরিতার্থ করিয়া লয়, তখন আমরা আর হাসিতে পারি না, হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলি। যুগ-পরিবর্তনের মুহূর্তে তাই বক-ধার্মিকের দল সমাজের সরলবিশ্বাসী জনগণকে প্রতারণা করিয়া নিজেদের দুরভি-সন্ধি চরিতার্থ করে।

আর এক ধরনের দুর্বলতাও মানুষের সহজাত। ক্ষমতা, যোগ্যতা বা দক্ষতা নাই, অথচ বড়র অনুকরণ করিয়া নিজের গুরুত্ব জাহির করার বাসনা মানুষের অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত। এই স্বাভাবিক প্রেরণাবশে অতি সাধারণ ব্যক্তিও 'হঠাৎ নবাব' হইবার জন্য অসঙ্গত আচরণ করে। কিন্তু সবচেয়ে কৌতুকের বিষয় এই যে, ঐ ব্যক্তি যে পরিবেশের নিকট হইতে বাহবা পাইবার আশায়

ঐরূপ আচরণ করিয়া থাকে, সে পরিবেশ কিন্তু তাহাকে চেনে, তাই তাহারা উহাকে লইয়া ব্যঙ্গ করে। উহার দুর্বলতার সুযোগ লইয়া উহাকে শোষণ করে, প্রতারিত করে, কিন্তু নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যই উহাদের ভুল ভাঙায় না।

মলিয়ারের নাটকে আমরা এই সমস্ত ধরনের চরিত্রের সন্ধান পাই। সকল রকমের পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া তিনি সমাজের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন। গ্রাম্য নারী সহরে আসিয়া নাগরিকাদের অনুকরণে রোমাণ্টিক নায়িকা সাজিবার হাস্যকর প্রচেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু তাহার ফলে ইতরজনের দ্বারা প্রতারিত হইয়াছে। অতি সাধারণ নাগরিক জর্ডন। বীর এবং ভদ্র সমাজের মুখ সে কখনও দেখে নাই, নিজের যাহা কিছু অর্থ সে ব্যয় করিতেছে 'হঠাৎ নবাব' হইয়া উঠিবার জন্য। ফিলামিন্টা সাধারণ নারী, কিন্তু বিদুষী মহিলা সাজিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। বাড়ীর চাকরানীকে সে বিশুদ্ধ ভাষা শিখাইতে পারিতেছে না বলিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দিতেছে। সংসারের শান্তি যে তাহাতে একেবারে নষ্ট হইতেছে, সেদিকে তাহার এতটুকুও দৃষ্টি নাই। এই শিক্ষাভিমানিনীরা আর যাহা কিছুই হউন, সুগৃহিণী নহেন; স্বামি-পুত্র-পরিজনকে খুশী করিয়া সুখের সংসার বাঁধিয়া চলার নীতি ইঁহারা অনেক দিন হইল ত্যাগ করিয়াছেন। অন্তঃপুরিকার নিভৃত পবিত্র কক্ষকে ইঁহারা আড্ডাখানায় পরিণত করিয়াছেন। হাস্যরসিক, বুদ্ধিমান এবং পণ্ডিত বলিয়া ইঁহারা যাহাদিগকে গৃহমধ্যে বরণ করিয়াছেন, তাহারা মূর্খ ভাঁড় ভিন্ন কিছুই নয়। কবি-নামধেয় একটি অপদার্থকে ফিলামিন্টা আবিষ্কার করিয়াছে, কিন্তু এই অন্ধত্ব চরিত্রের মর্মমূলে এমনই বাসা বাঁধিয়াছে যে মূর্খ ভাঁড় ট্রিসোমিনের নিকট ফিলামিন্টা তাহার গুণবতী কন্যাকে বিবাহ দিবার সংকল্প করিয়াছে। কৌতুকের বিষয় এই যে ফিলামিন্টার এই অসঙ্গত আচরণের জন্য তাহার স্বামীর দুর্বলতাজনিত নীরব সমর্থনই দায়ী। আধুনিকতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার বন্যা আসিয়া ব্যক্তি, দম্পতী ও পরিবারের জীবনে কেমন ভাঙন ধরাইতেছে, মলিয়ার তাহা দেখাইয়াছেন। মাইকেল মধুসূদনের যুগ-জিজ্ঞাসা যেন অনেক আগে মলিয়ারের মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল,—'একেই কি বলে সভ্যতা?' কপট সাধু প্রতারক টার্‌টুফ্, মহাপ্রভু যীশু খৃস্টের নামে সে নিজের কুপ্রবৃত্তিগুলির পোষকতা করিয়া লইতেছে। মুখে তাহার বাইবেলের বাণী, বাহিরের আচরণে তাহার সন্তদের অনুসরণ, কিন্তু অন্তরে অন্তরে সে শয়তানের মূর্ত বিগ্রহ। সরল ধর্মবিশ্বাস মানুষকে

এত অন্ধ করে যে, এই ধর্মধ্বজীদের কপট বাক্যেই সে বিশ্বাস স্থাপন করে, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী প্রভৃতি আপন জন বিপরীত সাক্ষ্য-প্রমাণ দিলেও তাহাদের চেতনা হয় না। অরগন্ ঠিক এমনি একটি সরলবিশ্বাসী লোক। পুত্র ডেমিস্ পিতার নিকট অভিযোগ করিতেছে যে, অর্‌গনের চক্ষে যে দেবতা সেই টার্‌টুফ্‌ই তাহার মাতায় অর্থাৎ অর্‌গনের স্ত্রীর নিকট অশোভন প্রস্তাব করিয়াছে। স্ত্রীও শেষপর্যন্ত পুত্রের সমর্থন করিল, কিন্তু টার্‌টুফের একখানি কপট উক্তিতে স্ত্রী ও পুত্রের অভিযোগ কোথায় ভাসিয়া গেল! অর্‌গন্ মনে করিল, একজন সদাশয় ব্যক্তিকে কলঙ্কিত করিবার জন্য ইহা তাহার স্ত্রী-পুত্রের জঘন্য ষড়্‌যন্ত্র। মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও ভক্তি কোথায় গিয়া পৌছিতে পারে! অর্‌গন্ মনস্থ করিল, এই টার্‌টুফের সহিত তাহার কন্যা মেরিয়ানার বিবাহ দিবেই, বরং তাহার বাড়ীঘর বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই এই মহাপুরুষকে দান করিয়া সে ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা পূর্ণ করিবে। মলিয়ার শুধু মানবচরিত্রের এই মর্মগত অসঙ্গতির চিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া হিউমারের হাসি সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ধর্মধ্বজীদের প্রতারণার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছেন। অর্‌গনের মূর্খতা এবং অন্ধত্বের চরম শাস্তি তাহার বিষয়-সম্পত্তি এবং ঘরবাড়ী এই প্রতারকের হস্তগত হওয়ায় নয়, প্রকৃতি তাহার প্রতি অপূর্ব প্রতিশোধ লইয়াছে। যে অর্‌গন্ অন্ধত্ববলে নিজের স্ত্রী-পুত্রের কথা বিশ্বাস করিতে পারে নাই, নিজের চোখে সে যখন তাহার স্ত্রীর প্রতি টার্‌টুফের অন্ধ আসক্তিজনিত অন্যায় আচরণের উদ্যোগ দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল, নিজের মাকে কিন্তু সে তখন নিজের চোখে দেখা এই ঘটনাটি বিশ্বাস করাইতে পারিল না। সামাজিক সংস্কারের যে অন্ধ শক্তি অর্‌গনের বিভ্রান্তি ঘটাইয়াছিল, তাহার মায়ের উপর সেই একই শক্তির প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। ইহা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুরতিক্রম্য, অনভিভব্য। সুতরাং মলিয়ার শুধু মানবাচরণের বাহিরের অসঙ্গতি লইয়া ব্যঙ্গ করেন নাই, তাঁহার রচনা comedy of manners নয়,—comedy of character। মানব-চরিত্রের অন্ধকার গিরিগহ্বরে মলিয়ারের দীপ্ত চক্ষুর সন্ধানী দৃষ্টি প্রবেশ করিয়াছে। তাই মলিয়ারের নাটক আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক নাটকের অগ্রদূত। তাঁহার নাটকে অসঙ্গতি চরিত্রের বাহির হইতে আরোপিত নয়, অর্থাৎ আচরণের কতকগুলি অসঙ্গতি বা উৎকেন্দ্রিকতা দেখাইবার জন্য কল্পনার আশ্রয়ে উহা পাত্রপাত্রীর উপর বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া

হয় নাই, চরিত্রের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি-হিসাবে ঐ অসঙ্গতি তাহাদের আচরণে, ধারণা-ভাবনায় আপনা হইতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতিসঞ্জাত বনফুলের মতো উহারা স্বাভাবিক বিকাশমাত্র। মলিয়ারের সৃষ্টি তাই কল্পনাসমৃদ্ধ রোমান্টিক নাটক নয়, উহা বাস্তবতায় সমুজ্জ্বল জীবন-নাট্য।

উপরিলিখিত আলোচনা হইতে আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারিব, বাংলা প্রহসন-কমেডীতে মলিয়ারের অনুসরণ কেন চলিল। এক কথায় বলা যায়, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে মলিয়ারের অনুসরণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িয়াছিল।

বাংলাসাহিত্যের আদি যুগের নাট্যকার রামনারায়ণের 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' নাটক-রচনার মূলেও প্রচ্ছন্নভাবে মলিয়ারীয় দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, যদিও পণ্ডিত মহাশয় মলিয়ারের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না বলিয়া আমরা ধরিয়া লইব। রামনারায়ণ সংস্কৃত প্রহসনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। সংস্কৃত প্রহসনের যে আলোচনা আমরা করিয়াছি, তাহা হইতে আমরা সহজে এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারিব যে মলিয়ার যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া ব্যক্তি ও সমাজকে দেখিয়াছেন, সংস্কৃত প্রহসনেও সেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আছে। সংস্কৃত প্রহসনগুলি প্রায়শঃ প্রহসনের সীমা অতিক্রম করিয়া কমেডীতে উন্নীত হয় নাই। আর মলিয়ারের রচনা শুধু প্রহসন হয় নাই, কমেডী হইয়াছে। তাই বাংলা প্রহসন-কমেডীতে সংস্কৃতের অনুসরণ না হইয়া মলিয়ারের অনুসরণ চলিল। ইহার একটি কারণ এই যে সংস্কৃত সাহিত্যের যে কয়খানি শ্রেষ্ঠ প্রহসনের সন্ধান আমরা আজ পাইতেছি, উনবিংশ শতকের বাংলা নাটক-প্রহসন-রচনার আদি ও মধ্যযুগে বাঙালী সমাজে ঐ প্রহসনগুলির পরিচয় ছিল না। থাকিলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অন্ততঃ তাহার অনুবাদ করিতেন। ইহা ছাড়া আর একটি বড় কারণ আছে—সংস্কৃত প্রহসনগুলির সহিত তৎকালীন বাঙালী নাট্যকারগণের পরিচয় থাকিলেও তাঁহারা মলিয়ারের অনুসরণই করিতেন। সংস্কৃত প্রহসনগুলি শিল্পসৃষ্টি-হিসাবে যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ঐগুলির মধ্যে ভারতীয় সমাজজীবনের ব্যাপকতর রূপের সন্ধান আমরা পাই না। সমাজের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ লইয়াই সংস্কৃত প্রহসন-গুলির উৎপত্তি। ব্যভিচার, পানদোষ, ধর্মীয় রীতিনীতির বিকৃতি ইত্যাদিই সংস্কৃত প্রহসনে হাস্যরস যোগাইয়াছে। হয়তো তৎকালীন ভারতীয় জীবনে ঐগুলিই প্রধান বা অনুপেক্ষণীয় সমস্যারূপে দেখা দিয়াছিল, তাই সে

যুগের ভারতীয় সাহিত্যে উহা লইয়া প্রহসন রচিত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক এবং ল্যাটিন সাহিত্যেও প্রহসনের বিষয়-বৈচিত্র্য বিশেষ কিছুই ছিল না। তাই প্রায়ই যমজ ভ্রাতাদের চিনিতে ভুল, চাকর-বিপর্যয়, বৃদ্ধ পিতার নির্বুদ্ধিতা এবং তরুণী কন্যার প্রেমপ্রসঙ্গ প্রভৃতি লইয়া গ্রীক ও রোমান প্রহসন রচিত হইত। অবশ্য এরিস্টোফিনিস্ তাঁহার কমেডীতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তৎকালীন সমাজ ও মলিয়ারের সমাজ এক ছিল না, থাকিবার কথাও নয়। যুগ-পরিবর্তনের ফলে সামাজিক বিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু মলিয়ারের সম্মুখে যে সকল সামাজিক, ধর্মনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় সমস্যা দেখা দিয়াছিল, ঊনবিংশ শতকের বাঙালী নাট্যকারের সম্মুখেও উপস্থিত হইয়াছিল ঐ একই রকম সমস্যা।

বাংলার মুসলমান রাজত্ব রাজনৈতিক ঘূর্ণিবায়ু সৃষ্টি করিয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু হিন্দুর সমাজ ও ধর্মজীবনে যুগান্তকারী বিপ্লব সৃষ্টি করিতে পারে নাই। সাধারণের জীবনযাত্রার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঐস্লামিক ধর্মবিশ্বাস এবং আচার-আচরণ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ভিতর ও বাহির হইতে হিন্দু-জীবনকে পরিবর্তিত করিয়া তুলিতে পারে নাই। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের ইংরাজী সভ্যতা বাংলার, তথা ভারতীয় সমাজজীবন ও রীতিনীতি ধর্মবোধের মর্মমূল আলোড়িত করিয়া তুলিল। বাঙালী নিজের চিরাচরিত সংস্কারগুলি যেমন প্রাণপণে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিল না, তেমনি ত্যাগ করিতেও পারে নাই। একদিকে নবাগত ইংরেজী সভ্যতার ফেনিল উন্মাদনায় একদল তরুণ উৎকেন্দ্রী হইয়া ভাসিয়া গেল, অন্যদিকে প্রাচীন রক্ষণশীলের দল যুগোচিত দর্শন-বিজ্ঞানের ভাবধারায় নিজেদের প্রাচীন রীতিনীতি-সংস্কারাদির সমর্থন করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্মকে বিদেশীয় খৃস্টীয়ধর্ম ও নীতিবোধের ভারতীয় সংস্করণ বলিলে খুব বেশি অন্যায় হইবে বলিয়া আমি মনে করি না। মহামতি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-প্রচলনের প্রচেষ্টা এই নবজাগ্রত যুগধর্মেরই ফল। একদিকে সমাজের অকল্যাণকর দুষ্টপ্রথাগুলির বিসর্জনের মধ্য দিয়া এবং নবাগত সভ্যতার মঙ্গলপ্রদ দান গ্রহণ করিয়া বাঙালী নিজের ধারণা-ভাবনা ও জীবন-চলনাকে যুগোপযোগী করিয়া লইতেছিল, অন্যদিকে ইহার বিপরীত প্রচেষ্টাও দেখা দিয়াছিল। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণির বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম-বিশ্লেষণ এই প্রতিক্রিয়ারই রূপ। এই দুই অতিবিপরীত মেরুযাত্রীদের

বাংলা প্রহসন
উৎপত্তির মূলে
যুগপ্রভাব

আচার-আচরণে, ধারণা-ভাবনায়, বাক্যে ও কর্মে অতিমাত্রিকতা এবং অসঙ্গতি স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই অসঙ্গতি-অবলম্বনে শ্রেষ্ঠ প্রহসন-সাহিত্য অবশ্যই গড়িয়া উঠিতে পারিত। রামনারায়ণ-মধুসূদন-দীনবন্ধু তাহার সূচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা মলিয়ারকে অনুসরণ না করিয়াও যুগের প্রেরণাবশে মলিয়ারের সহধর্মিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু মধু-দীনবন্ধুর মধ্যে প্রহসন-রচনার যে উৎকৃষ্ট ক্ষমতার প্রকাশ আমরা দেখিলাম, উৎকৃষ্ট উত্তরসাধকের অভাবে সেই ক্ষমতা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিল না। পরবর্তী কালে যাঁহারা প্রহসন রচনা করিলেন, মধু-দীনবন্ধুর মতো অকৃত্রিম সমবেদনা ও সমাজচেতনা তাঁহাদের মধ্যে দেখা গেল না। তাই মধু-দীনবন্ধুর উত্তরাধিকারী তাঁহারা যেমন হইতে পারিলেন না, তেমনি মলিয়ারকেও সার্থক অনুসরণ তাঁহারা করিতে পারিলেন না। মলিয়ারের মধ্যে সমাজচেতনা, জীবনবোধ, মনস্তত্ত্বজ্ঞান, সংস্কারকের মনোবৃত্তি এবং নাট্যকারের সৃজনী প্রতিভার সার্থক সমাবেশ হইয়াছিল। বাঙালী নাট্যকারগণ এই ফরাসী যুগস্রষ্টা নাট্যকারের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে মলিয়ারের নিকট ঋণী এবং মলিয়ারকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন নাই।

বাংলা সাহিত্যে প্রহসন-রচনার উপযোগী যুগ ও পরিবেশের সৃষ্টি হইলেও যে বাঙালী এই যুগে উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা করিতে পারিল না, তাহার কারণ অনেক। শুধু যে উৎকৃষ্ট নাট্য-প্রতিভার অভাব ছিল, অর্থাৎ শক্তিমান্ নাট্যকারের আবির্ভাব বাংলায় হইল না, তাহাই নয়, প্রহসনকার বা কমেডী-রচয়িতার যে নির্লিপ্ততা থাকা প্রয়োজন, ইঁহাদের অনেকের মধ্যেই তাহা ছিল না। তাই জগৎ এবং জীবন থেকে নিজেকে একপার্শ্বে সরাইয়া লইয়া ইঁহারা কৌতূহলী দ্রষ্টার আসনে উপবেশন করেন নাই—নিজের রচনায় মধ্যকার জীবন-সমস্যায় আপনাদিগকে পূর্ণভাবে লিপ্ত করিয়া ইঁহারা উগ্র সংস্কারক সাজিয়াছেন। তাই ইঁহাদের রচনায় লেখকের আত্মপ্রকাশ শিল্পসৃষ্টি ব্যর্থ করিয়াছে। ইঁহারা হাসিতে গিয়া রাগিয়া উঠিয়াছেন, রাগিবার ফলে গালাগালি করিয়াছেন; তাই ইঁহাদের রচনা প্রায়ই সামাজিক নক্শা, ব্যঙ্গচিত্র বা 'কেরিকেচার' হইয়াছে, সত্যকারের প্রহসন কমেডী হইয়া উঠে নাই; অথচ এই যুগে নাটক-প্রহসন নামধেয় রচনায় বাংলা সাহিত্য ভরিয়া গিয়াছিল। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ করিলেই এ-বিষয়ে বিস্তৃতভাবে জানা যাইবে।

বাংলায় উৎকৃষ্ট প্রহসন রচিত না হওয়ার কারণ

যাক্। মলিয়ারের কয়েকখানি রচনার অনুবাদ বা প্রায়ানুবাদ বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম যুগে যাহা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মৌলিকতা কিছুই নাই বলিয়া সেগুলির আলোচনা করিব না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মলিয়ারের অনুসরণে বাংলা সাহিত্যে প্রথম মৌলিক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ঐগুলির আলোচনা অবশ্যই করণীয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনগুলির আলোচনা করিতে গিয়া ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অনেক কথা বলিয়াছেন।* ডাক্তার ভট্টাচার্যের মতে মধু-দীনবন্ধুর অনুসরণ করিয়াও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহাদের সমাজচৈতন্যের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন নাই। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনের নরনারীগণ সমাজের বাস্তব চিত্র বা জীবন্ত মানুষ নহে। নাট্যকারের অভিচারী কল্পনা কতকগুলি অবাস্তব জীব সৃষ্টি করিয়াছে। তাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনায় স্বাভাবিকতাও খুঁজিয়া পাওয়া কষ্ট।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসন-সাহিত্য

অবশ্য নাটকে যে সবসময়ে হুবহু বাস্তব জীবনের রূপ দিতে হইবে, তাহা নয়। নাট্যকারের কল্পনা অনেক সময়ে রূপকথার রাজ্য হইতে অতিসুন্দর নাটকীয় উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে। শেক্‌সপীয়ারের 'নিদাঘ-নিশীথ স্বপ্ন', 'ঝটিকা' প্রভৃতি নাটক তাহার উদাহরণ। একেবারে হুবহু বর্তমান বাস্তব সমাজ হইতে উপকরণ সংগ্রহ না করিলে নাট্যকার অপাঙ্‌ক্তেয় হন না। তাহা হইলে শেক্‌স্‌পীয়ার আদৌ নাট্যকার বলিয়া পরিচিত হইতেন না। তবুও জ্যোতিরিন্দ্র-নাথকে দোষ দেওয়া কেন? এ কথার উত্তর এই যে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বর্তমানের প্রত্যক্ষ বাস্তব সমাজের নরনারীদের লইয়া যখন প্রহসন রচনা করিয়াছেন, তখন তাঁহার রচনায় এই বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র মিলিবে না কেন?

একেবারে যে মিলিতেছে না, তাহা নয়। মলিয়ারের 'The Romantic Ladies', 'The Learned Ladies' প্রভৃতি নাটকে তৎকালীন সমাজের নারীদের উগ্র আধুনিকতার নিন্দা বা ব্যঙ্গের চিত্র পাওয়া যায়। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের প্রথম মৌলিক নাটক 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'এর মধ্যেও নাট্যকার তেমনি ঊনবিংশ শতকের নারীপ্রগতি, মদ্যপান ও ব্রাহ্ম সমাজের আচরণের নিন্দা করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজের নারীপ্রগতির মধ্যে কামের গোপন পদসঞ্চার ছিল বলিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভিন্ন আরও অনেকেই অনুমান করিয়াছেন। ব্রাহ্ম সমাজের অতি আধুনিক আচরণ এবং প্রাচীন রীতিনীতির উপেক্ষা

* বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস, মধ্যযুগ, ২য় অধ্যায়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যে কোন কোন ক্ষেত্রে সঙ্গতির সীমা অতিক্রম করিতেছিল, নাট্যকার মনোমোহন বসুর দৃষ্টিতেও তাহা ধরা পড়িয়াছিল। 'কেঁড়েলচন্দ্র ঢাকেন্দ্র'-প্রণীত 'নাগাশ্রমের অভিনয়' মনোমোহনের অকারণ গাত্রদাহের পরিচয় নয়। বাংলার পল্লীসমাজ অর্থাৎ বৃহত্তর বঙ্গের গণ-জীবনের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিচয় না থাকিলেও তাঁহার 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'-এর নরনারীগুলি যে উনবিংশ শতকের বঙ্গরাজধানীর বাস্তব নরনারী একথা কি করিয়া অস্বীকার করিব? আর তৎকালীন ব্রাহ্মপ্রগতির মধ্যে যে কিছুটা বাড়াবাড়ি ছিল না, এমনও নয়। কলিকাতার সেই শিক্ষিত সমাজের এক ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর জীবনকথা যদি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে, তবে তাহাকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমাজদৃষ্টি বা সমাজ-জ্ঞানের অভাব ব'লব না। অভাব জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শিল্প-প্রতিভার। যে প্রতিভা থাকিলে জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাকেও সৌন্দর্যে মহীয়ান্ করিয়া তোলা যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তাহা ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীকবাবু' নাটকের 'অলীক' এবং প্রমথনাথ বিশীর 'ঘৃতং পিবেৎ' নাটকের 'বিজয়নারায়ণ' একজাতীয় চরিত্র। 'অলীক' চরিত্রস্রষ্টার অক্ষমতার পরিচায়ক, কিন্তু 'বিজয়নারায়ণ'-চরিত্র লেখকের সৃজন-ক্ষমতায় অপূর্ব ভাবে সম্ভাব্য বাস্তবতায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনায় যেখানে যেখানে অতিরঞ্জনের ফাঁকে ফাঁকে এই সম্ভাব্য বাস্তবতা রক্ষিত হইয়াছে, বাস্তবতা ও কল্পনার সেখানে অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছে, কিন্তু যেখানে যেখানে সমস্যা ও চরিত্র এই সামঞ্জস্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে, সেই সেই স্থানে নাট্যকারের দুর্বলতা ধরা পড়িয়াছে।

আলোচনার মধ্য দিয়া আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিব। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' প্রহসনখানির আলোচনাই আমরা প্রথমে করিব। আলোচনার গোড়াতেই আমরা 'কমেডী' ও 'প্রহসনের' প্রধান পার্থক্যের কথা মনে রাখিয়া অগ্রসর হইব। প্রহসন কমেডী নহে, হাসাইয়া তোলা প্রহসন এবং কমেডী উভয়েরই উদ্দেশ্য, কিন্তু প্রহসনের হাসি নিতান্ত হালকা, জীবনের গভীরে উহা প্রবেশ করে না, অর্থাৎ কোন গভীরতম জীবনসমস্যা লইয়া উহা মাথা ঘামাইয়া ব্যাকুল হয় না। সমাজ-জীবনের বা ব্যক্তি-চরিত্রের যে অসঙ্গতি মারাত্মক অপরাধ নয়, অথচ নির্বুদ্ধিতা বা অতিমাত্রিকতার পরিচায়ক, প্রহসন তাহা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়া আমোদ অনুভব করে। ইহার মধ্যে পরিহাসের খোঁচা থাকিলেও তাহা বেদনার ক্ষত সৃষ্টি করে না। কিন্তু কমেডীর জীবন-জিজ্ঞাসা এইটুকু নয়। কমেডী চায় হাসির আঘাতে ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনের দোষত্রুটিগুলি

দূরীভূত করিয়া সমাজকে সুস্থ, স্বস্থ, আনন্দিত ও প্রাণবান্ করিতে। তাই কমেডীর হাসি গুরুগম্ভীর, উহার কাহিনীতে চরিত্রের পরিণামমুখী বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। প্রহসন কতকগুলি কৌতুককর পরিস্থিতির মধ্যে পাত্রপাত্রীকে উপস্থাপিত করিয়া তাহাদের বাক্যে ও কার্যে পরিস্থিতিকে হাস্যমুখর করিয়া তোলে। চরিত্রগুলি হয়তো যেখানে যেভাবে ছিল, ঠিক সেইখানে সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকে।

মলিয়ারের রচনাগুলিকেও আমরা এমনিভাবে প্রহসন ও কমেডী এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। তাঁহার 'The Impostor', 'The Cit Turned Gentleman' প্রভৃতি কমেডী, কিন্তু 'The Mock Doctor', 'Love 's the Best Doctor' প্রভৃতি একান্তভাবে প্রহসন। চরিত্রসৃষ্টি বা সমাজ-জিজ্ঞাসা এখানে বড় কথা নহে, ব্যক্তি-জীবনের অসঙ্গতি, খাম-খেয়াল প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া ঐগুলির মধ্যে হাস্যরস সৃষ্টি করা হইয়াছে মাত্র।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'ও প্রহসন,—কমেডী নহে। ইহার পটভূমিকায় যদিও রহিয়াছে সমাজের অতি গুরুতর যুগসমস্যা, তবুও নাট্যকার সেই সমস্যাকে বড় করিয়া দেখেন নাই। উহার উল্লেখ মাত্র করিয়া তিনি কয়েকটি চরিত্রের সৃষ্ট অসঙ্গত পরিস্থিতির উপরই জোর দিয়াছেন। যাহা লইয়া উৎকৃষ্ট কমেডী, এমন কি ট্র্যাজেডী, রচিত হইতে পারিত, নাট্যকার তাহা লইয়া লঘুহাস্য প্রহসন রচনা করিলেন কেন, এ-জিজ্ঞাসা অবান্তর। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা কতখানি সার্থক হইল, তাহাই আমাদের আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

কিঞ্চিৎ জলযোগ

'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নাটকের মধ্যে খানিকটা ব্যঙ্গ আছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। যদিও প্রহসনের শেষের জলখাবারের প্রসঙ্গ হইতে প্রহসনখানির নামকরণ হইয়াছে, তবু 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' অর্থে কিছুটা শিক্ষা-দান অর্থও বুঝা যাইতে পারে। এ-শিক্ষা পূর্ণবাবু ও তাঁহার স্ত্রী উভয়ের, পেরুরামও কিছু উত্তমমধ্যম পাইয়াছে। যাক্। নাম-সমস্যা লইয়া আমরা খুব বেশী মাথা ঘামাইব না, কারণ নামটা এই প্রহসনে প্রধান নয়।

প্রহসনের আরম্ভে চাকর ভোলার উক্তির মধ্য দিয়া আমরা পূর্ণবাবুর সংসারের চিত্রটি পরিস্ফুট দেখিতে পাই। স্বামি-স্ত্রী দুইজনেই ঘরকে বাহির এবং বাহিরকে ঘর করিয়া লইয়াছে। বৃদ্ধ চাকর ভোলা, একা একা ঘর আগ্‌লাইতেছে, ইহাদের আচরণে সে মনে মনে বিরক্ত। পূর্ণবাবুর উপর তাহার স্ত্রীর আধিপত্য অবাধে বিস্তৃত হইয়াছে। ভোলার উক্তি 'গিন্নিডি

যান রায়বাঘিনী হয়েছেন; কর্তাকে ওঠ বল্লে উঠেন, বোস বল্লে বসেন।' ভোলা সময় কাটাবার জন্য মহাভারত পড়িবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু অন্তরস্থিত বিরক্তির জন্য তাহাও ভাল লাগিতেছে না। সে বই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল, দোষ হইল কাশীরাম দাসের লেখার। কাশীদাসের বিচারক হইল ভোলা চাকর। ভোলা মনিব ও মনিব-পত্নীর ব্যাপারে এতই বিরক্ত হইয়া রহিয়াছে যে, পালকি আসার শব্দ শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহাকে যখন ডাকিবে, তখন সে সাড়া দিবে, আগে না।

পূর্ণবাবুর পরিবারে যে একটা অশান্তি চলিতেছে এবং তাহা যে স্বামি-স্ত্রীর আচরণের জন্য, ইহা বেশ বুঝা গেল। ভোলার চরিত্রে, সংলাপে রামনারায়ণের 'কুলীনকুলসর্বস্ব'এর ভোলা-চাকরের প্রভাব সুস্পষ্ট। ভোলার এই অনুযোগ এবং বিরক্তি কিন্তু মনিবের প্রতি প্রচ্ছন্ন ভালবাসারই নামান্তর, সে পূর্ণবাবুর কল্যাণ কামনা করে বলিয়াই বিরক্ত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সামান্য কথায় ভোলার চরিত্র অতি সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

'কিঞ্চিৎ জলযোগ'-এ 'কুলীনকুলসর্বস্ব'-এর প্রভাব

ভোলা চলিয়া গেলে পেরুরাম ধীরে ধীরে দ্বারের নিকট আগমন করিল এবং ঘরের মধ্যে অনেক লোক আছে মনে করিয়া বলিতে যাইতেছিল যে, সে পথ ভুলিয়া এই বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কাহাকেও না-দেখিয়া সে স্বগতোক্তির মাধ্যমে কেমন করিয়া সে বিধুমুখীর পাল্‌কিতে আরোহণ করিয়া এই বাড়ীতে আসিয়াছে, তাহা বলিল। এই প্রসঙ্গে গণৎকার ঠাকুরের দৈববাণীর কথাও সে মনে করিল। এই স্বগতোক্তির কর্মহীন বিবৃতির মধ্যে নাট্যগুণ বিশেষ কিছুই নাই। নাট্যকার ইহার অনেক কথা মুখে না-বলিয়া কার্যে ঘটাইতে পারিতেন। পাওনাদার পেরুরামকে তাড়া করিলে সে ভয়ে ভয়ে কি করিয়া মীরজাপুরের সেনের গির্জার সামনে পড়িয়া থাকা বিধুমুখীর পাল্‌কির মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কেমন করিয়া উড়িয়া বেহারাগণ তাহাকে বিধুমুখী মনে করিয়া সোজা এই বাড়ীর দরজায় বহিয়া লইয়া আসিল, তাহা গোড়াতেই একটি দৃশ্য রচনা করিয়া নাট্যকার প্রকৃত ঘটনা ও কর্মের মধ্য দিয়া দেখাইতে পারিতেন।

মৃচ্ছকটিক নাটকে প্রবহণ-বিপর্যয়ে ঘটনার উলট-পালট হইয়াছে, কিন্তু সেখানে কর্মহীন বিবৃতি স্থানলাভ করে নাই। বরং শর্বিলকের সিঁদ কাটার ব্যাপারে স্বগতোক্তি বিবৃতির আকার ধারণ করিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাটকের সেই ধরনের বিবৃতিমূলক স্বগতোক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পেরুরামের এই

সংস্কৃত নাটকের স্বগতোক্তির প্রভাব

স্বগতোক্তিটি রচনা করিয়াছেন। স্বগতোক্তির এই কর্মহীন দীর্ঘ বিবৃতি অনাটকীয়, অন্যদিক্ দিয়া নাটকেও এই উক্তিটির প্রয়োজন নাই। কি করিয়া কেন পেরুরাম এখানে প্রবেশ করিল, তাহা সে পরে বিশেষভাবে বর্ণনা করিয়াছে। আর সে বর্ণনা বিবৃতি নয়, ঘটনার মাধ্যমে চরিত্রেরই বিকাশরূপে সে-বর্ণনা নাটকে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং নাটকের আরম্ভে এই স্বগতোক্তিখানি শৈলীর দিক্ দিয়া অপ্রয়োজনীয়। তারপর আর একটি চরম অসঙ্গতি নাট্যকার এই প্রসঙ্গে সৃষ্টি করিয়াছেন। যে লোকটি ভয়ে ভয়ে চোরের মতো রাত্রিবেলা অন্যের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছে, সে কোথায় চুপে চুপে পলাইবার পথ খুঁজিবে, না আপনমনে একখানা গান গাহিবে? তাহার গান শুনিয়া বাড়ীর লোক যদি ছুটিয়া না আসে, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে স্বগতোক্তির মতো গানখানিও স্বগত-সঙ্গীত। স্বগতোক্তি যেমন দর্শক শোনে কিন্তু নাটকের উপস্থিত অন্যান্য পাত্রপাত্রী শোনেন না, তেমনি গানটিও ধরা গেল যে দর্শকদের শোনার জন্য, কুশীলবগণের শোনার জন্য নয়। কিন্তু এমন ভীতিবিহ্বল ব্যস্ততা এবং পলায়মানতার মুহূর্তে হাস্যরসাত্মক প্রেমের গান সম্ভবপর হয় কি করিয়া? জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপর ইহা বাংলা যাত্রার প্রভাব,—সংস্কৃতেরও নয়, মলিয়ারেরও নয়।

যাত্রার প্রভাব

যাহা হউক, বাহিরে প্রহৃত উড়িয়া বেহারাদের ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া পেরুরাম ভয়ে ভয়ে পলাইবার পথ খুঁজিবার জন্য অন্যত্র প্রস্থান করিল। তারপরই পূর্ণ ডাক্তার ও তাহার স্ত্রী বিধুমুখী ঘোষ কক্ষে প্রবেশ করিল। বিধুমুখী ও পূর্ণডাক্তারের সংলাপের ভাষা লক্ষ্য করিবার মতো। বিধুমুখী উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিকা শিক্ষিতা বঙ্গনারী। ব্রাহ্ম সমাজে যাইতে যাইতে তাহার ভাষাও সমাজের বক্তৃতার ভাষায় পরিণত হইয়াছে। তাহার সংলাপ মলিয়ারের 'The Learned Ladies'-নাটকের ফিলামিন্টা ও তাহার ভগিনীর বাক্যাবলি স্মরণ করাইয়া দেয়। মলিয়ারের মতো জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখানে ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি মুদ্রাদোষ বা 'mannerism'-এর সমালোচনা করিতেছেন। বিধুমুখীর উক্তি,—"ব্যাটারা এরূপ ঘোর পাপপঙ্কে নিমগ্ন, সংসারের ঘন মোহে আচ্ছন্ন, হৃদয় এরূপ শুষ্ক ও পাপ-তাপে অসাড় হইয়া গ্যাছে যে, মদমত্ত হয়ে আমাকে না নিয়েই স্বচ্ছন্দে পাল্‌কিটা নিয়ে উড়ে বেহারাগণ চলে গেল।" যে কথাটি নিতান্ত সহজে বলা যাইত, মঞ্চাসীন আচার্যদেবের দীর্ঘ ভাষণের মতো তাহাই পল্লবিত করিয়া বিধুমুখী বলিতেছে। আচার্যদেবের ভাষণের সারাংশটুকু গ্রহণ করুক আর না-ই

মলিয়ারের প্রভাব

করুক, এই আধুনিকা মহিলাটি যে আচার্যের বাগ্‌ভঙ্গীর অন্ধ অনুকরণ করিয়াছে, তাহা বোঝা গেল। আর এই অকারণ অনুকরণপ্রিয়তার বশবর্তী হইয়া সে নিতান্ত তুচ্ছ ঘর-কন্নার ব্যাপারে, এমন কি নিজের স্বামীর সঙ্গে সাধারণ আলাপে, সেই ভাষা ব্যবহার করিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে। শালীনতা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখিয়া ইঙ্গিতে সুন্দর ব্যঙ্গ করিবার ভাষা মধুসূদনের প্রহসনে আমরা প্রথম লক্ষ্য করিয়াছি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে তাহারই সংস্কৃত রূপ আমরা লক্ষ্য করিলাম।

কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই গুণ প্রহসনের সর্বত্র আমরা পাই না। বিধুমুখীর উত্তরে পূর্ণবাবুর উক্তি লক্ষ্য করিবার মতো। পূর্ণবাবু মদ্য পান করিয়া মাতাল হইয়া আসিয়াছে। বিধুমুখীর বক্তৃতার সবটুকু তাহার কানে যায় নাই। শেষের 'মদমত্ত' শব্দটির খানিকটা তাহার কর্ণগোচর হইয়াছে মাত্র। সে মনে করিল স্ত্রী মদনমত্ত হওয়ার কথা বলিতেছে। সে বলিল—'মাই ডিয়ার ডার্লিং, কি বিষয় তুমি লেক্‌চার দিচ্ছ বাবা? মদনমত্ত হয়ে এসেছ, এই বলছ? মদনমত্ত হয়েছ, বেশ কথা। আমি তোমার তো মদনমোহন রয়েছি।'

দীনবন্ধুর প্রভাব

পূর্ণবাবুর ভাষায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দীনবন্ধু মিত্রকে অনুসরণ করিয়াছেন। তাই পূর্ণবাবুর সংলাপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু বিধুমুখীর সংলাপে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংযম এবং শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন অনেকখানি, বিধুমুখীর ভাষা গ্রাম্যতামুক্ত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ-নিপুণতার পরিচয় প্রহসনখানিতে আছে।

বিধুমুখীর সংলাপের মাধ্যমে তিনি ব্রাহ্মসমাজের আচার ও বাক্যের সমালোচনা করিয়াছেন। পূর্ণবাবু ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার জন্য স্ত্রীর পদতলে পতিত হইলে বিধুমুখী বলিল, 'একবার অনুতাপ কর, তা হ'লেই পাপক্ষয় হবে।' অনুতাপ করা সহজ নহে। অপরাধের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সেই অপরাধের দ্বারা ব্যক্তি-জীবনের ও সমাজ-জীবনের কি ক্ষতি হইল, তাহা অনুধাবন করা এবং পুনরায় সেই পাপ না করাই সত্যকারের অনুতাপ। ইহা না করিয়া অসীম, নিরাকার, অলক্ষ্য, ঠিকানাহীন, অজানা ব্রহ্মের অনির্দেশ্য চরণের উদ্দেশে আকাশে মাথা তুলিয়া হাতজোড় করিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে দুইটি বাক্য আওড়াইলেই যদি সত্যিকারের অনুতাপ হয়, তাহা হইলে ইহা হইতে গুরুতর ভণ্ডামি আর কি হইতে পারে! অন্তরের প্রকৃত বিশুদ্ধি এবং আচরণের পরিবর্তন উহাতে যদি না হয়, তাহা হইলে সঙের মতো অঙ্গভঙ্গী এবং বাগ্‌ভঙ্গী

করিয়া লাভ কি? আবার, ভোলা চাকরের উক্তিতে আধুনিকা বঙ্গনারীর আচরণের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে। যে দেশে 'পতি পরমগুরু' ছিলেন, সেই দেশে এখন স্বামী নামধেয় জীবগুলি দুশ্চরিত্র, অপদার্থ, পরম 'গরু'তে রূপান্তরিত হইয়া স্ত্রীর পদলেহী ক্রীতদাস সাজিয়াছে এবং স্ত্রীগণ স্বামিনী সাজিয়া তাহাদিগের নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইয়া লইতেছে। অথচ ইহাদের ভুল ধরাইয়া দিলে পুরুষপুঙ্গব স্বামী স্ত্রীর নিন্দাকারীকেই দুই ঘা বসাইয়া দিতে উদ্যত হয়।

ভোলা আধুনিক-শিক্ষাসভ্যতাবর্জিত পুরানো দিনের সেকেলে চাকর। এই উগ্র আধুনিকতা তাহার সহ্য হয় না, তাই সে সমালোচনার দ্বারা প্রভুর দৃষ্টি খোলাইতে চায়। পূর্ণবাবু যত বড়ই হউক না কেন, ভোলার নিকট সে সেদিনের বালক বইতো নয়। ভোলা তাহাকে পিতার ন্যায় স্নেহে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। তাই গুরুজনের স্বতঃস্ফূর্ত অধিকারের দাবিতে সে মনিবকে সংশোধন করিতে চায়। ভোলার স্নেহপ্রবণতা, সরলতা, মানব-কল্যাণকামনা প্রভৃতি দর্শকের সমবেদনা সহজে আকর্ষণ করে। তাই ভোলার মুখে এই উগ্র আধুনিক দম্পতীর আচরণের সমালোচনা সার্থক হইয়াছে, উহা আক্রমণাত্মক প্রচার নয়। ভোলার কথাগুলি সরল মানুষের স্বাভাবিক উক্তি বলিয়া উহার মুখে তীব্র বিদ্রূপের কথাগুলিও রূঢ় হয় নাই। "তোমার ইস্ত্রী যে কি গুণ কল্লে, তা বলতি পারি না। আহা, সোনার চাঁদেরে যেন গোলাম করি রাখেছে। ছ্যাঃ, ইস্ত্রী আর কুত্তরে নাই ছ্যালেই ঘাড়ে চড়ে; স্বাধীনতা স্বাধীনতা করি যে, কি মন্ত্র তোমার কানে পড়িল, সেই অবধি তোমার ইস্ত্রী তাধিনৃতা তাধিনৃতা করি আপনিও যেহানে সেহানে নাচি বেড়ায় তোমারেও নাচায়।" স্ত্রী-স্বাধীনতার নাম করিয়া অবাধ-উচ্ছৃঙ্খলতা যে সমর্থন করা যায় না, এই সরল চাকরের মুখ দিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই কথাই বলিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই ধারণা প্রগতি-বিরোধী এবং পরবর্তী কালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন। আমি এইরূপ অনুমান করিবার কোনো কারণ খুঁজিয়া পাই না। 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'এ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যাহাদের সমালোচনা করিয়াছেন, তাহারা সত্য সত্যই প্রগতিপরায়ণ নয়। প্রগতির নামে ইহারা নিজেদের প্রবৃত্তি-চরিতার্থ-তাই খুঁজিতেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহারই সমালোচনা করিয়াছেন। এইরূপ সমালোচনা করা যদি অপরাধ হয়, তাহা হইলে এরিস্টোফিনিস্ হইতে আরম্ভ করিয়া শ পর্যন্ত সকলেই প্রগতি-বিরোধী। ধর্ম, শিক্ষা, সভ্যতা ও প্রগতির

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রগতি-বিরোধী নহেন

দোহাই দিয়া যাহারা নিজেদের প্রচ্ছন্ন দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিতেছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহার রচনা হইতে সে কথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। বিধুমুখী তাহার স্বামীর নিকট প্রেমনাথবাবুর প্রশংসা করিয়া বলিতেছে, "আজকের মন্দিরের সার্ভিস্ হয়ে টয়ে গেলে আমি বেরিয়ে পাল্কিতে উঠ্তে যাই, না দেখি, পাল্কিও নেই, বেহারাও নেই, কেউ কোথাও নেই। অন্ধকার রাত্রি, কি করি, এমন সময়ে আমাদের প্রচারক মহাশয় প্রেমনাথবাবু আমাকে এই রকমের অবস্থায় দেখতে পেয়ে বল্লেন যে এস, আমি তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দেব। আ! আমি তখন বাঁচ্লেম, তখন আমার মনে হ'ল যেন প্রভু যীশুখৃস্ট স্বয়ং এসে আমাকে এই বিপদ্-সাগর হ'তে উদ্ধার কল্লেন; তারপর তিনি সস্নেহভাবে আমার হস্ত ধারণ ক'রে আমাদের বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন, তারপর 'স্বর্গরাজ্য সন্নিকট' ব'লে আমার নিকট হ'তে বিদায় ললেন; আমিও ভক্তিভাবে তাঁর পদতলে প্রণাম ক'রে বাটীর মধ্যে ঢুকলেম্।"

বিধুমুখীর এই উচ্ছ্বসিত বর্ণনার মধ্য দিয়া পরিস্থিতি ও পরিবেশ-অবলম্বনে আমরা মনের কয়েকটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করিব। একটি মহিলার পাল্কি নাই, অন্ধকার রাত্রিতে তিনি বিপন্না, তাঁহাকে বাড়ী পৌঁছাইতে হইবে। আর একখানি পাল্কি ডাকিয়া দিলেই চলিত, তাহাতে যদি না হয়, তাঁহাকে বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া অবশ্যই কর্তব্য। প্রেমনাথবাবু সে কর্তব্য পালন করিয়াছেন। কিন্তু যে-দেশে মহামনীষীদের সাবধানবাণী রহিয়াছে যে, মাতা ও ভগিনীর সহিত পর্যন্ত অতি নির্জনে একাসনে বসিতে নাই, সেখানে অন্ধকার নির্জনপথে অন্তের বিবাহিতা সুন্দরী তরুণীর 'হস্ত' 'সস্নেহভাবে' ধারণ করিয়া বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়ায় কি সুন্দরীর সঙ্গলাভ ও অঙ্গস্পর্শরূপ কামানন্দ-উপভোগের বাসনা চরিতার্থ করা হইল না? প্রগতির দোহাই দিয়া ইহাও কি মানিয়া লইতে হইবে? আর এই সকল বকধার্মিক দুশ্চরিত্র প্রচারকদের মুখে যদি শুনিতে হয়, 'স্বর্গরাজ্য সন্নিকট', তাহা হইতে দুর্ভাগ্যের আর কি হইতে পারে?

এই তো গেল প্রচারকের চরিত্র। এইবার প্রগতিপরায়ণা সভ্যা পুংশ্চলী রমণীটির মনোবৃত্তি একবার বিশ্লেষণ করা যাক। প্রেমনাথবাবুর আবির্ভাবে তিনি মনে করিলেন, দয়ার অবতার যীশুখ্রীস্ট তাঁহাকে উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। মেরী ম্যাক্‌ডালিনের মতো পতিতাকে আপন চরিত্রমাহাত্ম্যে যিনি উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহারই প্রতিনিধি কিনা এই প্রচ্ছন্ন কামুক প্রেমনাথ-

বাবু! বিধুমুখী ভক্তিভরে ইঁহাকে দেবতাজ্ঞানে প্রণাম করিল। করিবে না কেন? শ্রেষ্ঠ পুরুষের প্রতি আসক্ত হওয়া বা hero-worship নারীর স্বাভাবিক ধর্ম। স্বামী পূর্ণবাবুর মধ্যে ঐ শ্রেষ্ঠ পুরুষের সন্ধান বিধুমুখী পায় নাই। তাই স্বামীকে অবলম্বন করিয়া সুপুরুষে সমাহিত হইয়া আত্মস্থ গৃহিণী হওয়ার সৌভাগ্য তাহার জীবনে আসে নাই।

যে নারী দাম্পত্য-জীবনে স্বাভাবিকশান্তিহীন, সে-ই বহির্মুখী হইয়া অতৃপ্ত প্রেম-বাসনার চরিতার্থতা খুঁজিয়া বিভ্রান্ত হয় এবং শ্রেষ্ঠ পরপুরুষের প্রতি সহজে অনুরাগিণী হইয়া পড়ে। 'ঘরে বাইরে'র সন্দীপকে অবলম্বন করিয়া বিমলারও এই একই অবস্থা হইয়াছিল। মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া বিধুমুখী-চরিত্র স্বাভাবিক হইয়াছে। মনুর অনুশাসন, "ভর্তা রক্ষতি যৌবনে" বাক্যের অর্থ এই নয় যে, যুবতী স্ত্রীকে স্বামী তালাচাবি দিয়া গৃহে বন্ধ করিয়া রাখিবেন, তাহা যে সম্ভবপর নয়, মনু তাহা জানিতেন। জানিতেন বলিয়া তিনি বলিয়াছেন, চারিত্র্য যে নারীকে রক্ষা করে, সেই নারীই সত্য সত্য নারীধর্ম রক্ষা করিতে পারে। যৌবনে স্বামীকে অবলম্বন করিয়া নারী দেহধর্ম ও মনোধর্মে বর্ধিতা বা পরিপুষ্টা হইতে চায়, ইহাই স্বামিকর্তৃক নারীর রক্ষণ বা পোষণ। পূর্ণবাবুর স্ত্রী দুশ্চরিত্র স্বামিকর্তৃক এই রক্ষণগুণ হইতে বঞ্চিত হইয়া বিভ্রান্তা হইতে চলিয়াছে। আধুনিকতার নামে লম্পট স্বামীরা যে স্ত্রীদের প্রতি কর্তব্যচ্যুত হইয়াছে, একথা দীনবন্ধুর নিমচাঁদও অতি রূঢ় ভাষায় অটলকে বুঝাইয়া দিয়াছে।

বিধুমুখীর কর্তব্যজ্ঞানহীন অপদার্থ লম্পট স্বামীও কিন্তু স্ত্রী ও প্রচারক প্রেমনাথবাবুর এই আচরণকে প্রীতির চক্ষে দেখে নাই। পূর্ণবাবু ভাবিতেছে—"অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ!" সন্দেহ হচ্ছে, "অন্ধকার রাত্রি", আবার "হস্তধারণ করে?" কিন্তু এই সন্দেহ তাহার মনকে বিশেষ আলোড়িত করে নাই। যে লম্পট নিজে অন্য নারীর মর্যাদা অবহেলে লুণ্ঠন করে, সে নিজের স্ত্রীর চারিত্রিক বিশুদ্ধির জন্য সহজে মাথা ঘামাইয়া মরিবে কেন? বরং নিজের দুর্বলতা ঢাকিবার জন্য সে বলিয়া গেল, স্ত্রীর আচরণে সে কখনও সন্দেহ প্রকাশ করিবে না, কারণ, সন্দেহ প্রকাশ করা প্রেমের ধর্ম নয়। অর্থাৎ বিধুমুখীও যেন তাহার স্বামীর চরিত্রে সন্দেহ না করে। পূর্ণবাবুর এই উক্তি যে নিজের দুষ্কর্ম-সমর্থনের একটা বহিরঙ্গ উপায়মাত্র, আমরা অচিরেই তাহা দেখিতে পাইব।

পূর্ণবাবু কপট কথায় স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্যামবাজারের কামিনীর নিকট চলিয়া গেলে বিধুমুখী ভাবিতেছে, তাহার স্বামী তাহাকে সত্য সত্যই সন্দেহ করে কিনা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। বিধুমুখীর

মধ্যে একটা বড় রকমের অন্তর্দ্বন্দ্ব চলিতেছে। বিধুমুখী বুঝিয়াছে যে, বর্তমান যুগের স্বামীরা স্ত্রীর ভালবাসা বা হৃদয়ের সৌন্দর্য চায় না, তাহারা চায় রূপ। নিজের স্বামীর সম্বন্ধে তাহার এইরূপ ধারণা ছিল না, এখন সে বুঝিয়াছে, সবাই সমান। তাই সাজিয়া-গুজিয়া যদি স্বামীর মন ভুলানো যায়, সেই চেষ্টা করিয়া দেখিবে। তাই সে গহনাগুলি বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

অন্তর্দ্বন্দ্বের সংঘাতে ঘটনা যেখানে গুরুগম্ভীর হইয়া যাইতে পারিত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেইখানেই সুকৌশলে ঘটনার মোড় ফিরাইয়া দিয়া কমেডীর সম্ভাবনা অবরুদ্ধ করিয়া একখানি সমস্যা-ভার-শূন্য প্রহসন সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ইহাতে কাহিনীর আকর্ষণ কমিল না, বরং বাড়িয়া গেল। পেরুরাম এই ঘরে ঢুকিয়া অবধি বাহির হইবার রাস্তা পাইতেছিল না, ঘুরিয়া ফিরিয়া সে তাই আবার এই ঘরেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বিধুমুখী ভাবিলেন, তাহার গহনা চুরি করিবার জন্য এই গভীর রাত্রে ঘরে চোর ঢুকিয়াছে। এই ভুল বোঝা হইতে এক কৌতুককর পরিস্থিতির উদ্ভব হইল—বিধুমুখী গহনাগুলি পেরুরামকে দিয়া প্রাণভয়ে পলাইতে চাহিতেছে, কিন্তু পেরুরাম তাহাকে নিজের প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝাইবার জন্য বহু প্রকারে চেষ্টা করিতেছে। এই দুইজনের হুড়াহুড়ি দৌড়াদৌড়ি পরিস্থিতিকে হাস্যবিধুর করিয়া তুলিয়াছে। অবশেষে পেরুরাম যখন এই বাড়ীতে তাহার প্রবেশের প্রকৃত কারণ খুলিয়া বলিল, তখন ব্যাপারটি কি হইয়াছে জানিয়া বিধুমুখী হাসিয়া খুন হইল।

কিন্তু বর্তমানের পরিস্থিতি খুব স্বস্তিকর নয়। সঙ্গিহীনা একটি রমণীর কক্ষে রাত্রি দুইটা নাগাদ একজন অপরিচিত পুরুষ। লোকে জানিলে বিশেষতঃ চাকর-বাকরেরা দেখিলে কি মনে করিবে? স্বামী এই অবস্থা জানিলেই বা কি বলিবে? আত্মসম্মানের চিন্তায় বিধুমুখী ভাবিত হইল, কিন্তু ইহাকে কি করিয়া বাহির করিয়া দেওয়া যায়? উপায়ান্তর না দেখিয়া বিধুমুখী পেরুরামকে এই দোতলা ঘরের জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িতে বলিল। কিন্তু অত উঁচু হইতে লাফাইয়া পড়া পেরুর সাধ্য নয়, বরং পেরু আরো অদ্ভুত কথা বলিয়া বসিল। জানালা হইতে লাফাইতে গেলে আগে লাফ দিয়া জানালায় উঠিতে হইবে, তাহাতে যদি কোথাও একটু লাগে, তাহা হইলে পেরুরাম এমন চিৎকার করিয়া উঠিবে যে, বাড়ীশুদ্ধ লোক জাগিয়া উঠিবে, অর্থাৎ যে-বিপদ্ বিধুমুখী এড়াইতে চাহিতেছেন, সেই বিপদ্ই তাহাতে আসন্ন হইবে, কাজেও তাহাই হইতে চলিল। বিধুমুখী পেরুরামকে জানালা বন্ধ করিতে বলিলে পেরুরাম জানালা

বন্ধ করিতে গেল, কিন্তু তাহাতে তাহার আঙুল চিমটাইয়া গেল এবং সে ব্যথাপ্রযুক্ত নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী ও চিৎকার করিতে উদ্যত হইল। যাহা গোপন করিবার প্রয়োজন, তাহাই ঘটিয়া যাইতেছে বলিয়া পরিস্থিতি হাস্য-রসাত্মক হইয়া উঠিতেছে।

বিধুমুখী ভাবিয়া পাইতেছে না এই অবস্থায় কি করা যায়। একবার সে ভাবিল সাহসে ভর করিয়া সত্য কথাই বলিবে, পরিস্থিতিতে হয়তো তাহাই করা উচিত ছিল, স্বামী বুঝুন আর না-ই বুঝুন, তাহা ছাড়া আর করিবার কিছুই ছিল না। কিন্তু বিধুমুখী পরে যাহা ঠিক করিল, তাহাই অস্বাভাবিক, দুঃসাহসিক, অবিবেচনাপ্রসূত এবং অসঙ্গত—যে প্রেমনাথবাবু-সম্বন্ধে তাহার স্বামীর মনে আগে হইতে সন্দেহ জাগিয়া আছে, বিধুমুখী পেরুরামকে সেই প্রেমনাথবাবু বলিয়া চালাইতে চাহিতেছে। যদি তাহার স্বামী ইহাকে সত্য সত্যই প্রেমনাথবাবু বলিয়া ধরিয়া লয়, তাহা হইলে পরিণাম কি ভয়াবহ হইবে, বিধুমুখী, তাহা একবার ভাবিয়াও দেখিল না। এই দুঃসাহসিক কল্পনা অসঙ্গত এবং অবাস্তব। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য অনেক নাটকে এইরূপ কল্পনার দৈন্য রহিয়াছে। শুধু এইটুকুই নয়, কল্পনার ত্রুটি এখানে আরো আছে। বিধুমুখী তাহার স্বামীকে প্রতারণা করিবার জন্য পেরুরামকে দিয়া প্রেমনাথবাবুর ভূমিকা অভিনয় করাইতে যাইতেছে, কিন্তু প্রেমনাথবাবু কেমন, তাঁহার পরিচয় কি, আচার-আচরণ কি প্রকার, পেরুরামকে তাহার কিছুই বলা হইল না। একজন শিক্ষিত আচার্যের ভূমিকা না জানিয়া পেরুরাম কি করিয়া অভিনয় করিয়া যাইবে? অথবা পেরুরামের কিছু বলিবার ও করিবার নাই, বিধুমুখীই সকল করিয়া যাইবে? বিধুমুখী একথা অন্ততঃ বুঝিয়াছে যে পেরুরাম কিছু বোকা। সেই বোকাকে লইয়া অভিনয় করিতে গেলে পূর্ণবাবু কি ধরিয়া ফেলিতে পারিবে না? এসব কথা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কেন ভাবিলেন না জানি না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখানে রামনারায়ণের 'চক্ষুদান' নাটকের প্রভাবে পড়িয়াছেন। কিন্তু 'চক্ষুদান' নাটকের কাহিনীর অভিনবত্ব বা চমৎকারিত্ব না থাকিলেও উহা অস্বাভাবিক হয় নাই। 'নাপ্তেবৌ'কে পুরুষ সাজাইয়া 'নিকুঞ্জবিহারী'র চক্ষুদান দেওয়া যাইতে পারে। কারণ, পরিণামে নিকুঞ্জবিহারী জানিবে যে পুরুষবেশিনী 'নাপ্তেবৌ' আসলে নারী। সুতরাং নিকুঞ্জবিহারীর নিজের ভ্রান্তি দূর হইবে এবং স্ত্রীর উপরও কোনো সন্দেহ থাকিবে না, কিন্তু এখানে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে। তাই জ্যোতিরিন্দ্র-

রামনারায়ণের 'চক্ষুদান' নাটকের প্রভাব

নাথের কল্পনায় আমরা দূরদর্শিতা এবং পরিস্থিতির বাস্তবতাজ্ঞানের অভাব দেখিতে পাই। এই ত্রুটি আছে বলিয়া প্রেমনাথরূপী পেরুরামের সহিত বিধুমুখীর আলাপের অংশটুকু সুন্দর হয় নাই। বিধুমুখী যতই মিষ্টালাপ করিতে গিয়াছে, পেরুরাম ততই না বুঝিয়া নিজের বুদ্ধিমত উত্তর দিতে গিয়া ভাঁড়ামি করিয়াছে। ফলে কোনো উচ্চাঙ্গের হাস্যরস এখানে সৃষ্ট হয় নাই। রামনারায়ণ-দীনবন্ধুর রচনায় সামান্য ঘরোয়া পরিস্থিতির অবলম্বনে যেটুকু মোটা-সোটা রকমের হাস্যরসের সন্ধান পাওয়া যায়, এখানে তাহাও মিলে না।

তবে পূর্ণবাবুর সঙ্গে পেরুরামের আলাপের প্রথমাংশ সত্যই উপভোগ্য হইয়াছে। বিধুমুখী পেরুরামকে আড়াই টাকা বেতনে সরকার নিযুক্ত করিয়াছে, তাহার জন্য জলখাবার আনিতে বলিয়াছে। ইহা হইতে পেরুরাম অন্ততঃ এইটুকু বুঝিয়াছে যে, তাহার কপাল খুলিয়া গিয়াছে। তাই সে নিশ্চিন্ত আরামে পূর্ণবাবুর কৌচে বসিয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতেছে, এমন সময়ে পূর্ণবাবু প্রবেশ করিল। চরিত্রবিকাশী সংলাপসৃষ্টিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখানে যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ণবাবু বিধুমুখীকে আগে হইতেই সন্দেহ করিত—একথা আমরা আগেই জানি। এখন বিধুমুখীর মুখে কয়েকবার প্রেমনাথবাবুর নাম শুনিয়া এবং পেরুরামকে তাঁহার কৌচে উপবেশন করিতে দেখিয়া তাহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে ইনিই সেই প্রচারক প্রেমনাথবাবু যিনি তাহার অনুপস্থিতিতে বিধুমুখীর সঙ্গে প্রেমালাপ করিতেছেন। তিনি আসিয়া পেরুরামকে বলিলেন, 'তুই ব্যাটা আমার জায়গায় কি ক'রে এসে ভর্তি হলি?' পূর্ণবাবুর কথা পেরুরাম বুঝিল না, বুঝিবার কারণও নাই। 'আমার জায়গায়' কথাটি শুনিয়া সে বুঝিল, আগন্তুকটি আগেকার সরকার আর এই সরকারের জায়গায়ই বিধুমুখী পেরুরামকে নিযুক্ত করিয়াছে। তাই পেরুরাম তাঁহার সঙ্গে অসংযত ভাষায় আলাপ করিতে লাগিল।

সে সরল বিশ্বাসে যাহা বলিতেছে, পূর্ণবাবুর বিপরীত বুঝিবার ফলে তাহার অর্থই শ্লেষালঙ্কার সৃষ্টি করিয়া পরিস্থিতিকে কৌতুকাবহ করিয়া তুলিতেছে। পেরুরামের উক্তি, "তুই যদি এখন কর্মের যুগ্যি না হোস্, সে তো আমার দোষ না। গিন্নী তোকে আর পছন্দ করে না......মেয়েমানুষের মন তো জানিস্—কার প্রতি কখন সদয় হয়, তার কি কিছু ঠিকানা আছে? আবার দিন কতক পরে আমার উপরেও ঐ রকম হ'তে বা আটক কি?......পাগল হ'লে গিন্নীর মনে হয়তো না।" প্রভৃতি দ্ব্যর্থবোধক বাক্যগুলিই এখানে জটিলতা-

সৃষ্টির মূল। পেরুরাম ঐগুলি চাকুরী-ব্যাপারে মনিব-গৃহিণী ও সরকারের সম্পর্কে প্রয়োগ করিতেছে, কিন্তু পূর্ণবাবু বুঝিতেছে বিধুমুখীর কল্পিত প্রেমিকের সঙ্গে নিজের অবস্থা-বিপর্যয়ের ব্যাখ্যানরূপে। তাই পেরুরামের প্রত্যেকটি কথায় তাহার অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছে। পূর্ণবাবু পেরুরামকে চাবুক মারিয়া শাস্তি দিতে চাহিলে, পেরুরাম বলিল, 'তোর যে রকম গরম মেজাজ দেখ্‌ছি বাবা, তাতে যে গিন্নীর কাছে এতদিনও টিকে ছিলি, এই তোর পরম ভাগ্যি বলতে হবে।' পেরুরামের বক্তব্য হইল এই যে, এমন বদমেজাজী সরকার মনিব-পত্নীর নিকট এতদিন টিকিয়াছিল কি করিয়া? পূর্ণবাবু বুঝিতেছে, এইরূপ বদমেজাজী স্বামীকে যে এতদিন পর্যন্ত তাহার স্ত্রী সহ্য করিয়াছে, ইহাই যথেষ্ট সৌভাগ্য। সে আর সহ্য করিতে পারিল না, ক্রুদ্ধভাবে পেরুকে বলিল, 'বেরো এ ঘর থেকে...বেরো হারামজাদা!' উত্তরটি হইল চমৎকার! 'আর একঘণ্টা আগে যদি বেরোতে বল্‌তিস্ তাহ'লে আমি বেরিয়ে যেতাম—এখন ওর জায়গায় জুত ক'রে ব'সে নিয়েছি—এখন বলে কিনা "বেরো"।' পেরুরাম যাহা ভাবিয়াই বলুক না কেন, পূর্ণবাবুর মতে স্ত্রীর উপপতির এইরূপ অভব্য উদ্ধত উক্তি অসহ্য। সে তরবারি লইয়া পেরুরামকে আক্রমণ করিল, পেরুরাম ভয়ে 'পুলিশম্যান্', 'চৌকিদার' প্রভৃতি ডাকিয়া চিৎকারে ঘর ফাটাইয়া দিল। পূর্ণবাবুর নিকট হইতে পলায়নের চেষ্টা করিলে সে চৌকি বাধিয়া পড়িয়া গেল। বিধুমুখী ঘরে ঢুকিল। পূর্ণবাবু স্ত্রীকে তীব্রভাষায় তিরস্কার করিয়া বলিল, 'যে রকম ব্যাপার দেখছি, তাতে তো আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।' বিধুমুখী এইবার পূর্ণ প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, 'সন্দেহ! সন্দেহের মানে কি বল দেখি?'

পূর্ণবাবু উত্তেজনার চরমে পৌঁছিয়াছে। পেরুরামকে আবার তরবারি লইয়া আক্রমণ করিল। সামাজিক প্রহসনে হঠাৎ তরবারি আমদানি করা অসঙ্গত হইয়াছে। আবার, মধ্যযুগের নাইট্‌দের অনুকরণে প্রেমের ব্যাপারে তরবারি-সহযোগে দ্বৈরথ যুদ্ধের অবতারণা করাও স্বাভাবিকতা-বিরোধী হইয়াছে। সুতরাং প্রহসনখানির মধ্যে শক্তিমত্তার পরিচয় থাকিলেও উহা সর্বতোভাবে সার্থক হয় নাই।

চরিত্র- ও প্রসঙ্গগত আর একটি ত্রুটির উল্লেখ করিব। পূর্ণবাবু যখন পেরুরামের নিকট তাহার সত্যকার পরিচয় জানিতে পারিলেন এবং এপর্যন্ত কেমন করিয়া কি ঘটিয়াছে বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে সব কিছুকে নিতান্ত কৌতুককর তুচ্ছ ঘটনা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারিলেন।

কিন্তু সাধারণ স্তরের একজন অনাত্মীয় অপরিচিতের সঙ্গে যে স্ত্রীর চরিত্র-বিষয়ে সন্দেহ করিয়া অভদ্রোচিত উন্মত্ত আচরণ করিলেন সেজন্ম জন্ম 'শঠে শাঠ্যং' তিনি এতটুকুও অপ্রতিভ হইলেন না এবং স্ত্রী এইরূপ অসঙ্গত কৌতুক করিয়াছে বলিয়া তাহাকেও কিছু বলিলেন না। বরঞ্চ স্ত্রীকে ধোকা দিবার নীতি অবলম্বন করিয়া পেরুরামের সাহায্যেই নূতন আয়োজন সুরু করিলেন। কাহিনী-পরিকল্পনায় নাট্যকারের এই ত্রুটি উপেক্ষা করিবার মতো নয়।

আবার কাহিনী যেখানে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়া আসিল, সেখানেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গোজামিল দিয়া কোনোমতে সারিয়া দিয়াছেন। পূর্ণবাবু পেরুরামের কিছু অতিরিক্ত উপকার করিতে চাহিলে, পেরুরাম বলিল, কামিনী-নাম্নী যে নারীটিকে সে ভালবাসে, তাহার আর একজন কে প্রেমিক জুটিয়া গিয়াছে, পূর্ণবাবু তাহার সন্ধান দিতে পারেন কি না। এই বলিয়া সে কামিনীর নিকট লিখিত পূর্ণবাবুর চিঠিই পূর্ণবাবুকে দেখাইল। বিধুমুখী স্বামীর হাতের লেখা চিনিতে পারিল। ঘটনা কৌতুকময়তা ত্যাগ করিয়া গুরুগম্ভীর এবং জটিল হইতে চলিল। কিন্তু পেরুরাম হঠাৎ বুদ্ধি খাটাইয়া বিধুমুখীকে বুঝাইয়া দিল যে, চিঠিখানি বিধুমুখীকে ঠকাইবার জন্য পূর্ণবাবু লিখিয়া পেরুরামের হাতে দিয়াছিল। ইহাতে ঘটনার মোড় ফিরিল বটে, কিন্তু স্বাভাবিক হইল কি? পেরুরামকে আমরা এ পর্যন্ত বোকা বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি। তাহার পরিচয় দিতে গিয়া তাহার সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর বন্ধুও ঐ কথাই লিখিয়াছে। হঠাৎ সেই বোকাটি এত বুদ্ধিমান্ হইল কি করিয়া? কামিনীর প্রণয়ীকে আবিষ্কার করিতে যে বোকা অন্ধ-প্রেমিক এত উৎসুক ছিল, সে যখন জানিতে পারিল যে পূর্ণবাবুই তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, তখন কি সে একটুও বিচলিত হইল না? সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই প্রহসনখানি সর্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই।

তবে এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। বাংলা প্রহসন-সাহিত্যের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক মূল্য কম নহে। তিনিই প্রহসন-সাহিত্যে নূতন যুগের পথপ্রদর্শক। সমাজ-জীবনের সামগ্রিক এবং ব্যাপক সমস্যা ছাড়া ব্যক্তিজীবনের ভুল-ত্রুটি, অসঙ্গতি, উৎকেন্দ্রিকতা, অতিমাত্রিকতাও যে উৎকৃষ্ট এবং বিশুদ্ধ হাস্যরসের উপাদান হইতে পারে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাহা দেখাইলেন। অবশ্য একথাও আমরা মনে রাখিব যে, সমাজকে বাদ দিয়া

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাংলা প্রহসন-সাহিত্যে নূতন যুগের পথপ্রদর্শক

ব্যক্তিজীবন কখনও চলিতে পারে না, সুতরাং ব্যক্তিজীবনের আলেখ্য রচনা করিতে গেলে সমাজজীবন আসিয়া পড়িবেই। তবে মলিয়ারের বহু প্রহসন-কমেডীতে সমাজ গৌণ এবং পরোক্ষ থাকিয়া ব্যক্তিকে প্রধান এবং প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনে আমরা তাহাই দেখিতে পাই। তাই সত্য সত্য মলিয়ারের নাট্যনীতি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইল। মনে রাখিতে হইবে যে, আমি এখানে মলিয়ারের অনুবাদের কথা বলিতেছি না, অনুসরণের কথাই বলিতেছি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্য প্রহসন দুইখানি যে রচনা-হিসাবে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' হইতে উন্নত হইয়াছে, তাহা নয়। 'অলীক বাবু'-প্রহসনের 'অলীক'-চরিত্র কল্পনার দিক্ দিয়াও অলীক হইয়াছে। মিথ্যাবাদী ধূর্তচরিত্রও যে কত শোভন ও স্বাভাবিক হইতে পারে, শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী তাঁহার 'ঘৃতং পিবেৎ' নাটকে তাহা দেখাইয়াছেন। মূর্খ মোটরচালক ত্রিদিবনারায়ণ রাজপুত্র সাজিয়া এক রায়বাহাদুর-পরিচয়ধারীর কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছে। চাল-চলনে সে খাস বিলাত-ফেরতদের অনুকরণ করিতে চায়, কিন্তু কথাবার্তায় তাহার মূর্খতা প্রতিমুহূর্তেই ধরা পড়িবার উপক্রম হয়। তাহার আত্মীয় বিজয়নারায়ণ প্রতিমুহূর্তে ত্রিদিবের এই মূর্খতা ঢাকিবার জন্য কথার উপর কথা সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু সৃষ্টি বাস্তব পরিবেশ ও পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এমন সঙ্গত হইয়া উঠিয়াছে যে, ঐ নির্জলা মিথ্যাও জীবন্ত সত্যের মতো প্রতিভাত হইয়াছে।

উচ্চারণের ব্যাকরণ যখন পরিবর্তিত হওয়া স্বাভাবিক এবং মহাযুদ্ধের পর যখন অনেক কিছুর পরিবর্তন হইয়াছে, তখন বার্লিনের উচ্চারণ 'বের্লিন' হওয়া বিচিত্র নয়। ইউরোপের রীতিনীতির ও কথাবার্তার অতিদ্রুত পরিবর্তন হয় কি না, তাহা আমরা জানি না, তবে বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে সভ্যতার দ্রুত পরিবর্তন যাহারা চোখের নিমেষে করিতেছে, তাহাদের দেশে বার্লিনের উচ্চারণ এই সেইদিন 'বের্লিন' হইয়াছে কিনা ইহা সদ্যো-বিলাত-ফেরত ভিন্ন কে বলিতে পারে? আমরা যাহা জানি না, তাহা হয়তো সম্ভবপর বলিয়া মানিয়া লইয়া বসিয়া থাকি। অধ্যাপক বিশী তাঁহার রচনায় যে সারস্বত বিশ্বাস উৎপন্ন করিতে পারিয়াছেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীক'-চরিত্রে তাহার সন্ধান মিলিবে না। আবার টার্টুফ-এর (Tartuffe) মতো প্রতারক চরিত্রের আদর্শেও 'অলীক'-চরিত্র কল্পিত হয় নাই, এই প্রহসনের কাহিনীগত অসঙ্গতিও অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু একটি বিষয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রশংসা

না করিলে নিতান্ত অবিচার করা হইবে। 'অলীকবাবু'-গ্রন্থে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্যারোডি-সৃষ্টির অপূর্ব দক্ষতা দেখাইয়াছেন। নভেল-পড়া মেয়ে হেমাঙ্গিনীর মুখে তিনি শুধু যে বঙ্কিমের উপন্যাসের ভাষার ব্যঙ্গ-বাণী তুলিয়া দিয়াছেন, তাহাই নহে, চরিত্রটিকেও নিতান্ত স্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন। নভেল পড়িয়া সেও মনে মনে উপন্যাসের রোমাণ্টিক নায়িকা আয়েষা-তিলোত্তমার সগোত্রা হইয়া গিয়াছে। দাসী প্রসন্ন-চরিত্রের স্বাভাবিকতা ও ভাষার অকৃত্রিমতা তুলনামূলকভাবে পাশাপাশি চলিয়া হেমাঙ্গিনীকে আরো স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার এই নায়িকাটিকে যত সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন, নায়ককে যদি ততখানি সুন্দর ও স্বাভাবিক করিয়া আঁকিতে পারিতেন, তাহা হইলে প্রহসনখানি অতি সুন্দর হইত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ শক্তির চরম প্রকাশ হইয়াছে শেষ দৃশ্যে, যেখানে 'ভোঁতা বঁটি হস্তে হেমাঙ্গিনী' প্রবেশ করিয়া বলিতেছে,—'আমি পিতার সমক্ষে, সমস্ত জগতের সমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে বলছি, এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।'

মনে রাখিতে হইবে, এই ব্যঙ্গ বঙ্কিমের রচনাকে নয়; উপন্যাস-পাঠে অল্পশিক্ষিতা তরুণী কন্যাদের যে মতিভ্রম ঘটিতেছে, ব্যঙ্গের মাধ্যমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সমাজের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন।

'হিতে বিপরীত'-এর মধ্যে আলোচনা করিবার মতো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে দিয়া বাংলা প্রহসন-সাহিত্যের মধ্যযুগের সূচনা। ঠাকুর-পরিবারের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রহসনে ভাঁড়ামিমুক্ত বিশুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা করিলেন। শিক্ষা এবং স্বাভাবিক কথ্যভাষা নাটক-প্রহসনে তিনি সার্থকভাবে প্রয়োগ করিলেন। মলিয়ারের নাট্যশৈলীর অনুসরণ বাংলা সাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ হইয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি এই একই ধারার ধারক ও বাহক।

চতুর্থ অধ্যায়

[অমৃতলাল বসু]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মলিয়ারের অনুসরণে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে যে প্রহসনের ধারা প্রবর্তন করিলেন, অমৃতলাল বসু সেই ধারাই পরিপুষ্ট করিলেন। হাস্য-রসাত্মক প্রহসন রচনার জন্য তিনি 'রসরাজ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অমৃতলালকে সম্মানিত করিয়াছিলেন, কিন্তু অমৃতলালের সাহিত্যিক প্রতিভার মূল্যায়নে সমালোচকগণ একমত হইতে পারেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন,* বাংলা নাট্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশে অমৃতলালের দান অবশ্যই স্বীকার্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে যাহার আরম্ভ অমৃতলালে তাহার পরিণতি।

অমৃতলালের সাহিত্যিক প্রতিভার মূল্যায়ন

অমৃতলাল ভবিষ্যদ্-দ্রষ্টা। মলিয়ারের মতো তিনি সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের দোষত্রুটিগুলি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাই ব্যঙ্গমিশ্রিত আঘাতের মধ্য দিয়া তিনি সমাজজীবন ও ব্যক্তি-জীবনের সংশোধনের ভার লইয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভাঁড়ামি ও গ্রাম্যতা-রহিত বিশুদ্ধ হাস্যরসের অবতারণা বাংলা সাহিত্যে করিয়াছিলেন, অমৃতলাল তাহাই আরো উজ্জ্বলভাবে পরিবেশন করিয়াছেন। অমৃতলালের বহু চরিত্র তাঁহার সমকালীন ব্যক্তির বাস্তব-জীবন-অবলম্বনে রচিত।

অমৃতলাল-সম্বন্ধে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত মতও কেহ কেহ পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে অমৃতলাল দ্রষ্টাও নহেন, স্রষ্টাও নহেন।** মধু-দীনবন্ধুর মধ্যে যে সাহিত্যিক প্রতিভা ও সমাজ-জ্ঞান ছিল, অমৃতলালে তাহার কিছুই ছিল না। ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া সমাজ যখন ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়া প্রগতির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন সমাজের সেই কল্যাণমুখী অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া অমৃতলাল সেই প্রগতিকেই ব্যঙ্গ করিয়াছেন। বাস্তব জীবন-দৃষ্টির অভাব এবং উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক প্রতিভার অভাব এই দুইটি মিলিয়া অমৃত-লালের সৃষ্টি ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। মহাকালের শাসনে আজ তাই অমৃতলালের রচনা এবং দৃষ্টিভঙ্গী উভয়ই বিসর্জিত হইয়াছে। ইঁহারা আরো মনে করেন, প্রাচীনপন্থী ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতো অমৃতলালও ছিলেন নারী-প্রগতিবিরোধী, শিক্ষিতা নারীদের আক্রমণ করিয়া অকারণ ব্যঙ্গ করিয়া অমৃতলাল আপন

---

* ডাঃ সুকুমার সেন প্রণীত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ২৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

** ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

সঙ্কীর্ণ এবং কদর্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন, ক্ষয়িষ্ণু বর্ণাশ্রমের পুরাণো কাঠামোকে তিনি অকারণ আঁকড়াইয়া ধরিতে চাহিয়াছিলেন, তিনি মানুষকে জাতিতে জাতিতে বিভক্ত করিয়া দেখিয়াছেন, এবং ইতর গ্রাম্যজনেরা মতো জাতি তুলিয়া গালাগালি করিয়া একপ্রকার জঘন্য আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন।

এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মতামতের কোন্‌টি সত্য আর কোন্‌টি মিথ্যা তাহা ঠিক ঠিক নির্ণীত না হইলে অমৃতলালের প্রতিভার সত্যকার মূল্যায়ন হইবে না। আমি অমৃতলালের সৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই আমার বক্তব্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

আমি যতদূর লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সহিত অমৃতলালের কয়েকটি দিকে বিশেষ মিল আছে। গিরিশচন্দ্রের মতো অমৃতলালের প্রতিভারও কোনো ক্রমবিকাশ নাই। গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল দুইজনের কাহারও সম্বন্ধে একথা বলা যাইবে না যে, প্রথমে দুই একখানি অসার্থক নাটক রচনা করিয়া তাঁহারা হাত পাকাইয়াছেন এবং যত দিন গিয়াছে, ততই তাঁহাদের প্রতিভা উত্তরোত্তর ঔৎকর্ষ লাভ করিয়াছে; শেষে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তিরও তারতম্য হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রের মতো অমৃতলালের বহু রচনাই সৃষ্টি-হিসাবে ঔৎকর্ষের দাবি করিতে পারে না, বহু নাটকের মধ্যে চার পাঁচখানি মাত্র প্রশংসার দাবি করিতে পারে। গিরিশচন্দ্রের রচনার মতো অমৃতলালের এই চারি-পাঁচখানি রচনার কোনো একখানিও ষোল আনা সার্থক রচনা নয়। অথচ গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল উভয়েই ছিলেন মনে-প্রাণে বাঙালী। বাঙালীর সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনের প্রতি উভয় নাট্যকারেরই অপরিসীম ভালবাসা লক্ষ্য করা যায়। আর এই ভালবাসার আতিশয্যের জন্ত দুইজনের কেহই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারোচিত নির্লিপ্তি এবং সংযম অবলম্বন করিয়া নাটকের চরিত্র ও কাহিনী রচনা করিতে পারেন নাই। নাট্যকারের নিজস্ব ধারণা-ভাবনা পাত্র-পাত্রীর মুখে রূঢ়ভাবে প্রকাশ পাইয়া সাহিত্যিকের প্রচারাত্মক মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে। কিন্তু এই দোষত্রুটি সত্ত্বেও উভয় নাট্যকার তাঁহাদের জীবিতাবস্থায় বাঙালীর মনোহরণ করিয়াছিলেন এবং বর্তমান কালে উভয়ের সম্বন্ধেই সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে।

অমৃতলাল ও গিরিশচন্দ্র

অমৃতলালের সব কয়খানি নাটকের আলোচনা করার প্রয়োজন বর্তমান প্রবন্ধে নাই। তাঁহার মাত্র কয়েকখানি নাটক অবলম্বন করিয়া আমি

রসরাজের প্রতিভার দিগ্‌দর্শন করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার 'একাকার' নাটকখানি লইয়াই প্রথম আলোচনা সুরু করা যাক্। কারণ, অমৃতলাল সম্বন্ধে প্রধান প্রধান অভিযোগের অনেকগুলিরই সৃষ্টি হইয়াছে এই নাটকখানিকে কেন্দ্র করিয়া।

'একাকার' নাটক

নাটকখানির প্রস্তাবনা-হিসাবে গন্ধর্বলোকে যে দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার নাট্যমূল্য বিশেষ কিছুই নাই। সাম্যবাদের নামে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যেই যে একটা বিশৃঙ্খলার উৎপত্তি হইয়াছে এবং বাংলাদেশে মানুষে ও বানরে যে কোন পার্থক্যই থাকিবে না, প্রস্তাবনার মূল বক্তব্য শুধু এইটুকু। ইহার মাধ্যমে নাটকের মূল কাহিনীর অবতারণা করা হয় নাই, বরং নাট্যকারের রচনার উদ্দেশ্যমূলকতা এবং তীব্র আক্রমণশীল মনোভাবের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক, মধুবাবুর বহির্বাটি। নাটকের সত্যকার আরম্ভ। ভারতের বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার একেবারে আদিকালে শুনা যায়, ব্রাহ্মণ সকলের প্রণম্য, গুণী, জ্ঞানী ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাই ব্রাহ্মণকে বলা হইত 'ভূমিদেব', পৃথিবীতে তিনি দেবতার প্রতিনিধি। ক্ষত্রিয়-সন্তানগণ রাজকার্য করিতেন। ব্যবসায়ী বণিক্ ও নবশাখ-সম্প্রদায় কুলক্রমাগতভাবে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সচ্ছল জীবন যাপন করিতেন। তখন সমাজে বেকারসমস্যা ছিল না এবং একের বৃত্তি অপহরণ করিবার লোভ অন্যের জন্মিত না। তারতম্য-অনুসারে বর্ণাশ্রমের মধ্যে একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধা-প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। ইংরেজী সভ্যতার আগমনে সেই প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। বর্ণাশ্রমের অন্তরালে সমাজের যেটুকু অসন্তোষ, অভিমান এবং হীনম্মন্যতা চাপা ছিল, ইংরেজের আগমনে সমাজের আপামর জনসাধারণের মুক্তির মধ্য দিয়া সেগুলি আত্মপ্রকাশ লাভ করিতেছে। 'দুর্ভাগা দেশ' এতদিন যাহাদের 'অপমান' করিয়া আসিয়াছে, আজ আমাদিগকে 'অপমানে' 'তাহাদের সবার সমান' হইতে হইয়াছে। মধুবাবু জাতিতে কলু, ঘানি-চালনা তাহার জাতীয় ব্যবসায়। ইংরাজ না আসিলে এই কলুর ছেলে ঘানিই চালাইত এবং ব্রাহ্মণ 'চক্রবর্তী' ও কায়স্থ 'ঘোষ' মহাশয়কে 'আজ্ঞে কর্তা' বলিয়া সেলাম ঠুকিত ; ঠাকুর মহাশয় ও ঘোষজা মহাশয় সমাজের নীচশ্রেণীর এই কলু 'মধো'কে পদধূলি দিয়া, আশীর্বাদ করিয়া কৃতার্থ করিতেন। দয়া করিয়া 'তুই' না-বলিয়া বড়জোর 'তুমি' বলিতেন। কিন্তু হঠাৎ যুগের এমনই পরিবর্তন হইয়াছে যে, সেই 'কলু' মধুই অফিসের বড় বাবু এবং প্রেমচাঁদ

চক্রবর্তী ও বেচারাম ঘোষ, এই দুই বিপ্র এবং কায়স্থ-সন্তান আজ সেই মধুর অফিসে অধস্তন কেরানী। মধু তাহাদিগকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে এবং তাহারাই চাকুরী বাঁচাইবার জন্য তাহাকে 'আজ্ঞে বড়বাবু' বলিয়া তোষামোদ করিতেছে। কিন্তু 'কলু'কে এই ভদ্র সম্বোধন কায়স্থ-ব্রাহ্মণের ছেলেরা কি সন্তুষ্ট-চিত্তে বা শ্রদ্ধার সঙ্গে করিতেছে? তাহা মোটেই নয়। অন্নের দায়ে অফিসে তাহারা মাথা নোয়াইলেও সামাজিক জীবনে এখনও তাহারা মধুকে সমান বা শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিতে প্রস্তুত হয় নাই। তাই মধুর বাড়ীতে লুচি খাওয়ার নিমন্ত্রণও তাহারা কৌশলে এড়াইয়া চলে। মধুর দৃষ্টিতে ইহার কারণ নিশ্চয়ই ধরা পড়ে। তাই সে কায়স্থ-ব্রাহ্মণ অধস্তন কর্মচারীদের হাতে না মারিয়া ভাতে মারে। ছাঁটাইয়ের তালিকা প্রস্তুত করিবার সময়ে সে উহাদের নামই আগে লিখিয়া দেয়।

কিন্তু মধুর আচরণে বা চরিত্রেও কি শ্রদ্ধা করিবার বিশেষ কিছু আছে? অর্থের জন্য সেও পিতৃপুরুষের চিরাচরিত সামাজিক আচরণ ও ধর্মকর্মাদি বিসর্জন দিয়াছে। উমাচরণ দত্তের মা মারা গিয়াছেন, সাহেবকে বলিয়া মধু তাহার ছুটির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে না। বরং সে ঐদিন যাহাতে উমাচরণের ছুটি না হয়, সেই ব্যবস্থা করিবে। কারণ, ঐদিন তাহার কোলের শালা খোকার বৌয়ের সাধ পড়িয়াছে, খোকা ও তাহার অন্য দুইজন বন্ধুর সেইজন্য ঐদিন ছুটি থাকিবে, সুতরাং উমাচরণকে ছাড়া যায় না। অমৃতলাল উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণকে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের লইয়াই, ব্যঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া অনেকে যে অভিযোগ করেন, তাহা ভুল। তাহা হইলে তিনি এই কলুর ছেলে মধুকে দেবতা করিয়া তুলিতেন। মধু টাকা আয় করিয়া চাকুরীর দ্বারা তথাকথিত গণ্যমান্য হইয়া উঠিতেছে, তাহার আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে চারিত্রিক উন্নতি বিশেষ কিছুই হয় নাই, বরং অবনতিই হইয়াছে, অমৃতলাল এই কথাই বলিয়াছেন। মধু অফিসের বড়-বাবু, কিন্তু দুর্বলচরিত্র 'বৌ-সর্বস্ব' জীব। সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী বড়বাবুর আত্মীয়-পোষণের দিকটিও অমৃতলাল তুলিয়া ধরিয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি একথাও বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ইংরাজের দয়ায় উচ্চপদ পাইয়া তথাকথিত বড়লোক হইলেও তাহাদের চরিত্র বা নীতিবোধের উৎকর্ষ কিছু হয় নাই। কারণ, গোলামীর দ্বারা অর্থই লাভ হয়, তাহার বাহিরে আর কিছুই হয় না। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে বরং 'রাধানাথ' নামক এক কর্মকার-পুত্রকে তিনি দেবতার আসন দিয়াছেন। সুতরাং অমৃতলালের আক্রমণ বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে নয়, কর্মবিমুখ, অলস, উদ্‌ভাবনী-প্রতিভারহিত, শ্রমমর্যাদাজ্ঞানহীন, চাকুরী-

প্রিয় বাঙালীর 'দাসমনোবৃত্তি'র বিরুদ্ধে, নহিলে নাটকের শেষ দৃশ্যে তিনি মধুর শ্বশুর স্বজাতিবৃত্তিক নীলমণি তালুকদারকে অত বড় করিয়া দেখাইতেন না। অমৃতলালের আপত্তি কোথায়? যে জাতীয়-ব্যবসায় ঘৃণ্য বৃত্তি বলিয়া মধু ছাড়িয়া দিয়া গোলামী করিতেছে, সেই কলুর ব্যবসায় অপহরণ করিয়া 'ঈশান বাড়ুয্যে' কল করিয়াছে এবং মধুর বাড়ীতেই তেল বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। যান্ত্রিকযুগে ঘানিগাছ ছাড়িয়া যদি তেলকলই করিতে হয়, আর ব্যবসায়ের মধ্য দিয়া যদি সত্য সত্যই বড় হওয়া যায়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা না করিয়া মধু কলু তাহা করিলে কি বেশী স্বাভাবিক ও সঙ্গত হইত না? অমৃতলালের ইহাই জিজ্ঞাস্য। কারণ, মধুর পক্ষে ঐ শিল্পে উন্নতি করা যত স্বাভাবিক, ঈশান বাড়ুয্যের পক্ষে ততটা নয়।

এই পারস্পরিক বৃত্তি-হরণের প্রচেষ্টায় ভারতীয় ব্যবসায়ী এবং শিল্পী সম্প্রদায়ের বংশানুক্রমিক উৎকর্ষ এবং স্বাভাবিক শিক্ষার পারিবারিক শিক্ষণ-কেন্দ্র নষ্ট হইতেছে। একজন ভট্টাচার্য-নন্দন হাজার চেষ্টা করিলেও কৃষ্ণনগরের একজন মূর্খ কুম্ভকারপুত্রের মতো প্রতিমা গড়াইতে পারিবে না বা উজিরপুর-কাঞ্চননগরের কর্মকারের মতো লোহার কাজ করিতে পারিবে না। পুরুষানুক্রমিকভাবে অনুশীলিত এই পারিবারিক শিক্ষণ-কেন্দ্রগুলি উপেক্ষা করিয়া আমরা দেশের শিল্পের মান-উন্নয়নের জন্য কারখানা স্থাপন করিতেছি। সেই কারখানার কার্য-পরিচালনার জন্য বিদেশ হইতে ডিগ্রি আনয়নের ব্যবস্থা করিতেছি, কিন্তু সে ব্যবস্থাও কাহাদের জন্য? যাহারা পুরুষানুক্রমিকভাবে শিল্পগুলি অনুসরণ করিয়া স্বাভাবিক দক্ষতা অর্জন করিয়াছে, তাহাদিগকে উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাইতেছি না। যাহাদের কৌলিক বৃত্তি ঐগুলি নয়, তাহাদের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ঐ কর্মগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে করিবার একটা স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা নাই। শুধু কোনোমতে একটা চাকুরী করিয়া দুইটা টাকা আয় করিবার জন্য যাহারা বিলাতে যাইতেছে, তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির ওজন করিয়া আমরা ধরিয়া ধরিয়া বিলাত পাঠাইতেছি। তাঁহারা প্রত্যেকেই এক-একটি Expert হইয়া বৃহস্পতিপুত্র 'কচ' হইয়া আসিতেছেন,—শিখাইতেছেন, কিন্তু প্রয়োগ করিতে পারিতেছেন না। যে শর্মামহাশয়ের চতুর্দশ পুরুষের মধ্যে কেহ জলে কাদায় নামিতে শিখেন নাই, তিনি বিলাতী ডিগ্রি লইয়া মহাকরণে কৃষি-অধিকর্তা হইয়া বসিয়া কাগজে-কলমে ধান-চাউল-আলু-মূলা-কচু ফলাইতেছেন, আর সোনার বাংলা দুর্ভিক্ষে, প্লাবনে, অজন্মায় শ্মশানে পরিণত হইতেছে। যে চাকুরীর জন্য

তিনি ঐ ডিগ্রিটি আনিয়াছেন, তাহা না হইলে অতখানি যোগ্যতা (?) থাকা সত্ত্বে নিজেও উপবাস করিবেন। অমৃতলাল এই ধরনের অর্থ ও শক্তির অপচয়ের নিন্দা করিয়াছেন। "বিলাতে এগ্রিকালচারল কেমিস্ট্রী, ভেটারিনারি, বুক কিপিং, ফারমিং, স্ট্রীমপ্লাউয়িং ইত্যাদি অনেক অনেক বিষয় শেখা হয়েছে বটে, কিন্তু লাঙল-ধরা, গরুর লেজ মলা, রোদ-জল খাওয়া, চাষার সঙ্গে বসা, ধুলোমাখা—এই সব আবশ্যকীয় বিষয়গুলি শেখা হয় নি, সেটি শিখতে গেলে বালককাল থেকে অভ্যাস করতে হয়, ছেলেবেলা থেকে ঐসব করতে করতে গায়ে ও প্রাণে এমনি সয়ে যায় যে, ক্রমে ওতে শরীরও খারাপ হয় না, আর মনে অপমানও বোধ হয় না, বরং ওর ভিতর সুখটুকু, যে নামটুকু, যে গর্বটুকু লুকান আছে, সেটির উপর দৃষ্টি পড়ে, তাই চাষা সন্ধ্যাবেলা মাটি মেখে ধানের বোঝা মাথায় ক'রে গান গাইতে গাইতে বাড়ি যায়, আর তোমার হেডক্লার্ক বাবু চাপকান পরে, ট্রামে চড়ে একেবারে দুনিয়ার উপর চটে যমকে নিমন্ত্রণ দিতে দিতে ঘরে ফেরেন।" [একাকার, ১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।]

তাহা হইলে চাকুরীজীবী উচ্চশ্রেণীর লোকের মনে সত্যকার শান্তি নাই, অমৃতলাল এ কথা বলিয়াছেন, তবুও বাঙালী এই চাকুরী বা কেরানীগিরি করিয়া যাইতেছে কেন? অমৃতলালের মতে ইহা তাহার চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচায়ক। কায়িক শ্রমকে বাঙালী অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেছে বলিয়াই আজ তাহার এইরূপ অধঃপতন ঘটিয়াছে। অমৃতলাল সেই অধঃপতনের চিত্র অতি নিপুণভাবে অঙ্কন করিয়াছেন প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে—

জুতার দোকান, মুচি ও মুচিনীগণ মনের আনন্দে গান করিতেছে। গানের বিষয়বস্তু লক্ষ্য করিবার মতো—কারিগরী, মুচিগিরি বড় ছোট কাজ, সুতরাং তাহারা আর এ ছোট কাজ করিবে না, 'থোড়া' ইংরাজী পড়িয়া তাহারাও বাবু বনিয়া যাইবে, ট্রামগাড়ী চড়িয়া তাহারাও গড়্ গড়্ করিয়া সাহেববাড়ী যাইবে, কলম চালাইবে এবং চামড়া সেলাই আর করিবে না, 'নেন্দ্ চামার'-এর নাম তখন 'নন্দবাবু' হইবে। গানটির মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। এই শ্রমজীবীদের মধ্যেও আপন-আপন বৃত্তিকে হীনজ্ঞান করিবার সংস্কার তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্য হইতে আসিয়া জুটিতেছে। অবশ্য কেরানী-জীবনের লাঞ্ছনার কথা ইহারা জানে। হয়তো ঠিক ঠিক কেরানী হইবার বাসনা ইহাদের নাই, কিন্তু ইংরেজীওয়ালা বাবুদের মতো সাজগোজ, কথা-বার্তায় তথাকথিত 'ভদ্রলোক' হইবার বাসনা ইহাদের মনে জাগিয়াছে। এই গর্ভাঙ্কের শেষের দিকে নন্দুয়া-চর্মকারের উক্তি লক্ষ্য করিবার মতো,

"হামলোক চাক্‌রী করবে না, কেরাণী হোবে না, লেকিন দুটো ইংরাজী পড়লে ইয়েস নো বুলি বোল্লে ভদ্দর হোয়ে যাবে, আর কেউ চামার বোল্‌বে না, বাবু বোল্‌বে।"

কিন্তু যাঁহারা ইংরাজী শিখিয়া বাবু হইয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থা এই অশিক্ষিত চামারদের চেয়ে অনেক শোচনীয়। কানফুঁড়ী মিস্ত্রী আসিয়া যখন দেখিল যে দোকানে গানের আসর বসিয়া গিয়াছে, তখন সে মুচি ও মুচিনী-গণকে ধমক দিয়া বলিল, 'তু লোক কাজকর্ম করবে না তো বসিয়ে বসিয়ে তলব দেবে নাকি? কামে গাফিলি কোল্লেই জবাব দেবে।' ইহাতে মুচি-মুচিনীগণ এতটুকুও ভয় পাইল না বা বিচলিত হইল না। গানেই জবাব দিল, 'এ কেয়া পাইছো কেরানী, দেখলাও চোখ রাঙনী, নকরী গেলে ডুকরি কেঁদে খেয়ে মরবে খাবি?' জবাব পাইলে ইহাদের কাজের অভাব হইবে না, ঘরে বসিয়াই ইহারা কাজ পাইবে। কানফুঁড়ী মিস্ত্রী অনুপায় হইয়া তোষামোদ করিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই কেরানী গদাধর দত্তের সহিত কানফুঁড়ী মিস্ত্রীর আলাপ লক্ষণীয়। গদাধর আসিয়া কানফুঁড়ীকে নমস্কার করিয়া বলিল, 'সেলাম মিস্ত্রী সাহেব।' নমস্কারের উত্তরে কানফুঁড়ীর উক্তি নিতান্ত অবজ্ঞাব্যঞ্জক। 'কি গো দত্তবাবু, এখন ঘুম ভাঙ্‌লো নাকি? ঘড়িটি দেখছো, কেত বাজছে?' দত্ত মহাশয় কানফুঁড়ীকে 'মিস্ত্রী সাহেব' বলিয়া সম্বোধন করিয়া অত্যন্ত বিনীতভাবে বলিল যে, গতরাত্রে তাহার ছোট মেয়েটির জ্বর হইয়াছিল বলিয়া সে সকালে ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছিল, তাই তাহার একটু দেরি হইয়াছে। কানফুঁড়ী মিস্ত্রী এই বিনীত কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য না করিয়া বলিল, 'বাবু, তুমি অন্য যায়গা দেখো।' বেকার কেরানীর চাকুরী গেলে আর মিলিবে না। তাই নিরক্ষর, শ্রমজীবী মুচিদের মতো জোর গলায় কথা বলিবার উপায় এই শিক্ষিত কেরানীটির নাই। সেইজন্য প্রত্যুত্তরে দুই কথা শুনাইয়া দিতে পারিল না।—তাই সে অতি কাতর ভাষায় অনুরোধ জানায়, 'রাগ করবেন না মশায়, আমার আজকের দিনটি মাপ করুন; দেখুন ছাপোষা মানুষ, আপনি যদি বিদেয় করে দেন, তাহ'লে একেবারে সপরি-বারে দাঁড়িয়ে মারা যাব।' কিন্তু এই অনুনয় শুনিবার কোনো প্রয়োজন কান-ফুঁড়ী মিস্ত্রীর নাই। কারিগর গেলে কারিগর মিলিবে না, তাই মুচিদিগকে রুক্ষ কথা বলিয়া আবার তোষামোদ করিয়া শান্ত করিতে হয়, কিন্তু কেরানী গেলে কেরানীর অভাব হইবে না, তাই গদাধর দত্তকে বিদায় দিতে কানফুঁড়ী মিস্ত্রীর আটকায় না।

ঘটিলও ঠিক তাই। একজন বেকার কেরানী রাস্তায় দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল। গদাধরের চাকুরী গেলে ঐ চাকুরীটি তাহার হইবে মনে করিয়া সে কানফুঁড়ী মিস্ত্রীর তোষামোদ সুরু করিল। লেখাপড়া শিখিয়া কর্মবিমুখ কেরানী সাজিতে গিয়া বাঙালী ভদ্রঘরের সন্তান শুধু মুচির তোষামোদ করিতেছেই না, দরকার হইলে দুই-এক জোড়া সাজ সেলাইও করিয়া দিতে চাহিতেছে। গদাধর দত্ত নিজেদের এই শোচনীয় পতিত অবস্থা বোঝে, কিন্তু অবস্থার হাতে সে নিরুপায়, সন্তুষ্টচিত্তে সে এ-কাজ করিতেছে না। কাজটিকে ঘৃণ্য জানিয়াই সে ব্যঙ্গ করিয়া বলে, 'মশায় আমি দত্ত, কায়েতের ছেলে হ'য়ে জুতোর বিল লেখা চাকুরী পর্যন্ত স্বীকার করেছি, আর মশাই যখন সেলাই পর্যন্ত উঠেছেন, তখন ফুলের মুখুটি না হ'য়ে যান কোথায়?' অমৃতলাল ব্রাহ্মণকে মূর্খ ভিক্ষুক বলিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে বিদ্যাবুদ্ধি সব কায়স্থের বলিয়া যাহারা অভিযোগ করিয়াছেন, আমি বলি, তাঁহারা বই না-পড়িয়া শুধু মলাট সমালোচনা করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। অমৃতলাল ব্রাহ্মণের অধঃপতনের চিত্র আঁকিয়াছেন সত্য, কিন্তু কায়স্থদেরও তিনি যে মোটেই বাদ দেন নাই, তাহা 'একাকার' নাটকের মধ্যেই দেখিতে পাই। অমৃতলাল মানুষকে জাতিতে জাতিতে ভাগ করিয়া দেখিয়াছেন, এ-কথা ঠিক সত্য নয়। বাংলার সর্ববর্ণের সামগ্রিক পতনের চিত্রই তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন।

শিক্ষিত কায়স্থ-সন্তান কেরানী গদাধর দত্তের দুরবস্থা এমন যে, শেষপর্যন্ত মিস্ত্রী নন্দুয়ার তোষামোদ করিয়া, তাহাকে ঘুষ দিয়া, চাকুরী বজায় রাখিবার ব্যবস্থা তাহাকে করিতে হয়। কানফুঁড়ী মিস্ত্রী কেরানীর কথা না-শুনিতে পারে, তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারে, কিন্তু 'নন্দুয়া'র কথা না-শুনিয়া পারে না, তাই নন্দুয়ার উমেদারীতে গদাধর দত্তের চাকুরী রক্ষিত হয়। শুধু তাহাই নহে,—কায়স্থ-সন্তান শুধু মুচির তোষামোদ করিয়া চাকুরীটি বাঁচাইতেছে না,—দত্ত মহাশয়ের দুর্ভাগ্য আরো অনেকখানি। কানফুঁড়ী মিস্ত্রীর একজন 'জানবিৎ মেয়েমানুষ' গদাধর দত্তের জন্য বলিয়াছিল বলিয়া কান-ফুঁড়ী মিস্ত্রী তাহাকে চাকুরী দিয়াছিল। 'নীলদর্পণ'-এ যেমন সাহেবকে ভগিনী দান করিয়া চাকুরী পাওয়ার কথা আছে, এখানেও কি ব্যাপারটি সেইরূপ? তাহা হইলে উদরান্নের জন্য বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান কতদূরে নামিয়াছে, অমৃতলাল তাহা দেখাইয়াছেন। যদি এই স্ত্রী-লোকটি গদাধর দত্তের কেহ না-হয়, তবে তাহার জন্য কানফুঁড়ীকে বলিতে আসিল কেন, তাহাও ভাবিবার বিষয়।

অমৃতলাল এই দৃশ্যে একজন ব্রাহ্মণকেও আনিয়াছেন। ব্রাহ্মণটি মূর্খ এবং জাত্যভিমানী। কিন্তু অমৃতলাল ইহাকে শুধু ব্যঙ্গ করেন নাই সমবেদনার মধ্য দিয়া এই ব্রাহ্মণের পারিবারিক জীবনের দুরবস্থার চিত্রও তিনি অঙ্কন করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ না-পারিতেছে যোগ্যতার সহিত নিজের প্রাচীন বৃত্তি যজন-যাজন-অধ্যয়ন-অধ্যাপনাদি আঁকড়াইয়া ধরিতে, না-পারিতেছে বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে, যুগ-সমস্যার এই দোটানায় পড়িয়া ত্রিশঙ্কুর মতো সে মধ্যপথে ঝুলিতেছে। সংস্কৃত বিদ্যাটাও সে ঠিক ঠিক শিখে নাই, অথচ ব্রাহ্মণত্বের ঠাট বজায় রাখিবার জন্য সে অশুদ্ধ এবং অর্থহীন শ্লোক আওড়াইয়া যাইতেছে। শান্ত, বিনীত, নম্র, উদার, ক্ষমাশীল ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও সে নিজের স্বার্থের এতটুকু ব্যাঘাত হইলেই যাহাকে-তাহাকে যখন-তখন ব্রহ্মশাপের ভয় দেখাইতেছে। বিষহীন ভুজঙ্গের ঐ নিষ্ফল আস্ফালনটুকুই এখন তাহার স্বার্থসিদ্ধির অস্ত্র। কিন্তু তাই বলিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া আমরা এই ব্রাহ্মণকে বিদায় দিতে পারি না। সে যখন বলে—"আমার টাকার দরকারটা বুঝলিনে, সংসারে খরচ কত জানিস্? এখন আর চাল-কলায় ভট্টাচার্য বামুনের চলে না; কনিষ্ঠ পুত্রটির জ্বর হয়েছে; ডাক্তারের হুকুম, এই দ্যাখ্ ব্যাটা, এক বাক্স বিষ্টেকুট কিনে নিয়ে যেতে হচ্ছে, মনে করিসনে ব্যাটা যে, এ বিষ্টেকুট খেলে জাত যাবে, এ হিন্দুর হাতের তৈয়ারী, কে. সি. বোস কোম্পানীর বিষ্টেকুট, শ্রীবিষ্ণু! এসব খরচ যোগাব কোথা থেকেরে ব্যাটা পাষণ্ড!" ইংরেজী সভ্যতার প্রভাবে সমাজের বাহিরের চাপ যে কত বাড়িয়া গিয়াছে এবং মানুষ আহারে-বিহারে, পোশাকে-পরিচ্ছদে বিদেশীর অন্ধ অনুকরণ করিয়া যে অকারণ কি করিয়া আর্থিক অনটন বাড়াইয়া তুলিতেছে, অমৃতলাল সামান্য কয়টি কথায় তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের লেখা একটি প্রসঙ্গ মনে পড়িয়া যায়। তিনি একবার কোনো গ্রামে এক কৃষকের বাড়ী অতিথি হইয়াছিলেন। গৃহস্থটি তাহার ম্যাট্রিকুলেশন পাশ পুত্রের জন্য একটি চাকুরী করিয়া দিতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে অনুরোধ করে। আচার্যদেব তাহাকে বলিয়াছিলেন, তাহার অবস্থা ভাল, পুত্রকে চাষ-বাসের তত্ত্বাবধান করিতে দিলে তো আরো ভাল হয়, চাকুরী করিয়া অতি সামান্য টাকা আয় করিয়া সে কী করিবে? উত্তরে আচার্যদেবকে শুনিতে হইয়াছিল যে, "সাংসারিক আয় থাকিলে কি হইবে, আজকাল ভদ্রতার চাল এমন বাড়িয়া গিয়াছে যে, অতিথিকে এখন চিঁড়া-গুড়-নারিকেল দিলে চলে না," রুটি-বিস্কুট-কেক-চা দিতে হয়। অমৃতলালও তো

ঐ একই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং অমৃতলাল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতো প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যিক ছিলেন বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে। তিনি আধুনিকতার অভিশাপের দিকটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই আঘাত দিয়া বাঙালীকে জাগাইতে চাহিয়াছিলেন। অমৃতলাল ছিলেন সত্যকার দেশ-প্রেমিক।

দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক। এই দৃশ্যের বিষয়বস্তু ও সংলাপ-সম্বন্ধে আপত্তির ঝড় উঠিয়াছে। এখানে কয়েকটী নারী প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে জাতি-তুলিয়া গালাগালি করিয়াছেন। কোনো কোনো সমালোচকের মতে জাতি তুলিয়া গালাগালি করিয়া হাস্যরস সৃষ্টি করিবার চেষ্টা অতি জঘন্য রুচির পরিচায়ক। সুতরাং তাঁহাদের মতে অমৃতলাল নিতান্ত দুষ্কর্ম করিয়াছেন। আমরা এই মতটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিতে পারিতাম যদি ঐ গালাগালিগুলি অমৃতলালের নিজের হইত, অর্থাৎ চরিত্র ও তাহার স্বাভাবিক পরিবেশ হইতে ঐ গালাগালিগুলি যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্ট না হইত। রবীন্দ্রনাথ 'রঘুনাথ রাও'এর মুখ দিয়া এক উত্তেজনার মুহূর্তে বলাইয়াছেন, 'চলেছি করিতে যবন নিপাত, যোগাতে যমের খাদ্য'; এই বাক্যটির প্রসঙ্গ-গত তাৎপর্য না বুঝিয়া এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক যেমন ইহাকে রবীন্দ্রনাথের মুসলমান-বিদ্বেষ বলিয়া চালাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছে, এই ধরনের সমালোচকেরাও তেমনি দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন। আমরা আমাদের মতো করিয়া বিষয়টির বিচার করিতে চেষ্টা করিব।

নিমতলা স্নানের ঘাটে কায়েত-গিন্নী ও বামুন-গিন্নীর আলাপ। বামুন-গিন্নী আজ অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছেন, তাঁহার ছেলেটি বহু কষ্ট করিয়া দুইটা পাশ দিয়াছে, কিন্তু কোথাও চাকুরী পাইতেছে না। গিন্নীর বাপের বাড়ীতে ছেলেবেলা এক নাপিতানী কাজ করিত। তাহার পুত্র এখন জজ হইয়াছে। বর্তমানে ছুটি লইয়া বাড়ী আসিয়াছে। বামুনগিন্নী ছেলের চাকুরীর জন্য ঐ নাপিতানীকে অনুরোধ করিতে চলিল, কিন্তু এই অনুরোধ কি প্রসন্নচিত্তে করা যায়? 'একদিন যাকে আলতা পরাতে পা বাড়িয়ে দিয়েছি,' পেটের দায়ে তাকেই খোসামোদ করিতে গিয়া কি চিরাচরিত মর্যাদাবোধ বা অহঙ্কার বিসর্জন দেওয়া যায়? বামুন-গিন্নীর কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়, ধোপা, নাপিত, কলু লেখাপড়া শিখিয়া বড় হইয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ইত্যাদির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে, ইহা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ প্রসন্নচিত্তে মানিয়া লইতে পারে নাই। যে হীনম্মন্যতাবোধ এতদিন চাপা ছিল, এখন তাহা আত্মপ্রকাশ করিল। যাহারা প্রতিবাদ না করিতে পারিয়া এতদিন শুধু উচ্চদের ঘৃণাবিদ্বেষ বিধাতার দান বলিয়া সহিয়া

গিয়াছে, সুযোগ বুঝিয়া আজ তাহারা ও প্রতিদানে ঘৃণা-বিদ্বেষ শুরু করিয়া দিল। রবীন্দ্রনাথের 'দুর্ভাগা দেশ' যাহাদের অপমান করিয়াছে, মহাকালের শাসনে সেই অপমানিতদের সঙ্গে অপমানকারীরা আজ সমান হইতেছে। ইহারই জঘন্যতম পরিণতিই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এবং ভারতবিভাগ নয় কি? হিন্দু কোড বিল পাশ করিয়া এবং অস্পৃশ্যতা-নিবারক আইন করিয়া জাতির এই জন্মার্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টা করা হইতেছে না কি? অবশ্য এই আইনগুলির ফলাফল-সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতেছি না।

সংস্কার মরে না। বামুন-গিন্নী জজ-সাহেবের বাড়ী গিয়া চিরন্তন অভ্যাসবশতঃ তাঁহার মাকে 'নাপ্তে-বৌ' বলিয়া ডাক দিলেন। ইহার স্বাভাবিক ফল বামুন-গিন্নী নিজেই বর্ণনা করিতেছেন, 'দুমাগী দাসী তো থালি আমায় মারতে বাকি রাখলে।' অমৃতলাল যাহা স্বাভাবিক, তাহাই লিখিয়াছেন। ইঁহারা চিরদিন 'নাপ্তে-বৌ', 'ধোপা-বৌ' বলিয়া ডাকিতেই অভ্যস্ত। পণ্ডিত অমুকচন্দ্র ভট্টাচার্য দেবশর্মার স্ত্রীকে 'বামুন-বৌ' এবং জমিদার অমুকচন্দ্র ঘোষ চৌধুরীর স্ত্রীকে 'কায়েত-বৌ' বলিয়া ইঁহারা কোনোদিনই ডাকেন নাই। যদি ডাকিতেন তাহা হইলে 'নাপ্তে-বৌ' ডাক শুনিয়াও জজ-নাপিতের মা চটিয়া যাইতেন না। জজসাহেব যে তাঁহার সঙ্গে নিতান্ত অভদ্র ব্যবহার করিয়াছেন এমন বলিতে পারি না। তিনি তখন চাকুরী দিতে পারিতেছেন না। তাই তিনি বলিলেন, 'এখন তো কাজকর্মের সুবিধে নেই; তবে যদি আমার সঙ্গে থাকে, রাত্রে কাগজ-পত্র নকল করবে, দুটি ছেলেকে পড়াবে, আর বাসায় রাঁধবে, তাহলে পনের টাকা করে মাসে দিতে পারি'। অমৃতলাল এখানে সুকৌশলে একটি কথা বলিলেন। এতদিন যাহাদের নিতান্ত ছোটলোক এবং দাসতুল্য কৃপার পাত্র মনে করিয়াছ, আজ অদৃষ্টের তীব্র পরিহাসে তাহারাই তোমাদিগকে দাস করিবার চেষ্টা করিতেছে। বামুন-গিন্নীর মতে ইহা নিতান্ত অন্যায়। 'সত্যই কি এত ধর্মে সইবে!' আর একজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মশাপের ভয় দেখাইয়া নিরপেক্ষ কেরানী গদাধর দত্তকে বলিয়া গেলেন, জুতার দোকানের কেরানীগিরিটি সে কায়স্থ হইয়া কেন একজন ব্রাহ্মণকে ছাড়িয়া দিতে পারিল না।

ওদিকে আবার কলুবৌ দুইদিনের বৈরাগী সাজিয়া "ভাতকে" "প্রসাদ" বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। গঙ্গাস্নানে আসার পথে কাঁকরগুলি তাহার পায়ে খুব বিঁধিতেছে। 'বিশুর মা' নাম করিয়া তাহার একটি চাটুকারিণীও জুটিয়া গিয়াছে। সত্যকার বড় হইলে মানুষ বিনীত হয়, উদার হয়। উচ্চবর্ণের লোক-গুলি গোলামী করিতে আসিয়া যেমন সত্যকার বিরাটত্ব ও মনুষ্যত্ব একে বারে

হারাইয়া বসিয়াছে, তেমনি সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকগুলিও শিক্ষা-দীক্ষা-চাকুরী পাইয়া চরিত্রগত মহনীয়তা লাভ করে নাই ; উদারচেতা চরিত্রবান্ দেবতা হয় নাই। কতগুলি চাল বাড়াইয়া দিয়া তাহারা বাহিরে বড় সাজিবার চেষ্টা করিতেছে। কলু-বৌ—ধোপা-বৌ-এর আচরণে সেই হীনতাজনিত মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি হইতেছে। আবার, মজার কথা এই যে, শুধু যে কায়স্থ-ব্রাহ্মণেরাই এই ধোপা-নাপিত-কলুদের অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে এবং ঈর্ষ্যার দৃষ্টিতে দেখিতেছে, তাহাই নহে। ইহারা নিজেরাও পরস্পরকে ভাল চোখে দেখিতেছে না। হীনম্মন্যতা ও দুর্বলতার বীজ সমাজের সর্বস্তরে সমান ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ধোপা-বৌ এবং কলু-বৌ-এর জঘন্য আলাপে তাহা মূর্ত হইয়াছে।

এখন আমাদের কায়স্থ-গিন্নীর উক্তি উদ্ধার করিয়া বলিতে হয়, 'জাত-মহিমা কি নেই !' এইরূপ জাত তুলিয়া গালাগালি করার প্রথা বাংলা-দেশে চিরাচরিত কি না। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব, যাঁহার মতে 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি-পরায়ণঃ' তিনিও সহপাঠী মুরারি গুপ্তকে জাত তুলিয়া গালাগালি করিয়া বলিয়াছিলেন 'লতাপাতা লৈয়া গিয়া রোগী দৃঢ় কর।' বরিশালের উচ্চশিক্ষিত কায়স্থ-ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-সন্তানেরা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন, 'নে আর নাপ্‌তালি করিস্‌নে।' কথাটি পরের কানে শোনা নয়। গত নির্বাচনের সময়ে শুনা যায় বরিশালেরই এক 'প্রতাপ'শালী কায়স্থ-জমিদার প্রকাশ্য সভায় দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, 'লেফ্‌টিষ্ট পার্টিকে ভোট দিতে হবে, তারা কোন্ নাপিত ?' এ সম্বন্ধে রাজ্য-সরকারের নিকট লিখিত প্রতিবাদ জানানো হইয়াছিল। কলিকাতার শ্রেষ্ঠতম মহাবিদ্যালয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে ভাঙা হাঁড়ি-কলসী আঁকিয়া রাখিয়া একজন অধ্যাপককে ব্যঙ্গ করিয়া লেখা হইয়াছিল, 'যার যা সাজে।' ইহা অপরাধ হইতে পারে, জঘন্য রুচির পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু মিথ্যা নয়। অমৃতলাল এই জ্বলন্ত সত্যটিকে স্বাভাবিক মহিমায় রূপায়িত করিয়াছেন। তাঁহাকে অকারণ নিন্দা না করিয়া আমাদের আপনার মুখ আপনি দেখিয়া সতর্ক হওয়া উচিত ছিল।

তবে অমৃতলালের ত্রুটিও এ বিষয়ে কিছুটা আছে। সে ত্রুটি সমাজের প্রতিনিধি-হিসাবে নয়, সাহিত্যিক-হিসাবে। তাঁহার সৃষ্ট পাত্রপাত্রীর মুখে আক্রমণের ঝাঁজটা অনেকখানি তীব্র হইয়াছে। মধুবাবু পীতাম্বরকে বলিলেন, 'আর বাল ঠাকুর, পরের চাকরী কত্তে গেলে এত বামনাই পোষায় না, পুজো-আহ্নিক-ফাহ্নিকগুলো রবিবারে কল্লেই হয়......পুজোফুজো ভট্টাচার্যগিরি এখন শিকেয় তুলে রাখ, পেন্সেন হ'লে তখন যা হয়

করবে।' কথাগুলি মধুর পক্ষে বলা অস্বাভাবিক হয় নাই। মধু জানে, ঐ পূজা-আহ্নিক বা ধর্মের আচার-আচরণ তাহাকে মানুষের মর্যাদা দিতে পারে নাই। ইংরেজের দয়ায়, অর্থের কল্যাণে সে এখন বড়-বাবু, কাঞ্চনকৌলীন্যের অধিকারী। সুতরাং চাকুরী বজায় রাখিয়া পেনসন পাইলে আহ্নিকাদি পরে করিলেও চলিবে, সেই কথাই সে পীতাম্বরকে বুঝাইয়া দিতে চায়। কিন্তু ইহাতে পীতাম্বরের ব্রাহ্মণ্য-সংস্কারে আঘাত লাগিল, লাগিবারই কথা, কিন্তু মধুকে "আপনার শরীরে নির্জলা কলুর রক্ত বিদ্যমান; প্রকৃষ্ট ঘানি নক্ষত্রে বলদ রাশিতে আপনার জন্ম" প্রভৃতি বলা নেহাৎ অতিরিক্তই হইয়াছে। "কলু বড়বাবু, তোমার সাহেব বাবাকে ব'লো যে পীতাম্বর মুখুয্যে আর কলম ছুঁচ্ছেন না।" প্রভৃতি উক্তি অশোভন গালাগালিই হইয়াছে। পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় চাকরী ছাড়িলেন। সুতরাং অমৃতলালের বিচারে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণই কেরানীগিরির গোলামী প্রথম ত্যাগ করিয়া অন্যান্য বর্ণের আদর্শ হইয়া রহিলেন। উপায়ান্তর না-দেখিয়া অন্যান্য কেরানীরাও পীতাম্বর মুখার্জীর অনুসরণ করিল। যাদব চাকুরী না পাইয়া তথাকথিত দেশভক্তের সংখ্যা পূর্ণ করিতে ছুটিয়া গেল। কিন্তু ইহাতে কি সত্যকার সমস্যার সমাধান কিছু হইল? ব্যবসায়ী সম্প্রদায় চাকুরী না করিয়া কৌলিক বৃত্তি অবলম্বনে ব্যবসায় করিলে, দেশের কৃষি-শিল্পের উন্নতি হইবে না হয় বুঝা গেল, কিন্তু কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় তো ব্যবসায়ী নহেন; তাঁহাদের সম্মুখে কোন্ স্বাধীন বৃত্তি অমৃতলাল তুলিয়া ধরিয়াছেন? বাঙালীর জাতীয় জীবনের দুরবস্থার চিত্র তিনি সুন্দরভাবে আঁকিয়াছেন সত্য, কিন্তু সমাজের সর্বস্তরের লোকের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তিনি কিছু দেখাইতে পারেন নাই। শক্তিমান্ লেখক শুধু বর্তমানের দোষত্রুটি ধরিয়া গালাগালিই করিবেন না, তিনি ভবিষ্যৎ উন্নতির পথও দেখাইবেন। অমৃতলাল শুধু বর্তমানের অন্ধকার রূপই দেখিয়াছেন, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বর্ণযুগ সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। পারেন নাই বলিয়া তাঁহার সৃষ্টি কিছু অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভুল খুব কমই আছে। সমাজের অধোগতি তিনি ঠিকই লক্ষ্য করিয়াছেন, লক্ষ্য করিয়া তিনি জাতিকে সাবধান করিয়াছেন, তাহার বেশী তাঁহার কিছু করার ছিল না।

দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্কের একেবারে শেষের দিকে মধুর উক্তি লক্ষ্য করিবার মতো। "এই তোর মুখও আমি বন্ধ কচ্ছি, জেতের খোঁটা ঘোচাচ্ছি, হয় খৃষ্টান, নয় ব্রহ্মজ্ঞানী হব, তবে ছাড়ব! এখনই নীচের কোর্টে গিয়ে

এফিডেবিট ক'রে যাচ্ছি যে, আমার সাধুখাঁ পদবী বদলে আজ থেকে ব্রহ্মানন্দ পদবী নিলুম, আর সাহেবের হাতে পায়ে ধ'রে সার্ভিস্ ব'য়ে আর গ্রেডেশন্ লিষ্টে সাধুখাঁ কাটিয়ে ব্রহ্মানন্দ ক'রে নেব, আজ থেকে মধুসূদন সাধুখাঁ নয়, মধুসূদন ব্রহ্মানন্দ।" কলুর ছেলে ক্ষমতার বলে জজ-হাকিম হইলেও সে জানে যে তাহাকে অন্তরে অন্তরে কেহই অভিজাত-সন্তানের মর্যাদা দেয় না। কারণ, ভারতবর্ষ এমনই দেশ, যেখানে এখনও শূদ্রই হও, আর কৃতবিদ্যই হও, 'যস্মিন্ কুলে ত্বমুৎপন্নঃ' খোঁটা তোমাকে শুনিতেই হইবে। সুতরাং নিম্নশ্রেণীর লোকেরা লেখাপড়া শিখিয়া ভদ্র হইলেও গা-বাঁচাইবার জন্য কেহ কেহ উচ্চবর্ণের উপাধি নকল করিতে লাগিল, অনেকে ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া অমর্যাদার হাত হইতে রক্ষা পাইল। ইহাতে তাহাদের হীনম্মন্যতা-বোধের চেয়ে অবশ্য সমাজের ঘৃণাই বেশি দায়ী। অমৃতলাল ভুল দেখেন নাই। বর্তমান স্বাধীন ভারতেও কি ইহার এতটুকু পরিবর্তন হইয়াছে? কত 'মাঝি' মজুমদার হইয়াছেন, কত 'মিস্ত্রী' 'মৈত্র' বা 'মিত্র' হইলেন, কত 'কীর্তনীয়া' 'রায়' সাজিলেন বা কত 'রায় বেঁশে' উপাধির থেকে বাঁশের অংশ ত্যাগ করিলেন, তাহার হিসাব আমরা অনেকেই রাখি না। অমৃতলাল ইহার খোঁজ রাখিতেন এবং কারণটিও জানিতেন।

অমৃতলালের অন্যান্য অনেক নাটকের মতো এই নাটকখানির সম্বন্ধে একটি প্রধান আপত্তির কথা আমরা আলোচনা করিব। অনেকে অভিযোগ করিয়াছেন, অমৃতলালের নাটকে চরিত্র বলিয়া বিশেষ কিছুই নাই। কাহিনীরও কোনো সুসংবদ্ধ রূপ পাওয়া যায় না। তাঁহার রচনাকে নাটক বা প্রহসন কিছুই বলা যায় না, বড় জোর ঐগুলিকে নক্সা শ্রেণীতে ফেলা যায়। এ সম্বন্ধে আমার দুই একটি কথা বলিবার আছে। দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ"ও নাটক নয়, নাট্যচিত্র। তাই বলিয়া নীলদর্পণের মূল্যও উপেক্ষণীয় নয়। দীনবন্ধু নীলকরের অত্যাচারটুকু ঠিকই দেখাইতে পারিয়াছেন। তবে মাত্রা একটু বাড়িয়া গিয়াছে। অমৃতলালের এই নাটকে কোনো বিশেষ ব্যক্তির জীবন বা চরিত্রকে রূপ দান করা হয় নাই। গোটা সমাজের একখানি সামগ্রিক চিত্র তিনি অঙ্কন করিয়াছেন। সমাজের প্রত্যক্ষ বাস্তব রূপ তিনি আঁকিয়াছেন। তবে যদি ইহার সহিত কাহিনী ও চরিত্রের অপূর্ব সমাবেশ তিনি করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তাঁহার রচনা মলিয়ারের সৃষ্টির ন্যায় অপূর্ব হইত। অমৃতলালের আদর্শ অবশ্যই ছিলেন মলিয়ার। কিন্তু মলিয়ারের ন্যায় সৃজন-ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। তবে ইহার আগে যাঁহারা মলিয়ারকে অনুসরণ

করিয়াছেন, তাঁহাদের থেকে অমৃতলাল কাহিনী ও চরিত্রসৃষ্টিতে যে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছিলেন, একথা স্বীকার না-করিলে অমৃতলালের প্রতি অবিচার করা হইবে। 'গ্রাম্য বিভ্রাট' নাটকে অমৃতলাল মলিয়ারের কাছাকাছি গিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয়। 'গ্রাম্য বিভ্রাট' অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ রচনা। প্রহসন-হিসাবে 'তিলতর্পণ' ও 'বাহবা বাতিক' বাংলা সাহিত্যে অবশ্যই গৌরবের আসন দাবি করিতে পারে। এই বই কয়খানির আলোচনা করিলেই অমৃতলালের প্রতিভার মোটামুটি দিগ্‌দর্শন করা হইবে।

গ্রাম্য বিভ্রাট

'গ্রাম্য বিভ্রাট' নাটকের সূচনায় স্ত্রী-পুরুষগণের দ্বৈত গীতিটি লক্ষ্য করিবার মতো। সমগ্র নাটকটির ভূমিকা-হিসাবে গানখানিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। দেশপ্রেম, গ্রামোন্নয়ন, সমাজ-সংস্কার সব কিছুর নামে যে অকারণ হুজুগের খেলা চলিতেছে, কাজের কাজ কিছুই হইতেছে না, অমৃতলাল ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যঙ্গ-কবিতার 'নন্দলাল'কে অমৃতলাল ঘরে ঘরে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। যাঁহারা 'দেশের কাজে' প্রাণপণ করিয়া লাগিয়াছেন, তাঁহারা এমনই কর্মী যে নিজেদের ছোট সংসারটুকু চালাইবার যোগ্যতাও তাঁহাদের নাই। এই ভবঘুরেদের দ্বারা দেশোদ্ধার কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? 'ভারতমাতা'র উদ্ধারের জন্য যাঁহারা 'চাঁদার খাতা' খুলিয়া বসেন, তাঁহাদের গর্ভধারিণী জননীর সম্বল 'ছেঁড়া কাঁথা' ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইঁহারা দেশের প্রিজুডিস্ দূর করিয়া সমাজসংস্কার করিতে অগ্রসর হইয়াছেন, সেইজন্য বিধবা-বিবাহের জন্য ইঁহাদের সমবেদনার অন্ত নাই। কিন্তু ইঁহাদের ঘরে বয়স্কা কুমারীরই বিবাহ হইতেছে না। যে চরিত্রবল ও কর্মনিষ্ঠা থাকিলে একটা জাতির জাগরণ আনা সম্ভবপর হয়, বাঙালীর জীবনে অমৃতলাল তাহার অভাব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। জাতি যখন কোনো মহত্তর আদর্শের প্রেরণায় জাগিয়া উঠে না, কল্যাণৈকব্রতী, নিয়ন্ত্রিতচরিত্র নরদেবতার বাস্তব জীবনকে জীবন দিয়া অনুসরণ না করিয়া জাতি যখন কেবলমাত্র হুজুগে মাতিয়া উঠে, তখন কল্যাণের নামে নবতর অকল্যাণেরই সূচনা হইতে থাকে। ঐ ভাবোদ্বেল উন্মাদনার সুযোগে প্রবৃত্তিস্বার্থী শয়তানের দল আত্মপ্রতিষ্ঠায় তৎপর হইয়া কপট বুলি ও প্রতারণাপূর্ণ কর্মের দ্বারা জনগণকে ফাঁকি দিয়া নিজেদের কাজ হাসিল করিয়া লয়। বচনবাগীশতা তাহাদের যাহাই থাকুক না কেন, পরস্পরের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত বাধিলে তাহারা যে-কোনো হীন আচরণ অবলম্বন করিতে পারে। তাহাতে কল্যাণের নামে প্রকৃত অকল্যাণ দেখা দেয়।

ব্যক্তিগত ক্ষমতা, মনুষ্যত্ব ও মর্যাদার নামে চলিতে থাকে পারস্পরিক দুর্বলতা ও হীনম্মন্যতার খেলা। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সর্বসাধারণের কল্যাণ হইবে বলিয়া তখন ইলেক্‌সন করিতে গিয়া টাকার জোরে বা লাঠির তোড়ে মোড়ল সিলেক্‌-সন হয়। 'ম্যাড়াপাড়া মিউনিসিপ্যাল্‌ ইলেক্‌সন্‌'কে কেন্দ্র করিয়া কেমন করিয়া এমনি ধরনের অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল, অমৃতলাল তাহাই দেখাইয়াছেন।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে অমৃতলাল মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনকে ব্যঙ্গ করিয়া প্রকৃত গণতন্ত্র-বিরোধী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন; যুগের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়া তিনি গণমুক্তির এবং জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের বন্দনাগান করিতে পারেন নাই; সুতরাং তিনি ছিলেন প্রকৃত প্রগতিবিরোধী। কথাটি ঐ ভাবে ধরিলে চলিবে না। আধুনিক democracyর (গণতন্ত্রের) hypocrisy (কপটতা) টুকু ধরাইয়া দিলে যদি প্রগতিবিরোধী হইতে হয়, তাহা হইলে জর্জ বার্নার্ড্‌ শ হইতেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ প্রগতিবিরোধী, কিন্তু তাহা নহে। অমৃতলাল বলিয়াছেন, ইহারা দেশের জন্য বা জনকল্যাণের জন্য দেশ-প্রেমিক সাজে নাই, ইহারা চায় ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা। তাই নিজেরাই কর্তা সাজিতে চায়, কর্তৃত্ব অন্য কাহাকেও দিতে রাজী নয়, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারির মূল কারণ ঐ। কোনোক্রমে গদি যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহারা যে কোনো মুহূর্তে দেশ-প্রেমের মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া দেশদ্রোহী হইতে পারে। এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে বিজয়ের উক্তি এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

কথা হইতে পারে, ভারতবর্ষে গণতন্ত্রী আন্দোলন বা জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের মধ্যে কি সত্য সত্যই আপ্রাণতার অভাব ছিল? দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাত্মা গান্ধীর জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে কি অমৃতলাল মহত্ত্বের সন্ধান পান নাই? পাইয়াছিলেন বলিয়াই তো তিনি 'নবজীবন' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। অবশ্য নাটক হিসাবে উহা কতখানি ভাল হইয়াছে বা মন্দ হইয়াছে, সে অন্য কথা। তবে তিনি বাঙালী-জীবনের যে বিশেষ দুর্বলতাগুলি লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন, তাহা এতটুকুও মিথ্যা নহে। মিথ্যা হইলে আজ বাংলাদেশের, তথা ভারতবর্ষের রূপ অন্যপ্রকার হইত। আজ যে দুর্নীতি সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনকে জর্জরিত করিয়াছে, বহুদিনের সঞ্চিত দুর্বলতা-হিসাবে তাহা আমাদের জাতীয়-জীবনেই ছিল; হঠাৎ 'উড়ন্ত চাকি'র মতো শনি-মঙ্গল গ্রহ হইতে বঙ্গদেশে বা ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয় নাই। দূরদ্রষ্টা অমৃতলালকে ধন্যবাদ দিতে হইবে এইজন্য যে, তিনি ভাবের বন্যায় ভাসিয়া

না গিয়া সত্যের নির্মমরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া জাতিকে আঘাত দিয়া জাগাইতে চাহিয়াছিলেন।

নাটকখানির বিশ্লেষণ

বিজয়, উপেন, সত্য, গোপাল প্রভৃতি ম্যাড়াপাড়ার কয়েকজন যুবক কর্মী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, হরিসভা ও ব্রাহ্মসমাজের 'অ্যানিভার্স্যারি' পর পর পনের দিনের মধ্যে উদ্‌যাপন করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজ অ্যানিভারসারিতে আচার্য বামনদাস মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করিতে আসিবেন। কিন্তু চিঠি আসিল বামনদাসবাবুর ছোট খুকীর অসুখ বলিয়া তিনি আসিতে পারিবেন না, কন্যার শুশ্রূষার কাজ তাঁহাকে নিজে করিতে হইবে, আর কন্যার মাতা বামনদাস বাবুর ধর্মপত্নী প্রমদাসুন্দরী মুখার্জি (আধুনিক সভ্যতায় হয়তো কন্যার শুশ্রূষার জন্য মায়ের দায়িত্ব নাই বলিয়া) এই সভায় নেতৃত্ব করিতে আসিবেন। প্রমদাসুন্দরীর এই আগমনের পিছনে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লেখকের যে কটাক্ষটুকু আছে, ইঁহাদের কেহই সেদিকে লক্ষ্য করেন নাই। একজন বিদুষী মহিলা সভানেত্রী হইয়া আসিবেন বলিয়া ইঁহারা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "থ্রি চিয়ার্স ফর্ প্রমদাসুন্দরী।" এই চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া মাণিক নামক একটি মাতাল হঠাৎ মত্তভাবে প্রবেশ করিল। মাণিক মাতাল হইলেও তাহার মধ্যে সত্য সত্য প্রাণ আছে। নাট্যকার মাণিকের মাতলামি ও রহস্যপ্রিয়তার মাধ্যমে নিজের বিশিষ্ট ধারণা-ভাবনাগুলিই ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এই উক্তিগুলি মাণিকের চরিত্রের সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে মিশাইয়া দিতে পারিয়াছেন যে, ঐগুলি নাটকের চরিত্র-ও-সংলাপ-নিরপেক্ষ প্রচারবাদে পর্যবসিত হয় নাই। নাটকের বিভিন্ন চরিত্র ও কাহিনীর মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করার জন্য এই নাটকে মাণিকই অতি প্রয়োজনীয় চরিত্ররূপে দেখা দিয়াছে। মাণিক অশিক্ষিত, মাতাল, কিন্তু তাহার একটা গুণ আছে; সে ভাল গান করিতে পারে। সভায় গান করিবার জন্য ছাই ফেলিতে ভাঙ্গাকুলার মতো তাহার ডাক পড়িয়াছে এবং দুইটি সভার বার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য বর্তমানে তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়াছে। কিন্তু চরিত্র হইতে মাতলামীর অংশটুকু সে বাদ দিতে পারে নাই, তাই প্রমদাসুন্দরীর জয়োল্লাস শুনিয়া সে মনে করিয়াছিল, গ্রামের ঐ যুবক ছেলেরা বুঝি কোন নারীকে লইয়া আমোদ করিতেছে, সেই আমোদে অংশ গ্রহণ করিতে সে আসিয়া জুটিয়াছে। তাহার অভিযোগটি চমৎকার! 'বলি প্রমদাসুন্দরী ব'লে গাঁ গাঁ করে থ্রি চিয়ার্স পাড়ছিলে, আর আমি এসেছি, অমনি মেয়েমানুষটি সরালে বাবা!' নারী-সম্বন্ধে একটু দুর্বলতা তাহার আছে।

কোনো এক বিধুমুখী তাহাকে আগেই মুগ্ধ করিয়াছে, কিন্তু সে দুর্বল দুশ্চরিত্র মদ্যপ নয়। সে রহস্যপ্রিয় এবং উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন। 'সেক্রেটারী, ম্যাড়াপাড়া লাইব্রেরী'র নামে একখানা টেলিগ্রাম বিলি করিয়া পিওন কিছু বকশিস্ পাইবে। পিওনকে ফাঁকি দিবার জন্য মাণিক কৌশল করিল। 'আমার টেলিগ্রাম আসবার কথা ছিল' বলিয়া মাণিক টেলিগ্রাম কাড়িয়া লইয়া পড়িয়া ফেলিল এবং সঙ্গে সঙ্গে 'মাসীগো!' বলিয়া চীৎকার করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। পিওন অবস্থা প্রতিকূল দেখিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে দিতে প্রস্থান করিল। আসলে ব্যাপার কিছুই নয়। পিওনকে ফাঁকি দিবার জন্য ইহা মাণিকের কৌশলমাত্র। সত্য, বিজয় প্রভৃতি সকলেই ব্যাপারটিকে একটা মস্ত দুর্ঘটনা বা মাণিকের মাসী'-বিয়োগ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। কিন্তু চক্ষু মেলিয়া মাণিক যে ভাষায় কথা বলিল, তাহার মধ্য হইতে এই কৌতুক-সৃষ্টির মিথ্যাটুকু ধরিয়া ফেলা সম্ভবপর হইল। মানুষ যদি সত্য সত্যই আত্মীয়-বিয়োগে শোকার্ত হয়, তাহা হইলে সে কি প্রিয়জনের মৃত্যু-প্রসঙ্গ লইয়া ব্যঙ্গ করিতে পারে? মাণিক বলিতেছে, "ওগো মাসী আমার কাশী থেকে আসছিলো গো!...ওরে ভাই বিধবা মানুষকে সন্দ কোরে জংসনে আটকে ফেলে দিলে .....মহাশয় সেখানে লঙ্কা দিয়ে ছাতু খেয়ে তাঁর ন্যাচারেল ফাংসন বাড়ে। .....বেলেস্তারা দিতে না দিতেই মাসী আমার ভূতপূর্ব মেসো মহাশয়ের সঙ্গে কনজংসন হয়ে যায় গো। এখন আমার যে ভারী ইনটারজেকসন! আঃ ওঃ! এলাস! হায়! হায়! হা শকুন্তলা! হা মহাশ্বেতে! (সুরে) হারে রে রে রে উঠরে কানাই!" মাণিকের শেষের কথাগুলি শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল, ব্যাপারটি তামাসা। বিজয় বলিল, 'অ্যাঁ মাতলামো!"

মাণিক-চরিত্রের মধ্য দিয়া নাট্যকার ঘটনাকে চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন।

টেলিগ্রামের খবরে জানা গেল, ম্যাড়াপাড়া স্বাধীন মিউনিসিপ্যালিটি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। যুবক কর্মীদের আনন্দের সীমা নাই। "স্কুল, লাইব্রেরী, গারল্ স্কুল, হরিসভা, ব্রাহ্মসমাজ, দাতব্য ভাণ্ডার", সকলই তাহাদের। আর ম্যাড়াপাড়াকে পায় কে!" সুতরাং তাহারা পরমোৎসাহে নির্বাচনে মাতিয়া উঠিল। কিন্তু প্রাচীনদের মধ্যে এ বিষয়ে উৎসাহ তেমন দেখা দিল না। গ্রামের পণ্ডিত রমানাথ স্মৃতিরত্ন কিন্তু ব্যাপারটিকে মোটেই ভাল চোখে দেখিতে পারিতেছেন না। কারণ, মিউনিসিপ্যালিটির কুফল সম্বন্ধে তাঁহার তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। "গ্রামে মুন্সিপাল হবে, একেবারে সবে আহ্লাদে

আটখানা। টেক্সর জ্বালায় যখন হাড়ের ছাল ছাড়াবে, তখন বুঝতে পারবেন! কলকাতায় হাতীবাগানে দাদার টোলে দিন কতক থেকে মুন্সীপালের তাড়ায় লোকের হাড়ির হাল আমি বিলক্ষণ দেখে এসেছি।"

স্মৃতিরত্নকে আমরা প্রগতিবিরোধী এবং সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনপন্থী লোক বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি না। কারণ, স্মৃতিরত্ন যুক্তির বাহিরে কথা বলেন না। ট্যাক্স্ দিতে হইবে বলিয়াই যে স্মৃতিরত্ন মিউনিসিপ্যালিটি অপছন্দ করিতেছেন, তাহা নহে, মিউনিসিপ্যালিটির দ্বারা লোকের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশী হইতেছে। "রায়েরা মশাই গেল বছর প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা খরচ কোরে একখানি বাড়ী তৈয়ারী কল্লে...দু'বার দু'জায়গায় পায়খানা করালে আর ভাঙ্গালে ... ... দশ কাঠা জমির ভিতর রাস্তাবন্দী বড় বাবুর রুচির মতো পায়খানা আর হ'ল না।" গ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য এই সকল অসুবিধা মানিয়া লইয়াও মিউনিসিপ্যালিটিকে বরণ করা উচিত কিনা? স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের মতে ভারতবর্ষের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বিলাতী-ধরনের নগর-পত্তনে স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া অবনতিই হইবে। তাহাছাড়া ভারতবর্ষ স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য গৃহস্থের নিত্যকর্ম-হিসাবে ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা যে কর্তব্যগুলি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল, তাহা হইতে স্বাস্থ্যরক্ষার ভাল রীতিনীতি আর হইতেই পারে না। "আমাদের গ্রাম্য মুন্সীপালের শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থাটা দেখ—টেক্স নাই অথচ সকল কার্য যেন আপনা আপনি নির্বাহ হয়। প্রত্যেক গৃহস্থের উপর বিধি যে, অতি প্রত্যুষে সমস্ত গৃহ মার্জনা করে আবর্জনা দূরে কোনো গর্তে বা মাঠে ফেলবে; ক্ষেত্রের আবর্জনা সময়ে সারে পরিণত হয়, তারপরে প্রাঙ্গণে গৃহদ্বারে গোময়-জল সিঞ্চন করবে, কলিকাতায় যে সব দুর্গন্ধহারী বিলাতী আরক-চূর্ণাদি বাহির হ'য়েছে, তার দুর্গন্ধ অপেক্ষা গোময়ের গন্ধ কিছু অধিকতর তীব্র নয়; তারপর গৃহে ধুনার ধূপ দিবে, সায়ং-কালেও আবার ধুনার ব্যবস্থা!......প্রত্যেক হিন্দুর গৃহেই দেবসেবার জন্য পুষ্পবাটিকা ও তুলসীবৃক্ষ রক্ষার ব্যবস্থা; শুনেছি, আজকাল তোমাদের ডাক্তারেরাও বলে থাকেন, তুলসীর গন্ধে ম্যালেরিয়া দূর হয়; বাড়ীতে বসন্তাদি রোগ হ'লে ক্ষৌরকার্য ও রজকের দ্বারা বস্ত্র ধৌতকরণ নিষেধ; এ আর পুলিশ ডাকিয়ে সংক্রামকতা নিবারণ করতে হয় না; হিন্দু ধর্মকে পুলিশ অপেক্ষাও ভয় করে; আবক্ষোনিমগ্ন হয়ে পানীয় বা স্নানজল কলুষিত করলে তোমার মুন্সি-পালের পেয়াদার পিতামহ ধরতে পারে না, কিন্তু শাস্ত্রে এমন কঠোর পাপের বিভীষিকা প্রদর্শিত আছে যে, পিতৃপুরুষভক্ত ধর্মভীরু হিন্দু স্নানজলে নিষ্ঠীবন

পর্যন্ত ত্যাগ করবে না। হিন্দুরাজ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান ছিল না ?" স্মৃতিরত্নের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থার উজ্জ্বল চিত্র তুলিয়া ধরিয়া অমৃতলাল আমাদিগকে ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ দিয়াছেন।

অন্য যে কারণে অমৃতলাল তথাকথিত প্রগতিকে পছন্দ করেন নাই, তাহাও স্মৃতিরত্নের উক্তির মাধ্যমে স্পষ্ট হইয়া উঠে। প্রাচীন ভারতের সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ধর্মানুমোদিত কর্তব্যবোধ প্রবল হওয়ায় ঐ কর্তব্যগুলি মানুষ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিত এবং যতদূর সম্ভব ঐগুলি অমান্য করিতে চেষ্টা করিত না, তাই জনকল্যাণের দায়িত্ব পালন করা প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত কর্তব্য ছিল। কিন্তু বর্তমানের সামাজিক কর্তব্যবোধ হইতে ধর্মীয় সেই মহান্ আদর্শ অবলুপ্ত হইয়াছে, জনকল্যাণের নামে তাই ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি ও আত্মপ্রতিষ্ঠা বা কর্তৃত্বাভিমান প্রধান হইয়া দেখা দিয়াছে। তাই সমাজ-কল্যাণের নামে পরস্পরের দ্বন্দ্ব, ঈর্ষ্যা, নিন্দা ও দলাদলিই দেখা দিয়াছে বেশী, ইহাতে কল্যাণের নামে অকল্যাণই হইতেছে। এই অপপ্রচেষ্টার মুহূর্তে সমাজের সর্বপ্রকার দুর্বলতা ও পাপ নগ্নমূর্তিতে দেখা দিয়াছে। অমৃতলাল প্রগতির দোহাই দিয়া এগুলিকে প্রসন্ন অভিনন্দন জানাইতে পারেন নাই। স্মৃতিরত্ন ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন, অন্যান্য অনেকের দৃষ্টি এড়াইলেও নেশাখোর পাগলাটে মাণিকের দৃষ্টিতে ইহা ধরা পড়িয়াছে। সত্য, উপেন, বিজয় তিনজনে প্রত্যেকেই দাবী করিতেছে যে তাহারই একক কৃতিত্বে ম্যাড়াপাড়ায় স্বায়ত্তশাসন প্রবেশ করিয়াছে। অথচ সকলের সমবেত চেষ্টায় যে ইহা ঘটিয়াছে, সে-কথা কেহই স্বীকার করিতেছে না। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার বুদ্ধিই যে সকল কর্ম মাটি করিবে, মাণিক অন্ততঃ তাহা বুঝিয়াছে। মাণিকের উক্তি "সাপ যে তোমাদের ঘরের ভিতরেই চক্র ধ'রে বেড়াচ্ছে, 'যেমন আসরে নামবে ভোট, আপনি সে মারবে চোট !' বিষের গন্ধে সব গলাবাজিই কচ্ছো, যখন চক্র ঘুরিয়ে বিষ ঢালবে, তখন দেখছি পটাপট লাঠি চলবে।"

মাণিকের এই ভবিষ্যদ্‌বাণী কেমন করিয়া সফল হইয়াছিল, নাটকে তাহাই দেখানো হইয়াছে। প্রথম অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য হইতে এই ভোটরূপ দক্ষযজ্ঞের উদ্বোধন হইয়াছে। বিজয়, উপেন ও সত্য তিনজনেই, কে কমিশনার হইবে, তাহা লইয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিয়াছে। পরস্পরের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শেষ পর্যন্ত চারিত্রিক দোষ পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। উপেন সত্যর চরিত্র-সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে দোষ দিয়া বলিতেছে, "সত্যবাবু, তুমি অত সন্ধ্যার পরে ঘন ঘন অনাথদের বাড়ীর তত্ত্বাবধান করতে যেও না; তোমার নিজের

চরিত্রের তত্ত্ব থাক বা না থাক, খামকা খামকা গরীব বিধবার একটা কলঙ্ক হয়।" এই দোষারোপ নিতান্ত অমূলক এবং ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত মনে করিতে পারিতাম, কিন্তু কথা-প্রসঙ্গে বিজয়ের একটি উক্তি লক্ষ্য করিবার মতো। সত্য বলিতেছে, "জানিস, অনাথের পরিবারকে আমি নিজের সিষ্টারের মতন দেখি।" উত্তরে বিজয় বলিতেছে, "মার মতন বলতে সাহস হ'লো না বুঝি, সত্যদা ?" সত্যকারের প্রণয়িনীরা অনেকে বর্তমান কাল পর্যন্তও বোধ হয় 'ভগিনী'-ত্বের আড়ালে আত্মগোপন করিয়া আসিতেছেন। সত্য একথার প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া অন্য দিক্ দিয়া বিজয়কে আক্রমণ করিল। "সেজদার স্কুলে ক'মাস মাস্টারী ক'রেছিলে, সেখান থেকে দূর ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিল কেন ? সেকথা আমার জানা আছে,—বেশী বাড়াবাড়ি করতো এখনি সব প্রকাশ ক'রে দেব !" বুঝা গেল, ইহারা সকলেই এক-একজন বিশুদ্ধ-চরিত্র দেবতা ! সুতরাং দেশপ্রেমিকতার দিক্ দিয়া ইহারা আনন্দমঠের ভবানন্দের সগোত্র। নিজেরা যাহারা অনিয়ন্ত্রিত-চরিত্র, তাহারা যদি দেশের সেবা করিতে যায়, তাহা হইলে নিজেদের চারিত্রিক দুর্বলতার দ্বারা পরিবেশকেই বিষাক্ত করিয়া তোলে। অমৃতলাল এই নাটকে চরিত্রের সেই দিকের চিত্র হুবহু না আঁকিলেও ইঙ্গিত করিয়াছেন।

'নেপালচন্দ্র পাঁঠা' আসিয়া কিছুক্ষণ আগে ইহাদের বাগ্-বিতণ্ডায় যোগদান করিয়াছে। নেপালের বক্তব্য হইল এই যে, মিউনিসিপ্যালিটি মঞ্জুর হওয়ার মূলে একমাত্র তাহার সেজদার কৃতিত্বই রহিয়াছে। সুতরাং কমিশনার হওয়ার যোগ্যতা শুধু তাহারই আছে। নেপালকে নিরস্ত করিবার জন্য বিজয় এইবার গ্রাম্য সমাজের মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করিল। গ্রামের এই যুবকগণ যতই উচ্চ-শিক্ষিত হউক এবং আধুনিক হউক না কেন, কুলক্রমাগত জাতিবিদ্বেষ ইহাদের রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত। কার্যসিদ্ধির জন্য ইহারা সেই জাতি-বিদ্বেষের আশ্রয় গ্রহণ করিল। "নেপালবাবু, রাগ কর না, এই পল্লীগ্রামে প্রথম ইলেক্‌শনে যদি আমরা একজন কৈবর্তকে কমিশনার ক'রে দিই, তা হ'লে একটা সোরগোল পড়বে না ?" নেপালের পদবীটিও অপমানজনক। ঐ পদবীটিও আপত্তির একটি প্রধান কারণ। "একেতো তোমার 'পাঁঠা' পদবী। গেজেটে দেখলেই 'বঙ্গবাসী'র পঞ্চানন্দ 'ম্যাড়াপাড়ার পাঁঠা কমিশনার' নিয়ে মাস তিনেকের খোরাক কোরে বস্‌বেন।"

যতপ্রকার সঙ্কীর্ণতা, আত্মম্ভরিতা, ঈর্ষ্যা, নিন্দার খেলা সম্ভবপর হইতে পারে, নির্বাচন-প্রসঙ্গে তাহার সূচনা হইল, কিন্তু সত্যকারের কাজের কাজ এতটুকু করিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা ইহাদের কাহারও নাই। মিউনিসিপ্যালিটি হউক আর

যাহাই হউক না কেন, এতটুকু জনকল্যাণ ইহাদের দ্বারা হইবে না। তাহার প্রমাণ পাইতে বিলম্ব হইল না। চাটুয্যের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে, 'দেশহিতৈষিতা' দেখাইবার এই উপযুক্ত সময় আসিলেও দেশকর্মিগণ 'চাচা আপনা বাঁচা' নীতি অবলম্বন করিতেছে। কেহ আপনার ল-বুক কয়খানা, কেহ নিজের নূতন ছাতাটি, কেহ বা আর-জি-করের ডাক্তারী প্যাকেটটা বাঁচাইতে ছুটিয়া গেল, কেবলমাত্র অশিক্ষিত গোপাল, চাটুয্যেদের গরুগুলি অন্তত: বাঁচানো যায় কিনা সেই চেষ্টা করিতে ছুটিল। প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগিলে যাহারা এক ঘটি জল দিয়া সাহায্য করিতে প্রস্তুত নয়, কমিশনার হইয়া তাহারা গ্রামকে কোন্ নন্দনকাননে পরিণত করিবে, তাহা বোঝাই যাইতেছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক ১ম দৃশ্য। এইবার গ্রাম্যবিভ্রাটের চরম পর্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। নির্বাচন হইবেই। উদ্যোক্তা যুবকদের মধ্যে যখন মিল হইল না, তখন মিস্টার ধারাকে রিটার্ণ করার চেষ্টা চলিল। গ্রামের বনিয়াদী জমিদারেরা এই সব 'ছেলে-ছোকরার কাণ্ড, কেবল হট্টগোল'-এর মধ্যে আসিয়া 'বেইজ্জৎ' হইতে প্রথমে রাজি হন নাই। কিন্তু স্মৃতিরত্ন ইত্যাদি ধরিয়া পড়ায় 'মেজবাবু,' 'বরদাবাবু' রাজি হইয়াছেন। কিন্তু গ্রামের এই আহাম্মক যুবকগণ কিছুতেই তাঁহাকে কমিশনার করিতে স্বীকৃত নয়। মেজবাবু শুধু জমিদার নন্, জনকল্যাণ করা তাঁহাদের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য। যাঁহারা বনিয়াদি বংশের লোক, জনকল্যাণে অভ্যস্ত, লোকমান্য, যাঁহারা চেষ্টা করিলে কাজ হইবে, দুইটা কথা বলিলে লোকে শুনিবে, গ্রামের কয়েকটি অবিবেচক যুবকের ঔদ্ধত্য এতদূর পৌছাইয়াছে যে তাহাদিগকে কমিশনার করিতে ইহারা কিছুতেই প্রস্তুত নয়। অথচ তাঁহাদের দান ইহারা দুই হাতে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছে। ইহারা মানুষের সম্মান রাখিয়াও কথা বলিতে জানে না—স্মৃতিরত্নকে নেপাল বলিতেছে, "ঠাকুর, রাগ করো না, আপনারা নাকি বিদেয়টা আস্‌টা পাও, তা একটু ওঁদের খোসামোদ করা অভ্যাস হ'য়ে গেছে। তুমি ঠাকুর একটু আমার হয়ে চণ্ডীপাঠ কর, না হয় একটা ঘড়াটা আস্‌টা দেওয়া যাবে।" স্মৃতিরত্ন অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া ইহার প্রতিকার করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বিদায় লইলেন। ব্যাপারটি বিজয়, উপেন ও গোপালের ভাল লাগিল না, কিন্তু নেপাল ইহাতে এতটুকুও বিচলিত হয় নাই। বাবুদের কানে কথাটি উঠিলে একটা অনর্থ ঘটিতে পারে বলিয়া অনেকেই আশঙ্কা করিতে লাগিল। নেপাল বলিল, "তোমরা ভয় কর, কর. আমি করি না।" মাণিক শ্লেষোক্তি

করিয়া বলিল, "তা বইকি! নেপালবাবু মাছ থেকে পাঁঠা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, উনি কাকে ভয় করবেন?" সৃষ্টির প্রথম স্তরের প্রাণী 'মৎস্য' হইতে 'অজ' পর্যন্ত জীবসৃষ্টির অনেকখানি ক্রমবিকাশ সূচনা করে। তেমনি লেখাপড়া শিখিয়া মৎস্যবিক্রেতা কৈবর্তের ছেলে 'বাবু' নেপালচন্দ্র 'পাঁঠা' হইয়াছেন। সুতরাং শিক্ষিত ধনী এই কৈবর্তনন্দন ব্রাহ্মণকে মান্য করিবেন বা জমিদারকে ভয় করিবেন কেন? নেপাল এই শ্লেষোক্তি সহ্য করিতে না পারিয়া রাগিয়া আগুন হইয়া বলিল,—'দেখ মাণ্‌কে, জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে দেব।' এইবার গোপাল, বিজয়, সত্য প্রভৃতির 'সড়া অঙ্কা' অবস্থা। মুখে ইহারা যতই সাম্যবাদের বুলি আওড়াক না কেন এবং জাতিভেদ-বর্ণভেদের যতই নিন্দা করুক না কেন, ইহাদের রক্তের সহিত যে জাত্যভিমান মিশিয়া রহিয়াছে, তাহাতে এইবার আঘাত লাগিল। সকলে নেপালকে মারিতে উঠিল,—"ও রাস্‌কেল আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, বামুনকে জুতো মারবো?" সত্য সত্যই মারামারি আরম্ভ হইয়া গেল। মারামারি করিতে করিতে মাণিক ব্যতীত সকলে প্রস্থান করিল। এই পাগলের মেলার মধ্যে যে সত্য সত্যই পাগল বলিয়া পরিচিত সেই মাণিকই আত্মস্থ হইয়া ইহাদের উন্মত্ততা লক্ষ্য করিতেছে, আর বিবাদের দেবতা নারদ ঋষিকে স্মরণ করিতেছে ও গান করিতেছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য। ভোটযজ্ঞে পূর্ণাহুতির পালা। যত প্রকার নোংরামি সম্ভবপর হইতে পারে, এবার তাহা সুরু হইল। বিজয় শ্যামাকে বলিতেছে, "তোদের দলের চালাক ছেলেকে দিয়ে সিধে দুলের বিচিলীর পালুয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়াতে পারিস? ও বেটার হাতে অনেকগুলো ভোট, নেপলা পাঁঠা লোভ দেখিয়ে সবগুলো যোগাড় ক'রেছে,—পালুয়ে আগুন লাগলে বেটা আর হাটতলায় যেতে পারবে না।" ভবিষ্যতে যাহারা গ্রামের কল্যাণ করিবে, তাহারা আরম্ভেই অন্যের বাড়ী আগুন ধরাইতেছে। নেপালও কাহাকেও ঠেঙ্গাইয়া, কাহাকেও জলে ফেলিয়া দিয়া নিজের দলের ভোটের ব্যবস্থা করিতেছে। কিন্তু তাহার স্বজাতিবর্গ এই সকল অন্যায় করিতে স্বীকার করিতেছে না। নেপাল তাহাদিগকে গালাগালি করিয়া বলিতেছে, "জেলে কি না! পোলিটিক্যাল্ আবশ্যক হ'লে যে ভাইকে ফাঁসি দেওয়া যায়,—বাপ্‌কে খুন কল্লে দোষ নাই; এ বেটা তা বোঝে না।" বর্তমান পোলিটিক্যাল্ ধর্ম আওরংজেবকেও হার মানাইয়াছে। দাঙ্গাবাজী, গুণ্ডামী করিয়া যে-কোন প্রকারে ভোট যোগাড় করিয়া গদী দখল করিয়া বসাই ইহাদের একমাত্র কাম্য। ভোট যোগাড়

করিতে না পারিলে ইহারা দেশপ্রেমে ইস্তাফা দিয়া যাহাতে দেশের ক্ষতি হয়, তাহাই করিবে। "যদি একান্ত হেরে যাই,—লাইব্রেরীতে আগুন ধরিয়ে দেব ;—হরিসভা বেহ্মসভার সব চাঁদা বন্ধ কোরে দেব।"

গ্রাম্য-বিভ্রাটের 'শঠে শাঠং' নীতির চরম রূপ দেখাইয়া দিলেন স্মৃতিরত্ন মহাশয়। মেজোবাবু, ছোটবাবু যখন বুঝিলেন, তাঁহাদের কমিশনার হইবার পথে অন্তরায় অনেক, তখন তাঁহারা স্মৃতিরত্নের পরামর্শে লবধন মাঝি আর গোফুর সর্দারকে কমিশনার করিবার জন্ম চেষ্টা করিলেন। সত্য বেগতিক দেখিয়া স্মৃতিরত্নের সঙ্গে যোগ দিল, স্মৃতিরত্নের জয় হইল। অমৃতলাল সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা, মুস্‌লিম্ লীগের সৃষ্টি এবং তাহার বিষময় পরিণাম ভারতবিভাগ দেখিয়া যান নাই, কিন্তু ইহার বীজ যে কোথায় নিহিত ছিল, তাহা দেখিয়া গিয়াছেন। হিন্দু জাতির এতই অধঃপতন হইয়াছে যে, নিজেরা ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া যাইতেছে, পরস্পরের মধ্যে জাতিতে জাতিতে জঘন্ম হীনম্মন্যতা-প্রসূত দ্বন্দ্বের অবকাশ রাখিয়া দিতেছে। তাহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্ম অন্যকে মাথায় তুলিয়া নাচিতে পারিবে, তবুও ভাইয়ে ভাইয়ে ঐক্য স্থাপন করিবে না। ফলে অন্যে তাহাদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙিয়া খাইয়া যাইতেছে। অমৃতলালের তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি সমাজের এই মারাত্মক দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়াছিল। তিনি যথাসময়ে আমাদিগকে সাবধান করিতে চাহিয়াছিলেন।

শৈলীর দিক্ দিয়াও নাটকখানি অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসাবে গণ্য হইতে পারে। অমৃতলালের অনেক নাটক-সম্বন্ধে একটি প্রধান অভিযোগ এই যে উহাদের মধ্যে কাহিনী বা চরিত্র বলিয়া কিছুই নাই। 'গ্রাম্য বিভ্রাট'-সম্বন্ধে সে-কথা বলিবার উপায় নাই। চরিত্রের সংঘাতে ঘটনা এবং ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। কাহিনীর আরম্ভ, উত্থান, পতন এবং পরিণতি অতি নিপুণভাবে দেখানো হইয়াছে। যাত্রা এবং কথকতার প্রভাবে প্রচারাত্মক মনোভাবের জন্ম অমৃতলালের কোনো কোনো নাটকে সংলাপ বক্তৃতার আকার ধারণ করিয়া নাট্যগুণ নষ্ট করিয়াছে। প্রমাণ-স্বরূপ আমরা অমৃতলালের 'একাকার', 'খাসদখল' প্রভৃতি নাটকের নামোল্লেখ করিতে পারি। সেই দোষ 'গ্রাম্য বিভ্রাট' নাটকে নাই। এই নাটকে সংলাপ কোথাও চিন্তা-সর্বস্ব বিবৃতিমূলক প্রবন্ধের ভাষায় পরিণত হয় নাই। চরিত্রগুলি আদ্যন্ত আমাদের কৌতূহল ধরিয়া রাখে। সত্য, বিজয়, স্মৃতিরত্ন, মাণিক, প্রত্যেকটি চরিত্রেরই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। উহারা বিশেষ বিশেষ দলের প্রতিনিধি বা 'টাইপ' মাত্রে পর্যবসিত হয় নাই।

নাটকখানির মধ্যে একটি মাত্র ত্রুটী লক্ষ্য করিবার মতো। পুরুষদের কর্মোন্মাদনার পাশাপাশি নারীদের ঘরের সুখ-দুঃখের চিত্র অঙ্কন করিয়া নাট্যকার গ্রাম্য বিভ্রাটের অন্য একটি দিক্‌ও দেখাইতে চাহিয়াছিলেন। উহার মধ্যে 'তারাসুন্দরী', 'বিন্ধ্যাবতী' প্রভৃতি চরিত্র জীবন্ত হইলেও পুরুষদের বহির্মুখী কর্মজীবনের সঙ্গে নারীদের এই গৃহের জীবনকে কোনরূপ নাটকীয় প্রয়োজনে অমৃতলাল গ্রথিত করিয়া তুলিতে পারেন নাই। দুইটি জগৎ নাটকে আদ্যন্ত পৃথক্‌ রহিয়া গিয়াছে, কাহিনী বা চরিত্রের অনিবার্য প্রয়োজনে উহারা মিলিয়া মিশিয়া এক অখণ্ড পরিণতির সূচনা করে নাই। অমৃতলাল নাটক হইতে এই নারীচরিত্রগুলি বাদ দিলে তাঁহার রচনাটি আকারে ছোট হইলেওপ্রকারে সার্থক রচনা হইত—সন্দেহ নাই।

অমৃতলালের 'তিলতর্পণ-নাটক' আর একখানি উৎকৃষ্ট প্রহসন। বাংলা রঙ্গমঞ্চ, এবং নাট্যসাহিত্যের দুর্দশা অমৃতলাল লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাই তিনি 'তিলতর্পণ' নাটক-এ সেই দুর্দশার চিত্র উজ্জ্বলভাবে অঙ্কন করিয়াছেন। অমৃতলালের আগে এই দুর্দশা লক্ষ্য করেন সাহিত্যসম্রাট্‌ বঙ্কিমচন্দ্র। কমলাকান্তের দপ্তরের মধ্যে তিনি ইহা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ভীষ্মদেব খোসনবীশের পুত্র নাটক লিখিতে গিয়া যাহা করিলেন তাহা বাংলা দেশের একশ্রেণীর রোমান্টিক নাট্যকার-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। বাস্তবই হউক আর অবাস্তবই হউক, চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করিবার জন্য এই নাট্যকারগণ নানাপ্রকার উদ্‌ভট কাহিনী ও চরিত্র সৃষ্টি করিয়া নাটকের কলেবর পূর্ণ করিতেন। নায়িকা আত্মহত্যা করিবার পূর্বে ছুরিকা-হস্তে রঙ্গমঞ্চে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গান করিবেন এবং সাতশ সতের বার 'হে সখি' এবং 'হায় কি হ'লো' বলিবেন। নহিলে নাটক জমিবে না। নাটকের মধ্যে দেব-দৈত্য-পরীর আগমন না-হইলে তাহা আকর্ষণীয় হইবে না বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস ছিল। অমৃতলাল এই ধরনের তথাকথিত রোমান্টিক নাট্যকারদের ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

তিলতর্পণ-নাটক

'তিলতর্পণ নাটক'-এ গ্রন্থকারের মুখ দিয়া অমৃতলাল সে-যুগের রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষদের উদ্দেশ্য এবং দর্শকদের রুচি মিশাইয়া নাটক রচনা করিবার কৌতুককর প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম 'তিলতর্পণ' হইল কেন, তাহার উত্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "প্রথমে লোকে শুনলেই ভাববে এটা নীলদর্পণের জবাব, দীনবন্ধু বাবুকে গাল দিয়েছে, আজকালকার audience গাল শুন্তে ভালবাসে, তাতে আবার মরা মানুষকে গালাগাল—আর আপনাদের ওবিষয়ে খুব সুখ্যাতিও আছে। দ্বিতীয়তঃ তিলতর্পণের আর একটি ভাব

আছে, যেমন চাড্ডিখানি তিল দিয়ে চোদ্দপুরুষকে খুসি করা যায়, তেমনি আমার এই একখানি নাটকের ভেতর এমন জিনিষ আছে যে, সব audience-কে খুসি করা যাবে।" কথাগুলি লক্ষ্য করিবার মতো। নাটক গণসাহিত্য সত্য, জনগণের মনোরঞ্জন করাই নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু মনোরঞ্জন করা এবং ভাঁড়ামির মাধ্যমে তোষামোদ করা এক জিনিস নয়। যাত্রা একদিন আনন্দ-পরিবেশনের মাধ্যমে জাতির জ্ঞান-ধর্ম-ভক্তিবৃদ্ধির ভার লইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতার বণিকৃতন্ত্রী সভ্যতার মনোহরণ করিতে গিয়া যাত্রা-সাহিত্যের পতন হইল। বাংলা রঙ্গমঞ্চের মালিকগণ যখন জনগণের নিম্নস্তরের রুচির রসদ যোগাইয়া অর্থোপার্জনের জঘন্য বৃত্তি বাছিয়া লইলেন সেইদিন হইতে মধু-দীনবন্ধু-গিরিশচন্দ্র-ক্ষীরোদপ্রসাদের নাট্যাদর্শ বিসর্জিত হইয়াছে। অমৃতলাল সেই অধঃপতন লক্ষ্য করিয়াছেন। অর্থের লোভে, গণমন তুষ্ট করিতে গিয়া ইহারা নাটক নামে যে আবর্জনাগুলি অভিনয় করিতে লাগিল, তাহা কি ভাব, কি বিষয়বস্তু, কি শৈলী, কোন দিক্ দিয়াই রচনা-হিসাবে সার্থক হইল না, এক কিম্ভূতকিমাকার জগাখিচুড়িতে পরিণত হইল। গ্রন্থকার বলিতেছেন, তাঁহার রচনা "Tragedy'ও না, comedy'ও না।" "আমি মহাশয় বড় নকলের দিকে যাই না, আমার নিজের original thought নিয়ে কাজ করি; এতে সব আছে। এখানি হচ্ছে Farcial Tragi-Comedy de Pantomimic Operetta." নাটকের যে একটা উপযুক্ত গল্প থাকা দরকার, ইঁহাদের রচনায় তাহা পাওয়া যাইবে না। "Plot যদি বল্লেন, তবে plot-এর বড় একটি নাই। Plot নিয়ে তো সকলেই লেখে, কিন্তু এর ভাব বড় গভীর, এতে wit আছে, humour আছে, blank verse আছে, নাচ, গান, গালাগাল, ভারত, যবন, মূর্ছা, কালিওড়ানো, ভূতনাচান, চিতোর, সাহেব মারা, সব আছে—অশ্লীল নাই।" দেশপ্রেমের হাওয়া নাটকে বহাইতে হইবে বলিয়া চিতোরের কাহিনী হইতে সাহেব মারার ব্যাপার পর্যন্ত থাকিল। কিন্তু নাচ না-হইলে যদি নাটক না জমে, সেইজন্য "নাচের যায়গা পাই না—মল্লিকদের মেজো বউকে খিড়কির ঘাটে নাচিয়ে দিলুম।" এই নাচাইয়া দেওয়া যে রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষদের পক্ষে প্রয়োজন, কারণ, নাচিলে "সে তোড়া পাবে, ক্লাপ পাবে, Hand bill এ লিখে দিতে পারবেন—singing and dancing throughout তাই নাচবে।" প্রকৃত সাহিত্য-সৃষ্টির উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া নাট্যকার যদি দর্শক এবং রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের মনোরঞ্জন করিতে যান, তাহা হইলে নাটকের যে অধোগতি হয়, অমৃতলাল তাহাই

দেখাইয়াছেন। এক অদ্ভুত রকমের বিজ্ঞাপন দিয়া 'পূর্বদৃশ্য' শেষ হইল। এই বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়াও সেই সময়কার লোকের মন আকর্ষণ করিবার জন্য অদ্ভুত ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রথাকে নাট্যকার ব্যঙ্গ করিয়াছেন।

বাংলা দেশে রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হইয়াছে, নাট্যাভিনয়ও চলিতেছে। কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বেতন না দিয়া পারিলে, ম্যানেজার তাহা দেন না। তাই যে কোন অভিনেতাকে ধরিয়া আনিয়া অভিনয় করানো হয়। অপেরা মাস্টার আপত্তি করিতেছেন, "ঐ সব স্টুপিড্ ফিমেল নিয়ে অপেরা করতে হবে না কি? তার উপর আবার একটা সুর পর্যন্ত নাই।" কিন্তু না-করিয়া উপায় কি? অপেরা দেখিতে লোক বেশী হয়। তাই "শনিবারে একখানা অপেরা দিতেই হচ্ছে; এক্‌ট্রেশদের মাইনে না-দিলেই নয়।" অনেক সময়ে এমন হয় যে অভিনয় শেষ হইতে না-হইতে অভিনেত্রীগণ বাগানবাড়ীতে বেড়াইতে যায়, কোনো অভিনেতা মাতাল হয় বা দর্জি সাজঘর হইতে পোষাক আটক করিয়া লইয়া পালায়। 'তিলতর্পণ নাটক'-অভিনয়ে শেষের দিকে তাহাই হইল। ম্যানেজার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "সর্বনাশ হ'ল, drop scene ফেলে দে! এদিকে ত কমিটির বাবুরা একট্রেশ নিয়ে বাগান চল্লেন, আবার নেতা দর্জি আগাম ভাড়া চুকিয়ে নিয়ে এখন পোষাকের বাক্স ল'য়ে পালাল, সর্বনাশ হ'ল আমার!" রঙ্গমঞ্চের অব্যবস্থা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আচরণ এবং নাট্যরচনার হাস্যকর উচ্ছৃঙ্খলতা সব কিছুর কথা অতি সংক্ষেপে সুন্দর করিয়া বলিয়া অমৃতলাল "তিলতর্পণ" নাটক রচনা করিয়াছেন। শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশীর "পরিহাসবিজল্পিতম্" আমাদিগকে অনুরূপ শৈলী মনে করাইয়া দেয়। "ঋণং কৃত্বা" নাটকে ঋণ-গ্রহণকারী ছাত্রদের মিলিত সঙ্গীত এবং ঋণ-শিক্ষকের শিক্ষণ-পদ্ধতিও আমাদিগকে অমৃতলালের "গ্রাম্য বিভ্রাট" নাটকের পোলিটিক্যাল মাস্টার এবং তাঁহার ছাত্রদের সঙ্গীত-সংলাপাদির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সুতরাং অমৃতলালের প্রভাব তাঁহার পরবর্তী অনেক শক্তিমান্ নাট্যকারের উপরও পড়িয়াছে বলিয়া আমাদের স্বীকার করিতে হইবে।

এইবার "তিলতর্পণ নাটক"-খানির বিষয়বস্তু মোটামুটি বিশ্লেষণ করিয়া আমরা অমৃতলালের বক্তব্য অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিব।

চিতোর রাজ-অন্তঃপুর। রাণা বাপ্পারাও এবং তাঁহার মহিষীর আলাপ। বাংলার নবাব আলিবর্দির বিরুদ্ধে রাণা বাপ্পারাও অভিযান করিবেন। কিন্তু মহিষী কিছুতেই রাণাকে যুদ্ধে যাইতে দিতে চাহিতেছেন না। নাট্যকারের

ঐতিহাসিক বোধ লইয়া অমৃতলাল প্রথমে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। এক শ্রেণীর নাট্যকার আছেন যাঁহারা সস্তা দেশপ্রেমের নামে এমন কতগুলি কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচনা করেন, যাহার মধ্যে ঘটনার কালানুক্রমিকতা এবং প্রাসঙ্গিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই যুগের ধারণা-ভাবনা-কল্পনা অতীত যুগের কাহিনীতে আরোপ করিয়া তাঁহারা নাটকে প্রায়ই কালানৌচিত্য-দোষ (anachronism) এবং পাত্রানৌচিত্য-দোষ ঘটাইয়া ফেলেন। ঐতিহাসিক ঘটনা নামাঙ্কিত কাহিনীতে তাঁহাদের উদ্‌ভট কল্পনাই স্থান পায়। উহা না-হয় ইতিহাস, না-হয় রোমান্স, না-হয় উহাদের সঙ্গত মিশ্রণ। কাহিনী-নির্বাচন এবং গ্রন্থনের এই নৈপুণ্যের অভাব তাঁহারা পূরণ করিতে চেষ্টা করেন সাধারণতঃ সস্তা দেশপ্রেমমূলক উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যের দ্বারা। ভাবপ্রকাশের জন্ম সহজ, স্বাভাবিক সঙ্গত সংলাপ সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা ইঁহাদের নাই। পুষ্পিত বা পল্লবিত বাক্যে, যাত্রার ধরনে স্থূল ভাবালুতাপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা ইঁহারা দর্শকের মনোহরণ করিতে চেষ্টা করেন। ফলে ইঁহাদের রচনা সার্থক নাটক না হইয়া অতিনাটকে পর্যবসিত হয়। কার্য ও বাক্যের স্বাভাবিক পরিণতি-হিসাবে সংলাপ ও ঘটনা সৃষ্টি হয় না। বাপ্পারাও এবং মহিষীর আলাপে আমরা ইহা লক্ষ্য করিব।

বাপ্পারাও অতি সহজেই বলিতে পারিতেন যে তিনি সূর্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং নিজেকে বীর বলিয়া মনে করেন, সুতরাং শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করিয়া তিনি অপবাদ লইতে চান না। এই সামান্য কথাটুকু বাক্যচ্ছটায় কতখানি পল্লবিত করিয়া নাট্যকার প্রকাশ করিতেছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার মতো। "প্রাণেশ্বরী! তুমি নিতান্ত মদমত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় প্রলাপ বক্‌ছো। তুমি কি বিবেচনায় আমাকে যুদ্ধে যেতে নিষেধ কচ্ছো? ত্রিভুবনবিখ্যাত সূর্যবংশে জন্মগ্রহণ ক'রে নরনারায়ণ রামচন্দ্রের রক্ত ধমনীতে প্রবাহিত থাক্‌তে চিতোররাজ্যস্থাপক স্বনাম-পুরুষধন্য বাপ্পারাও কোন্ মুখে, কোন্ লজ্জায়, কোন বিবেচনায়, বল দেখি, সেই ভীরু, বিধর্মী, কাপুরুষ, নবাবের ভয়ে গৃহে বসে থাকবে? চিতোরের বাপ্পারাও বাঙ্গালার আলির ভয়ে পলায়ন করেছিল, এ অপবাদ আমি প্রাণ গেলেও সহ্য করতে পারব না। উঃ! একথা মনে কল্লে ত আমার শিরায় শিরায় শোণিত ধাবিত হয়। মহিষী, ধিক্ আমাকে! আর বাধা দিও না, আমি চল্লেম।" স্বাভাবিক কথ্য ভাষাই যে নাটকীয় সংলাপের উপযোগী ভাষা ইহা বুঝিতে না পারিয়া বেশীর ভাগ অক্ষম নাট্যকার চমকসৃষ্টির জন্ম নাটকীয় সংলাপে যাত্রাকথকতার পল্লবিত ভাষার হাস্যকর

অনুকরণ করিতেছিলেন। অমৃতলাল তাঁহাদিগকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। ইঁহারা মনে করিতেন, একটু গুরুগম্ভীরভাবে একই কথা সাতবার করিয়া বলিলেই উৎকৃষ্ট সংলাপ হইবে। অনেক সময়ে ইঁহারা অর্থহীন বাক্য এবং উপমাদি প্রয়োগ করিয়া মনে করিতেন খুব খানিক সাহিত্য করিলেন। 'মত্তমাতঙ্গিনীর ন্যায়' আস্ফালন করা সম্ভব হইলেও 'প্রলাপ' কি করিয়া বকা যায়, আমরা বুঝিতে পারিলাম না, দর্শকেরাও নিশ্চয়ই কোনোদিন বুঝিবেন না, কিন্তু নাট্যকার তাঁহার নায়কের মুখে কয়েকটি গুরুগম্ভীর শব্দ তুলিয়া দিয়া ভাবিলেন, উৎকৃষ্ট সংলাপ সৃষ্টি করিলেন। এই সংলাপের জোরেই নাটক জমিয়া উঠিবে। সমালোচকের উক্তি লক্ষণীয়। "অঘটন ঘটানোই নাটকের মেরুদণ্ড অর্থাৎ স্পাইন্যাল কলম, আর শব্দচ্ছটাই এর অরটিরিয়েল ব্লড অর্থাৎ ধামন্য রক্ত। তা মশায় নাটকে শব্দচ্ছটার অভাব নাই, এমন কি Excuse my vanity, I have read something of Bengali, আমিই এর অনেক স্থান বুঝ্‌তে পারিনে, তাই থেকে আমি সিদ্ধান্ত করে নিয়েছি যে এ নাটকখানি অতি গুরুতর ব্যাপার।...যে লেখা সহজে বুঝতে পারা যায় না, তারও ভিতরে অবশ্য অনেক গুরুতর ভাব আছে, আর কবিতাগুলি কি মিত্রাক্ষর কি অমিত্রাক্ষর একেবারে quite original..."

সংলাপের ভারসাম্য এই নাট্যকারেরা রক্ষা করিতে পারেন না। বাপ্পারাওয়ের উক্তি শুনিয়া মহিষী কাঁদিয়া আকুল হইলেন, তৎসম-শব্দবহুল গুরুগম্ভীর ভাষায় নিজের ভাবী বিরহবেদনা জানাইয়া দিলেন, কিন্তু বাপ্পারাও যখন বলিলেন যে তিনি 'মাকিনী হেন্‌রী রাইফেল্‌ বন্দুক' আনাইতেছেন, রাণী তখন আনন্দের আতিশয্যে একেবারে গ্রাম্য নারীর মতো বলিয়া ফেলিলেন, 'মাইরী?" এতক্ষণ ধরিয়া গুরুগম্ভীর সংস্কৃতানুগ ভাষায় সংলাপ চলিতে চলিতে হঠাৎ যেন হোঁচট খাইয়া এই গ্রাম্য 'মাইরী' শব্দে আসিয়া ঠেকিল। কিন্তু ইহার পর আরো বিচিত্র ব্যাপার হইল। রাজার যুদ্ধযাত্রার অত্যধিক উৎসাহ প্রকাশ করিতে হইবে। সুতরাং এই নিছক গ্রাম্য ভাষা ছাড়িয়া হঠাৎ নাট্যকার অমিত্রাক্ষর সুরু করিলেন। কিন্তু তাহাও ব্যর্থ সৃষ্টি,—গদ্য কি পদ্য বুঝিবার উপায় নাই। রাজার এই উচ্ছ্বসিত উক্তির পর রাণী আর কি করিতে পারেন। রাজার ভাবোদ্বেলতার সহিত সঙ্গতি রাখিবার জন্য তাঁহাকে মূর্ছা যাইতে হইবে। ওদিকে রঙ্গমঞ্চের ব্যবস্থাও অপূর্ব! উত্তেজনাপূর্ণ 'mad scene' জমিয়া উঠিতেছে। কিন্তু যথোপযুক্ত অভিনেতার খোঁজ নাই। রাণীর মূর্ছাভঙ্গ করিবার জন্য জল দিয়া যাইতে ডাকাডাকি করিয়া যখন কাহাকেও

পাওয়া গেল না, তখন বাপ্পারাও প্রম্‌প্‌টারকে বলিলেন, "বই হাতে ক'রে দেখছো কি, শীগ্‌গির একটা পাগ্‌ড়ি জড়িয়ে এক গেলাস জল নিয়ে এসো না, স্টেজ মাটি হয় যে, আমি ততক্ষণ প্যাণ্টোমাইন করি।"

গৌণ কাহিনীর রূপায়ণেও ঠিক এতথানি অসঙ্গতি এবং অস্বাভাবিকতা ইঁহাদের রচনায় দেখা যায়। রাজকন্যা হইলেই তাহাকে রোমাণ্টিক নায়িকা করিবার জন্য প্রেমে ফেলাইতে হইবে, এবং প্রথম দর্শনেই প্রেম না জন্মিলে উহা রোমাণ্টিক হইবে না। আর প্রেমের তো জাতিকুল বিচার নাই, সুতরাং রাজকুমারী হেমাঙ্গিনী প্রথম দর্শনে অজু মালীকে ভালবাসিয়া প্রেম নিবেদন করিতে পাগল হইলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষার বাক্য অনুকরণ করিয়া বলিলেন, 'হৃদয়েশ্বর! আমি স্পষ্টাক্ষরে, মুক্তকণ্ঠে সখীসমীপে, জগৎ সমীপে বল্‌বো, কে আমাকে বাধা দিবে, যে তুমিই আমার প্রাণেশ্বর......"। বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষার ভূত যে অনেক নাট্যকারকে পাইয়া বসিয়াছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া অমৃতলাল প্রভৃতি অনেকেই তাহা বলিয়াছেন।

আর নায়িকা যখন একবার প্রেমে পড়িয়াছেন, তখন বসন্তের কোকিল, শরতের চন্দ্রমা, সকলকেই নাটকে আসিয়া ভীড় জমাইতে হইবে। দরকার হইলে ভারতচন্দ্রের রচনার অনুকরণে নায়িকার রূপ-বর্ণনায় অতিশয়োক্তিও করিতে হইবে, প্রসঙ্গ ও চরিত্রের সঙ্গে তাহা বেমানান হইলেও ক্ষতি নাই।

ওদিকে প্রধান কাহিনী ঠিকই চলিতে থাকিবে। দেশপ্রেমিক রাজা সৈন্যগণকে উৎসাহ দিয়া বিরাট বক্তৃতা করিবেন। রঙ্গলালের কাব্যের অনুকরণে সৈন্যগণও 'আজিরে আহবে ওরে আজিরে আহবে' করিতে থাকিবে। প্রসঙ্গ ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি থাক আর না থাক, এই সব নাট্যকার পূর্বগামী প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকদের রচিত বাক্যাবলীর অক্ষম অনুকরণের দ্বারা নিজেদের রচনা ভারাক্রান্ত করিবেন।

মুখ্য কাহিনী ও গৌণ কাহিনীর মধ্যে কোনো নিবিড় সম্বন্ধ ইঁহারা স্থাপন করিতে পারেন না। বাপ্পা এবং আলিবর্দির যুদ্ধপ্রসঙ্গে অজু মালীর সহিত রাজকন্যা হেমাঙ্গিনীর পলায়নের কোনো সম্পর্ক নাই, আর পলাতক ইহাদের ফিরাইয়া দিয়া আলিবর্দির বাপ্পারাওয়ের সঙ্গে সন্ধি করিবার কোনো সঙ্গত প্রশ্নই উঠে না, কিন্তু নাট্যকারের যে শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটাইতে হইবে। এই সুযোগে আসর জমাইবার জন্য দুই একটি উন্মত্ত দৃশ্যও পরিকল্পনা করার দরকার। সুতরাং কন্যাশোকে বাপ্পারাও পাগল হইয়া উন্মত্ত আচরণ করিতেছেন। মুখ্য কাহিনী ও গৌণ কাহিনীর সঙ্গত মিলন ঘটাইবার

উপায় ইঁহাদের নাই, তাই আলৌকিক কাহিনী সৃষ্টি করিয়া ইঁহারা নাটকের উপসংহার ঘটাইবেন। হঠাৎ স্বর্গ হইতে দেবর্ষি নারদ আসিয়া বলিয়া দিলেন, অজু নাম্নী শাপভ্রষ্ট দেবতা, সুতরাং হেমাঙ্গিনীর সহিত অজুর মিলন হইল। কিন্তু ইহাতেই নাটকের শেষ হইলে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হইবে কি? তাই নাট্যকার পদাঘাত করিয়া পরীস্থান দেখাইয়া দিলেন। তবুও তাঁহার আফশোষ রহিয়া গেল যে তাঁহার এত সাধের 'সলিলকি'ই অভিনয়ে বাদ পড়িয়া গেল।

বাংলা রঙ্গমঞ্চে নাটকের নামে অক্ষম অনুকরণজাত উদ্‌ভট কল্পনাসম্ভূত, বাস্তবতার সম্পর্কবিহীন, রাশি রাশি আবর্জনার কি করিয়া সৃষ্টি হইতেছিল, নাট্যকার নিপুণভাবে তাহা দেখাইয়াছেন। বাংলা প্রহসন-সাহিত্যে তাই তিলতর্পণ নাটকের স্থায়ী মূল্য আছেই।

অমৃতলালের 'বাহবা বাতিক' নাটকখানিতে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মতো। এই নাটকখানিতে কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি লেখকের বিদ্বেষ নাই। 'জাতি তুলিয়া' গালাগালি দেওয়ার যে অভিযোগ অমৃতলালের কয়েকখানি নাটক সম্বন্ধে করা হয়, এই নাটকখানি সেই দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। শিক্ষিতা নারীগণ অমৃতলালের ব্যঙ্গের পাত্র হইয়াছেন বলিয়া আর একটি গুরুতর অভিযোগ অমৃতলালের বিরুদ্ধে আছে। "বাহবা বাতিক" প্রহসনে আমরা দেখিব, অন্যান্য সমস্ত চরিত্র বাতিকগ্রস্থ হইলেও সুস্থমস্তিষ্ক একমাত্র ইংরাজী-শিক্ষিতা আধুনিকা নারী ফেনিলারই আছে। সুতরাং এই একখানি মাত্র নাটকের আলোচনা করিলেই অমৃতলালের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগেরই খণ্ডন হইয়া যায়। শৈলীর দিক্ দিয়াও নাটকখানি প্রশংসার দাবী করিতে পারে। সুরুচিসঙ্গত ব্যঞ্জনাপূর্ণ ভাষায় নাট্যকার এই গ্রন্থখানিতে হাস্য-রসাত্মক সংলাপ সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। এই নাটকে যেমন কতকগুলি বাতিকগ্রস্ত লোক আছে, তেমনি কয়েকটি বুদ্ধিমান্-বুদ্ধিমতীও আছে যাহারা সত্য সত্যই ইহাদের স্বরূপ ধরিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ বা বুদ্ধিমতী বলিয়া কেহই অকারণ উপদেষ্টার আসনে বসিয়া বক্তৃতা করে নাই, একই জীবনরসের সকলেই ভোক্তা মাত্র। তাই অমৃতলালের এই নাটকখানি সর্বতোভাবে প্রচারাত্মক রূপ পরিহার করিয়া সত্যকার সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্রসৃষ্টি ও কাহিনী-রূপায়ণের দিক্ দিয়া 'গ্রাম্য বিভ্রাট' যেমন অমৃতলালের শ্রেষ্ঠ রচনা, কবিত্বপূর্ণ, সুকৌশল ব্যঙ্গাত্মক সংলাপ-সৃষ্টিতে তেমনি 'বাহবা বাতিক' অমৃতলালের প্রতিভার চরম নিদর্শন। এই দুইখানি নাটকের শৈলী

'বাহবা বাতিক' নাটকের বৈশিষ্ট্য

যদি অমৃতলালের অন্ত কোনো রচনায় সার্থকভাবে সমাবিষ্ট হইত, তাহা হইলে অমৃতলাল সত্য সত্যই বাংলা সাহিত্যে মলিয়ারের ন্যায় যুগস্রষ্টা নাট্যকার বলিয়া পূজিত হইতেন। কিন্তু তাহা হয় নাই।

এইবার আমরা 'বাহবা বাতিক'-এর আলোচনা করিব।

'প্রস্তাবনা'র 'গীতি'টি নাটকের সত্যকার ভূমিকা। বাঙালী বাবুরা রাজত্ব করিবেন, ইংরাজ যদি পলাইয়া যায় তাহা হইলে; ইংরাজ থাকিতে নহে। অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ শক্তিমান্ ইংরাজকে শক্তির বলে এবং বুদ্ধির বলে বিতাড়িত করিয়া দেশ স্বাধীন করার ক্ষমতা ভেতো বাঙালীর নাই, তাহাদের মুখেই শুধু আস্ফালন। ইংরাজ যদি চলিয়াও যায়, তবুও ইহারা দেশের কোন উপকারেই লাগিবে না, তখন দেশে 'সাত-পাগলের হাট' বসিয়া যাইবে এবং ভানুমতীর ভেলকী 'কিম্বা নটবরের নাচ' সুরু হইবে। কারণ, যে মনীষা এবং চরিত্রবল থাকিলে দেশকে পরিচালনা করা যায়, তাহা ইহাদের মধ্যে নাই। ইহাদের কেহ উকিল, কেহ নকলনবীশ, কেহ নারীর পদাশ্রয় করিয়া দাস সাজিয়া পৌরুষবিহীন হইয়াছে, কেহ কাগজের সম্পাদক হইয়া শুধু গালাগালি করিয়াই চলিয়াছে। স্ত্রী সঙ্গে না থাকিলে উহারা রাস্তায় স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারে না, 'পথে হোঁচট খায়'। নিবদ্ধ-কীর্তনের গৌরচন্দ্রিকা যেমন বলিয়া দেয় কৃষ্ণলীলা বা চৈতন্যলীলার কোন্ পালা গান করা হইবে, এই প্রস্তাচনা-সঙ্গীতটিও তেমনি জানাইয়া দেয় বাঙালী চরিত্রের কোন্ দিক্ লইয়া নাট্যকার প্রহসন রচনা করিবেন।

দমদমা রাস্তার ধারে বাঁশবন। নটবর উপস্থিত, নটবর এখানে একদল পাগলের মেলা দেখিতে আসিয়াছে। তবে ইহারা একেবারে পাগল নয়, ইহাদের অর্ধেক পাগলামি এবং অর্ধেক ভিরকুটি। হাতে কোনো কাজ নাই বলিয়া বড়দিনে নটবর ইহাদের লইয়া একটু মজা করিতে আসিয়াছে। বাঙালীদের একটা দল রাজা হইতে মাতিয়া উঠিয়াছে। নটবর ইহাদের জন্ত 'অক্কা-ফক্কা' নাম করিয়া একটি দ্বীপ আবিষ্কার করিয়াছে, অচিরেই ইহাদের লইয়া সেই দ্বীপে রাজত্ব করিতে যাত্রা করিবে।

নটবর প্রস্থান করিলে সীতাহরণ, বেচারাম, ভাবেন্দ্র, গোপাল ও ফেলিলা প্রবেশ করিল। বেচারাম ও সীতাহরণের মধ্যে আগে হইতেই আলাপ চলিতেছিল, সীতাহরণের দম্ভোক্তি যে, তাহাকে একবার রাজত্ব করিতে দিয়া দেখুক, সে ঠিকমতো চালাইতে পারে কিনা। বেচারাম তাঁহাকে প্রশ্ন করিল, "তবে কেন বলেন যে, আপনি সংসার-খরচের হিসেবপত্র রাখতে পারেন

না, বলেন যে যা পারে চুরি করে, বাসন-কোসন কাপড়-চোপড় আজ কিনুলে কাল থাকে না।" অর্থাৎ বেচারামের বক্তব্য হইল এই যে, যে-ব্যক্তি নিজের সংসারটিই চালাইতে পারে না, সে একটা বিরাট দেশ কি করিয়া শাসন করিবে? যে বাঙালী এত অকর্মণ্য, যে নিজের ঘর-সংসারটুকু গুছাইয়া চলিবার যোগ্যতা তাহার নাই, তাহার দেশ-স্বাধীন করিয়া সেই দেশের রাজকার্য পরিচালনা করার কল্পনা উন্মত্ততা-মাত্র। বচনবাগীশ বাঙালীর উত্তরটি সীতাহরণের মুখে শুনা গেল। "ওসব petty catheration ছুটকো কাজ আমার ভাল লাগে না। আমার মতন এত বড় একটা মস্ত মাথা ক্রাসড উইথ গ্রামার এ্যাণ্ড রেটরিক, ফিলজপি এ্যাণ্ড লজিক, যে মাথার উপর সলি, বেন, হ্যামিলটন, হাক্স্লে বাসা বেঁধে আছেন, সেই মাথা কি আমি তুচ্ছ আলুপটল, গাড়ু-গামছার খবরদারি কর্ত্তে ·· ··· ···সাড়ে তিন পাইয়ের হিসেব রাখ্‌তে খরচ কর্ব?" বাঙালী বই পড়িয়া বই হইয়া গিয়াছে, কাজের কাজ কিছু করিবার যোগ্যতা তাহার নাই, কিন্তু শিক্ষিত বলিয়া অকারণ দম্ভটি আছে। নিজের ঘরসংসার সুন্দরভাবে গুছাইয়া চলা বাঙালীর মতে ছোটকাজ, এই ছোটকাজ করিয়া সে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির অপমান করিবে কেন? একেবারে বিরাট কিছু করিয়া বসিবে। বড়কাজ করিতে হইলে যে ছোট কাজ দিয়া আরম্ভ করিতে হয়, এ-কথা বাঙালীকে বুঝানো যাইবে না। অক্স্ফোর্ডের এম. এ. অন্য কাজ হাতে না পাইয়া রাস্তায় বসিয়া জুতা সেলাই করিতে পারেন আবার যথাসময়ে তিনিই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি হন। শিক্ষাভিমানী বাঙালীকে এই উদাহরণ দিয়া বুঝানো যাইবে না। যাহাতে উদ্‌ভাবনী প্রতিভা ও শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন বাঙালী সেদিকে যাইতেছে না। বেচারাম বাঙালীর প্রশংসায় মুখর। কিন্তু আর একটি দিকে যে শ্রমবিমুখ বাঙালীর সমূহ সর্বনাশ হইতেছে, বেচারামের সেদিকে দৃষ্টি নাই। ব্যঙ্গের মাধ্যমে হেনিলা সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল। বাঙালী দিন দিন 'বাতে, পক্ষাঘাতে, ম্যালেরিয়ায়' ভুগিয়া ক্ষীণস্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছে। এই তথাকথিত শিক্ষিতেরা সেদিকে লক্ষ্য করিতেছে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে গেলে পাশের গ্রামের বাঁশ-বাগানের অন্ধকারে ভাঙা কুঁড়ের বসিয়া বঙ্গমাতা যেখানে ম্যালেরিয়া-জ্বরাক্রান্ত সন্তানকে কোলে করিয়া কাঁদিতেছেন, তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়াই সত্যকার দেশসেবা। তাহা না করিয়া ভাববিলাসী বাক্যবাগীশ বাঙালী হিমালয়ের চূড়ায় এক অদ্ভুত 'ভারতমাতা'র কল্পনা করিয়া ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে তাহার চরণে ভাবাশ্রু বিসর্জন করিতেছে। দেশপ্রেমের নামে ইহা ন্যাকামি নয় কি?

এই পৌরুষবিহীন পুরুষগুলি নিজেরা যেমন তৈরী হয় নাই, তেমনি নিজেদের স্ত্রীকেও যোগ্যা করিয়া তুলিতে পারে নাই। কোনো দিন পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। ফেলিলা বলিতেছে, "আপনারা যদি রাজা হন, তা হলে এই গেরস্ত অবস্থায় স্ত্রীরাই সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসনে উঠবে, না Competitive Examination করে কিংবা ভোটের বন্দোবস্তে নতুন নতুন রাণী বাছাই ক'রে নেবেন?" উক্তিটির তাৎপর্য এই যে বাঙলার গৃহিণীরা এখন কেহ উকিলের স্ত্রী, কেহ কেরাণীর স্ত্রী; ভাত রাঁধা, ছেলেমেয়েদের পালন-পোষণ করা ইহাই এখন সাধারণতঃ তাহাদের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্তব্য। তাহাদের মধ্যে ইহা হইতে অন্য সম্ভাবনাও কিছু দেখা যাইতেছে না, তাহাদের পতিদেবতারাও তাহাদিগকে অন্য কিছু করিয়া তুলিতে পারিতেছে না; বাঙালী বাবুরা যখন রাজত্ব পাইয়া বসিবেন, তখন অর্ধাঙ্গিনী সহধর্মিণী-হিসাবে ইহাদিগকে বর্তমান অবস্থায়ই গ্রহণ করিবেন তো? কারণ, রাজার স্ত্রী রাণীকে তো শুধু সহধর্মিণী হইলেই চালবে না, সহকর্মিণীও হইতে হইবে। রাজকার্য-পরিচালনায় তাহারও সমান অংশ আছে। যদি বলা যায়, স্বাধীন বাঙালী 'রাজা'-রা স্ত্রীগণকে নিজগুণে তৈরী করিয়া লইবেন, সে গুড়েও বালি। কারণ, ইঁহারা জীবনে মাত্র দুইটি রাজকার্যের সঙ্গেই নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়াছেন, তাহাতেই ইহাদের যাহা কিছু দক্ষতা জন্মিয়াছে। ইহারা কেরাণীগিরির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরীক্ষা দিতে পারেন এবং ভোটের বাক্সে চোখকান বুজিয়া একখানি কাগজ ফেলিয়া আসিতে পারেন। স্ত্রীগণকেও কি উহারা ঐ দুইয়ের একবিধ উপায়ে যোগ্য করিয়া তুলিবেন? অন্যদিক্ দিয়া স্ত্রীগণ বরং বেশী যোগ্যতার দাবী রাখে। তাহারা সংসার করিতে পারে, এই অকেজো পুরুষগুলি তাহাও পারে না।

এই তো গেল বাঙালীর রাজকার্যে দক্ষতা বা কর্মক্ষমতার পরিচয়। এইবার বাঙালীর সৎসাহস এবং গোপন বিদ্রোহাত্মক কার্যাবলীর পরিচয় পাওয়া যাইবে। উর্মিলা প্রবেশ করিয়া অতি রুক্ষভাবে তাহার স্বামীকে বলিল, "তুমি আমায় কার কাছে ফেলে চলে গেলে?" উত্তরটি অতি সহজ। চাঁদমারীতে এদিক-সেদিক গুলি ছুটিতেছে দেখিয়া বীরবর ভাবেন্দ্র পলাইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু সকলে এই বাঁশবনে ঢুকিয়াছে কেন? "গূঢ় অভিপ্রায়ে" "নিভৃত নিকুঞ্জে" "গোপন পরামর্শ" করিতে। সামান্য একটা বন্দুকের আওয়াজ যাহারা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য স্ত্রীকে ফেলিয়া পালায়, তাহারা কিনা দেশোদ্ধারের বিপ্লবাত্মক গোপন পরামর্শ করিবার জন্য

বনে ঢুকিতেছে? ইহা হইতে কৌতুককর আচরণ আর কি হইতে পারে? অথচ মুখে বীরত্বের আস্ফালন করিতে ইহাদের তুল্য ব্যক্তি আর কেহ নাই। দুইটি গোরা টলিতে টলিতে মাতাল হইয়া রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া ফেনিলা উদ্বেগ প্রকাশ করিল। তাহাকে তাহার স্বামী সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "আমি দাঁড়িয়ে, সাধ্য কি যে ওরা এদিকে আসে!" অথচ পরবর্তী কালে দেখা যাইবে যে, সাহেব দেখিয়া তিনিই আগে চম্পট দিবেন। এই কাপুরুষদের আবার নিজেকে কেও-কেটা করিয়া জাহির করিবার প্রচণ্ড বাতিক থাকে, সেজন্য হাজার গণ্ডা মিথ্যা কথা তাহারা সৃষ্টি করিতে ইতস্তত: করে না। গোপাল নিজের পরিচয় দিতে 'পাল'-বংশের এক বিরাট তালিকা প্রস্তুত করিল। কিন্তু এই বাচালতা ইহাদের স্ত্রীরাও পছন্দ করে না। গোপালের প্রতি তাহার স্ত্রীর ব্যঙ্গবাণী লক্ষ্য করিবার মতো।

"হে রাজবংশ-অবতংস অস্থিমাংস-দগ্ধকারী কাংস্যবণিক! না জেনে না চিনে, তোমার হৃদয়সরসীবাসী ফেনিলা কলহংসী না জানি কতই উপহংস— দূর ছাই, উপহাস করেছে।" ফেনিলার শ্লেষ চমৎকার। গোপাল রাজা হইয়াছে, তাহার উপযুক্ত রাজমহিষী চাই। ফেনিলার মতে মানবী মহিষী হইলে চলিবে না—"শুনেছি শোনপুরের মেলা থেকে সম্প্রতি চিৎপুরে পালে পালে মহিষী আমদানী হয়েছে, হে পালবংশধর! তাদের মধ্যে গোটাকতক বাছাই করে আনিয়ে আপনার-বামে বসান!" পৌরুষ এবং মনুষ্যত্ববিহীন পুরুষ যদি রাজা হইতে যায়, তাহা হইলে তাহাকে মানবী মহিষী দেওয়া যায় না, পশুরাজ্য হইতে স্ত্রী-মহিষ বা "মহিষী"-র আমদানী করিতে হয়!

রমানাথ স্বামি-স্ত্রীর এইরূপ আলাপে বাধা দিয়া বলিল, 'আসল কাজের কি হ'ল?" গোপালের মতে শ্রেষ্ঠ পুরুষেরা কখনও কাজ করে না। তাহারা কি করে? ঊর্মিলা ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "আসুন, সকলে সিরিয়স্ হ'য়ে গোটাকতক রেজোলিউসন্ পাশ ক'রে ফেলা যাক্।"

এই তথাকথিত দেশনায়কগণ কাজের কাজ কিছুই করিতে পারে না; সভায় বক্তৃতা করিতে পারে; আর, বক্তৃতা করিয়া লম্বা লম্বা প্রস্তাব আনয়ন করিতে পারে মাত্র। সভা-সমিতিতে দুই-চারিটি বক্তৃতা করিয়াই ইহারা সব কাজ শেষ করিতে চায়। ঊর্মিলা বলিতেছে, "বেশ তো, কাজ করতে বল। ডাক পাড়, হাঁক পাড়, গলা ছেড়ে স্পীচ ঝাড়ো, বধিরকারী তারস্বরে সমবেত সভ্যগণকে, সমস্ত দেশকে কাজ করতে বলো, সমস্ত দেশের লোক কাজ করুক আর না করুক, বলতে থাকি—কাজ কর কাজ কর—কথা নয় কাজ।

তাদের সঙ্গে যদি আমরা কাজ করতে যাই, তাহলে কাজ করতে বলবে কে?" অর্থাৎ দেশে 'বকা'-উল্লার সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে, 'করম'-উল্লার একান্ত অভাব। ফেনিলা ,উর্মিলার এই উপহাসের তীব্রতা বাড়াইয়া দিতে গিয়া বলিল, "ওলো থাম্, মারা যায় গরীব বালিকা।" ইহা যে প্রশংসা নয়, নিন্দা, তাহা বুঝিবার মতো বুদ্ধিও ইহাদের নাই। তাই ফেনিলার কথার পর সকলে আনন্দে "হিপ্ হিপ্ হুররে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। রমানাথ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "না না—স্থাসস্থাল চিয়ার দাও, স্থাসন্থাল চিয়ার।" যাহারা দেশের জন্য কাজের কাজ কিছুই করিবে না, মুখেই দেশোদ্ধার করিবে, তাহাদের কার্যাবলী 'বাঁদরামি' ভিন্ন কিছুই নয়। তাই নেপথ্যে বানরগণ "হুক্কু হুক্কু" করিয়া উঠিলে, রমানাথ বলিয়া উঠিল "ঐ শোন ডারউইনের আদিপুরুষগণ সুর ধরিয়ে দিচ্ছে, ধর হুক্কু হুক্কু।"

নটবর আসিয়া প্রবেশ করিল। কথায় কথায় নটবর ফেনিলাকে বলিল, "সুন্দরি! তুমি থাকতে এদের চিকিৎসা করানো হয়নি!" নটবর ফেনিলাকেই এই কথা বলিতে পারে। ইহারা উন্মাদ, বায়ুরোগগ্রস্ত, নটবর এবং ফেনিলাই তাহা বুঝিয়াছে। কিন্তু যাহাদের ব্যঙ্গ করা হইতেছে, তাহারা ইহার অর্থ বুঝে নাই। তাই গোপাল জিজ্ঞাসা করিতেছে, "চিকিৎসা! কিসের চিকিৎসা?" অন্য সকলের চক্ষে ইহারা উন্মাদ হইলেও নিজেদের পাগলামি ইহারা ধরিতে পারে না—ইহাই ইহাদের জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিশাপ। ধরাইয়া দিলেও ইহারা কোনোদিন সংশোধিত হইবে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। তাই ফেনিলা বলিতেছে, "না না, ও একটা এসোটরিক কথা, নটবরবাবু বুঝেছেন,আর আমি বুঝেছি।" ইহাদিগকে কিছু বুঝাইবার উপায় নাই। ইহারা একান্তভাবে আত্মম্ভর এবং অন্যকে কিছুতেই বিশ্বাস করে না। ইহারা মনে করে, জগতে আর কেহই ইহাদের চেয়ে বেশী বুঝে না। ফেনিলা বলিতেছে, "তা ওঁরা আপনা-আপনি এখনও ঠিক করে উঠতে পারেন নি; আর করতে পারলেও কেউ কারু কাছে খুলে বল্‌বেন না। এঁরা অদ্বৈতবাদী; নিজেকে ছাড়া আর দ্বিতীয় লোককে বিশ্বাস করেন না।"

নটবরের গানে ইহাদের মনের কথা এবং চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ পাইল। ইহারা পরস্পরকে অবিশ্বাস করে এবং একে অন্যকে ইংরাজের গুপ্তচর মনে করে, সত্যকার দেশের কাজ ইহারা কেহই করিতে চাহে না, যে কোনো প্রকার সুযোগে আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। কেহ বাড়ী-গাড়ীর মালিক হইতে চেষ্টা করিতেছে, কেহ কলমের জোরে কাগজের সম্পাদক

হইতেছে, কেহ হইতেছে পৌরসভার সদস্য। কেহ বা চাঁদা আদায় করিয়া তাহা হইতে একটা বৃহত্তর অংশ নিজে আত্মসাৎ করে, অর্থাৎ সকলেই অকাজের গোঁসাই, কিন্তু সত্যকার কাজের কাজ করিবার সময়ে ইহাদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ইহাদের দ্বারা সম্ভবপর নয়, অথচ দেশ স্বাধীন করিয়া শাসন করিবার বাসনা ইহাদের আছে। ইহারা 'এজিটেশন' করিয়াই দেশোদ্ধার করিবে, এজিটেশনের অর্থ ইংরাজের কৃপা ভিক্ষা করিয়া দরখাস্ত করা। ফেনিলার কথায় "এ্যাপ্লিকেসন, পিটিসন।" নটবর বলিল, "এসো, তোমাদের দরখাস্তদেবীর মন্দিরে উপনীত করি, তাঁর বরে তোমরা অক্কা-ফক্কা দ্বীপের রাজা হবে।"

দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। অক্কা-ফক্কা দ্বীপ। গোপাল, ভাবেন্দ্র, নটবর, উর্মিলা, ফেনিলা ইত্যাদি উপস্থিত। Sea-Sickness-এ সকলকে কাতর করিয়াছে। উর্মিলা তো একেবারে মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিল। নটবর বলিল, তাহার বাসকেটের ভিতর কমলালেবু আছে। আনিয়া গোটাকয়েক খাইলেই সকলে সুস্থ হইবে। কিন্তু সকলেই "যাও যাও" "কমলালেবু আন" বলিয়া "চীৎকার ও ব্যস্ততা প্রদর্শন" করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই আনিতে গেল না। ইহারা এত ভীরু, অকর্মণ্য, বাক্যবাগীশ যে এতটুকু নড়িয়া একটা কমলালেবু আনিবার যোগ্যতা ইহাদের নাই, অথচ ইহারা রাজত্ব করিতে আসিয়াছে। কিন্তু কমলালেবু যখন আসিল, তখনকার অবস্থা লক্ষ্য করিবার মতো—সবচেয়ে অসুস্থ হইয়াছিল দুঃখীরাম, তাহাকে না দিয়া আগে উর্মিলাকে খাওয়ানোর জন্য সকলে ব্যস্ত হইতেছে। দুঃখীরামের উক্তি লক্ষ্য করিতে হইবে—"এই তো কমলালেবু ছিল, আর আমি যখন চাইলুম, তখন কেউ কথা কইলেন না।.......এই বুঝি সাম্য, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃভাব ?.........আমি তো মূর্চ্ছা যাব বলে ভয় দেখালেই সাতজনে এনে দিবে না ?.........দেখছি এ ভারতে যার স্ত্রী নেই, তার কেউ নেই।"

যাহাদের মুখে সাম্য ও দেশপ্রেমের বুলি, তাহারা যদি একবার দেশ-শাসনের অধিকার পাইয়া বসে, তাহা হইলে আগে নিজেদের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া লইবে, নারীর প্রতি দুর্বলতাবশতঃ তাহাদের পক্ষপাতী হইবে এবং যাহারা সত্যকার দরিদ্র ও বঞ্চিত, তাহাদিগকে আরো বঞ্চনা করিবে। অমৃতলাল যেন ভবিষ্যৎ ভারতের দৃশ্য কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ফেনিলা নারীর স্বাভাবিক দয়া এবং কর্তব্যবোধ হইতে দুঃখীরামকে কমলালেবু দিতে গেল। গোপাল বলিল, "তোমার স্বামীর প্রতি তোমার আগে মনোযোগ দেওয়া

উচিত।” ফেনিলা ইহাদের কর্তব্যবোধ জাগাইবার জন্ত তীব্র ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, “প্রজার কান্নায় কর্ণপাত করা রাজমহিষীর তার চেয়ে বেশী কর্তব্য।” ইহাদের মধ্যে এক বাক্যবীর “বিজ্ঞানকৃষ্ণ” আছেন, তিনি আস্ফালন করিয়া বলিলেন, “কি! আমি থাকতে কমলালেবুর জন্ত প্রজাদের কষ্ট? আপনারা সায়েন্স জানেন না, তাই এক বোঝা কমলালেবু কষ্ট ক'রে এতদূর ব'য়ে এনেছেন, ও কটা ফুরিয়ে গেলে একেবারে হেল্‌প্‌লেস্‌ হ'য়ে পড়বেন; কিন্তু আমার সঙ্গে এমন জিনিস আছে যে, তার দ্বারা অগণন কমলালেবুগণ প্রসব হ'তে পারবে।” বৎসর বৎসর বন্তায় কীটের উৎপাতে অজন্মায় রাশি রাশি ফসল নষ্ট হইয়া যাইতেছে দেখিয়াও যাঁহারা সত্যকার কোনো প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না; অথচ “ফসল বাড়াও” আন্দোলনের বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া দস্তরী-হিসাবে হাজার হাজার টাকা মারিতেছেন, অমৃতলালের এই ‘বিজ্ঞানকৃষ্ণ’ তাঁহাদেরই পূর্বপুরুষ। অমৃতলাল নাটকে একজন কন্‌ট্রাক্‌টর এবং বাস্তমন্ত্রীর চরিত্র সৃষ্টি করিলে আরো ভাল হইত।

যাহা হউক, ইহারা রাজত্ব করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু নূতন দেশে নিজেদের ক্ষমতায় উপনিবেশ-স্থাপনের জন্ত উপকরণ কিছুই আনেন নাই। কেহ দুইটা জামা, কেহ বা দুইখানি বই লইয়া আসিয়াছেন। ভাবেন্দ্র বলিল, “আমরা কি ইতর ছোটলোক পরাধীন দাস, যে, নিজের হাতে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করবো, তবে ভোগ করবো!” অর্থাৎ অমৃতলাল বলিতে চাহেন যে, এই বাক্যবীরগণ এতই অকর্মণ্য অপদার্থ যে ইংরাজেরা কোনো দিন ইহাদিগকে দেশ ছাড়িয়া দিয়া গেলেও ইহারা নিজেরা দেশের উন্নতি করিতে পারিবে না। নটবর ইহাদের চরিত্র জানে। তাই নটবরের উক্তি, “নটবরের ইচ্ছায় সাহেবেরা তাঁবু ফেলে দেবে, সাহেবরাই দানা-ঘাস দেবে।” ফেনিলা ইহাদের স্বরূপ জানে, তাই ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেছে, “আমি চিরকেলে গুছুনে গিন্নী-বান্নি মানুষ, আমায় কি কিছু বলতে হয়, আমি যা-যা এনেছি, একটু পরে সকলেরই তা দরকার হবে।·········এই ধরণে মধ্যম-নারায়ণ তৈল, তারপর দু' শিশি মাস্‌টার্ড, পাগলের বৈদ্যুতিক মহৌষধ, আট বাণ্ডিল লাক-লাইন ছড়ি, দু' ডজন পাগলা-কালীর বালা······।”

সব আস্ফালন মাটি হইল—বন্দুক-হস্তে বোড্‌ল্যাম্‌ সাহেব প্রবেশ করিলেন, বাঙালী বীরপুঙ্গবেরা এইবার সত্য সত্যই ভয় পাইল। গোপাল রেড্‌ক্রশ রুমাল উড়াইবার জন্ত ব্যস্ত হইল। সাহেব লিউনেটিক কমিশনার, ইহাদিগকে তত্ত্বাবধান করিতে আসিয়াছে। ফেনিলা বলিল, “স্বাধীন হও, আর যা হও, সাহেব,

সাহেব! দেখলেই সেলাম কত্তেও হয়,—দরখাস্তও দিতে হয়।" সুতরাং গোপাল মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া ইংরাজী ভাষায় দরখাস্ত পেশ করিতে আরম্ভ করিল।

সাহেব ইহাদিগকে যে উপদেশ দিয়া গেল, ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কে বেচারামের উক্তিতে আমরা তাহা শুনিতে পাই। "সাহেব বলেন যে, রাজ্য করবে বটে, কিন্তু বিলেতের সঙ্গে টক্কোর দেবে কেমন করে? আগে সব কলকারখানার কাজ শেখো, রেলওয়ে ওয়ার্কসে যাও, জেসফের বাড়ী যাও, কানপুরে, বোম্বায়ে, দিশি লোকের মিল আছে সেখানে যাও।"

যোগ্যতা অর্জন না করিয়া স্বাধীন হইবার আহাম্মকীর প্রতি অমৃতলাল এই নাটকে কটাক্ষ করিয়াছেন এবং তাহা সার্থকভাবেই করিয়াছেন।

শৈলী-সম্বন্ধে দুই-চারিটি কথা বলিয়া অমৃতলাল-প্রসঙ্গ শেষ করিব। যাঁহারা অমৃতলালের রচনায় কোনো গুণই খুঁজিয়া পান নাই, তাঁহারা অমৃতলালের রচনার কয়েকটি মারাত্মক দোষ আবিষ্কার করিয়াছেন—তাঁহাদের মতে অমৃতলালের রচনায় কোনো সুসংবদ্ধ কাহিনী নাই, বাংলার বহুমুখী বিচিত্র সমাজ-জীবনের সঙ্গেও অমৃতলালের নাকি কোনো পরিচয় ছিল না, তিনি শুধু উত্তর কলিকাতার সমাজের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। আমরা 'গ্রাম্য বিভ্রাট' নাটকে পল্লীর সমাজ-জীবন ও গ্রাম্য লোকের চরিত্র-সম্বন্ধে অমৃতলালের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছি। মাণিক, রামনাথ স্মৃতিরত্ন, নেপাল পাঁঠা প্রভৃতি চরিত্রগুলি 'সহুরে' নয় এবং অবাস্তবও নয়। অমৃতলালের রচনায় সুসম্বদ্ধ কাহিনী নাই ইহা সত্য। এ সম্বন্ধে ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের বক্তব্যটি মূল্যবান্ বলিয়া মনে করি। "গিরিশ-চন্দ্রের নাটকে জীবনের গভীরতর আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিবার চেষ্টা আছে। অমৃতলালের নাটক-প্রহসনে তাহা নাই। থাকিবার কথাও নয়, কেননা অমৃতলালের উদ্দেশ্য কৌতুকরসের সৃষ্টি এবং হাসির ছলে জাতীয় ও সামাজিক অসঙ্গতির দিকে শিক্ষিত সাধারণের চোখ ফেরানো। অমৃতলালের কৌতুকনাট্যে কখনো কখনো ব্যক্তিবিশেষ উদ্দিষ্ট হইলেও বিদ্বেষ-বিষজ্বালা নাই। নাট্যকারের সহানুভূতি তাঁহার কৌতুকপাত্রকে অনেক সময়েই মানুষের মর্যাদা দিয়া উপহাসের তুচ্ছতার উর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছে।"

অমৃতলালের প্রহসন-আলোচনায় একটি বিশেষ দিক্ প্রায়ই উপেক্ষিত হইয়া থাকে। সঙ্গীত-সৃষ্টিতে অমৃতলালের দক্ষতা ছিল অনেকখানি।

মনোমোহন বসু যাত্রা-গানের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার করিয়াছিলেন তাঁহার গীতাভিনয়গুলিতে। 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা'-গ্রন্থে এবিষয়ে যথাযোগ্য আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া বর্তমান গ্রন্থে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না, প্রসঙ্গতঃ দুই-একটি কথা বলিব।

অমৃতলালের গান

আনন্দ বা বিষাদ উভয়েরই উচ্ছলতা-প্রকাশের জন্য গানের প্রয়োজন হয়। সুতরাং গুরুগম্ভীর ট্র্যাজেডীর মধ্যে গানের যতখানি প্রয়োজন আছে, লঘুজীবনের আলেখ্যপূর্ণ কমেডীতেও তেমনি গানের স্থান রহিয়াছে। তাই অমৃতলালের প্রহসনগুলিতেও গানের বহুলতা দেখা যায়। তাঁহার প্রস্তাবনা-সঙ্গীতগুলি নাটকের বস্তু নির্দেশ করে। কোন কোন নাটকে ঐ সঙ্গীতগুলির নাটকীয় মূল্য বিশেষ কিছুই নাই, কিন্তু অনেক নাটকে ঐ গানগুলি নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ। 'গ্রাম্য বিভ্রাট' এবং 'বাহবাবাতিক'-এর প্রস্তাবনা-সঙ্গীত দুইটি আমাদিগকে শুধু নাট্যকাহিনী বুঝিতে সাহায্যই করে না, নাটকের ঘটনা ও চরিত্রের উপর হাসির লঘুচ্ছন্দ সঞ্চারিত করে। বাংলা যাত্রার অনুকরণে অমৃতলাল অনেক সময়ে পাত্রপাত্রীর মুখে যাহা সংলাপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই আবার গানে পরিবেশন করিয়াছেন। কিন্তু অনেক সময়ে ইহা শুধু প্রয়োজনহীন দ্বিরুক্তিতে পর্যবসিত হয় নাই, উহা চরিত্র-বিকাশের সহায়ক হইয়াছে এবং বক্তব্যের পরিপূরক হইয়াছে।

'গ্রাম্য বিভ্রাটে'র মাণিকের গানগুলি উদাহরণ-হিসাবে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। মাণিক বলিতেছে, "ও বাবা! মহাপ্রভুও তাই লাট-খেতাব পেয়েছেন বুঝি। যে টাইটেলের বাজার, ফাঁক পড়বার যো কি! তবে এবার শুধু হরি হরি বোল নয়, (amen amen) 'এমেন এমেন বোল'! যা হোক ঘোষজার কল্যাণে যদি সাহেবেরা বৈষ্ণব হয়, তাহলে মালপোর সঙ্গে মাংস-পোলাও চল্‌তি হয়ে যায়। চেহারার মধ্যে একটু বৈমাত্র ভ্রাতার সৌসাদৃশ্য আছে।" বলিয়াই মাণিক গান ধরিল, "ওরে গোউর গোউর বোল। মহাপ্রভু মাই লর্ড এবার ঘুচে গেল গোল॥" মাণিক যদি গানটি না ধরিয়া শুধু ঐ কথাগুলি বলিয়াই থামিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহার বক্তব্যটি নিতান্ত রূঢ় আক্রমণে পর্যবসিত হইত। কিন্তু গানটি সুরপ্লাবনে যেমন আক্রমণের তীব্রতা কমাইয়া দেয়, তেমনি মাণিকের আপন-ভোলা পাগলা মনটিও এই সঙ্গীতের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া তাহার চরিত্রকে জীবন্ত করিয়া তোলে। আক্রমণের রূঢ়তা ও উদ্দেশ্যপ্রবণতা চরিত্রের আড়ালে আত্মগোপন করে। 'গ্রাম্য-বিভ্রাট'-নাটকের চতুর্থ দৃশ্যের গুরুমহাশয়ের নামতা শিখানোর প্রভাব পড়িয়াছে পরবর্তী কালে প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের 'ঋণংকৃত্বা'

নাটকে। ব্যঙ্গগীতি-রচনায় অমৃতলালের শক্তির পরিচয় তাঁহার বহু নাটকে লক্ষ্য করা যায়।

উপসংহারে আমরা বলিতে পারি, চরিত্রসৃষ্টি, কাহিনীবিন্যাস ও কৌতুকরস-পরিবেশনে অমৃতলাল নিশ্চয়ই বাংলা নাট্যসাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দাবী করিতে পারেন না, তাই তিনি নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার নহেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে প্রহসন-রচনায় ঐ তিনটি বস্তুর সার্থক সমন্বয় কাহারও মধ্যে এ পর্যন্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। কোন একটি দিকে উৎকর্ষ হয়তো অনেকেই দেখাইয়াছেন। সুতরাং অমৃতলালের রচনার দোষ ও গুণ উভয়ের বিচার করিয়া বাংলা প্রহসন-সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান নির্দেশ করিতে হইবে, তাহা হইলে অমৃতলালকে অপাংক্তেয় মনে করিবার কারণ বিশেষ কিছুই থাকিবে না। তিনি মধু-দীনবন্ধুর পথে চলেন নাই সত্য, তিনি ছিলেন মলিয়ারের ভক্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুগামী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যাহার আরম্ভ করিয়াছিলেন, অমৃতলাল তাহাই পরিপুষ্ট করিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি অমৃতলালেরই অনুসরণ করিলেন। পরবর্তী কালের প্রসিদ্ধ প্রহসনকার প্রমথনাথ বিশী ভাবের দিক্ দিয়া বহু ক্ষেত্রে অমৃতলালেরই অনুপন্থী।

পঞ্চম অধ্যায়

[দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় 'কল্কি অবতার'-প্রহসন লিখিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের আসরে যখন প্রথম অবতীর্ণ হন, তাহার পূর্বে অমৃতলালের অনেকগুলি নাটক ও প্রহসন রচিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার উপর অমৃতলালের প্রভাব অনেকখানি পড়িয়াছে—ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু পরবর্তী কালে দ্বিজেন্দ্রলাল কয়েকখানি মোটামুটি ভাল নাটক রচনা করিলেও প্রহসন-রচনায় তিনি কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। কারণ, প্রহসন-রচয়িতার যতখানি নির্লিপ্তি থাকিলে সমাজের দোষত্রুটী লইয়া হাসিতে পারা যায়, দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে তাহার অভাব ছিল। তাঁহার ব্যঙ্গ গালাগালিতে পর্যবসিত হইয়াছে। সমাজের নক্‌সা আঁকিতে গিয়া তিনি ব্যক্তিগত আক্রমণ চালাইয়াছেন। 'আনন্দবিদায়'-এ রবীন্দ্রনাথকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। 'ত্র্যহস্পর্শ' এবং 'প্রায়শ্চিত্ত'-প্রহসন দুইখানিতে অমৃতলালের রচনার প্রভাব পড়িয়াছে। অমৃতলালের 'একাকার', 'বাবু', 'রাজাবাহাদুর' প্রভৃতি প্রহসনে যেটুকু বাস্তবতাগুণ এবং শিল্পপ্রতিভার পরিচয় আছে, দ্বিজেন্দ্রলালের এই রচনাগুলিতে তাহাও মিলিবে না। বাংলা প্রহসন-সাহিত্যের ক্রমবিকাশে দ্বিজেন্দ্রলালের দান তাই বিশেষ কিছুই নাই। তাঁহার 'পুনর্জন্ম' প্রহসনখানিও নিতান্ত লঘু রচনা, ইংরাজী হইতে লওয়া, সুতরাং উহার আখ্যায়িকার জন্য তিনি মৌলিকতার দাবী তেমন কিছুই করিতে পারেন না। তবুও দ্বিজেন্দ্রলালের আলোচনার যোগ্য প্রহসনমাত্র ঐ একখানিই। কাহিনী-পরিবেশন এবং চরিত্রচিত্রণের জন্য প্রহসনখানি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে। আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত দর্শকের ঔৎসুক্য ও কৌতূহল বজায় থাকে, ভাষাও বেশ সরস এবং উপভোগ্য। বইখানির আর একটি বিশেষ গুণ যে, এই একখানি মাত্র প্রহসনেই দ্বিজেন্দ্রলাল সমাজের প্রতি বিদ্বেষ এবং ব্যক্তি-বিদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। তাই তাঁহার প্রহসনের মধ্যে ঐ একখানি মাত্রই সাহিত্য-পদবাচ্য হইয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন-নাট্যশৈলী

প্রহসনখানি মলিয়ারীয় ভঙ্গীর। যাদব চক্রবর্তীর চরিত্রের দুইটি বিশেষ অসঙ্গতি ও দুর্বলতা-অবলম্বনে প্রহসনখানির সৃষ্টি হইয়াছে। যাদব ধনী হইলেও মহাকৃপণ, টাকা খরচ হইবে মনে করিয়া সে ছেলেদের লেখাপড়া শিখায় নাই, ছেলে দুইটি অমানুষ হইয়াছে। স্ত্রীকেও সে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে রাখে

নাই,—পাছে টাকা খরচ হয়। প্রাণপণ যত্নে সে সমস্ত অর্থ লোহার সিন্দুকে পুরিয়া রাখিয়াছে, খাতকদের নিকট হইতে কষিয়া সুদ আদায় করিতেছে। তাহাকে কেহই নিন্দা বই প্রশংসা করে না। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সৌদামিনী—সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। যাদবের ভগিনীপতি উকিল অশ্বিনীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে স্বামীকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিল। যাদবের চরিত্রের একটি দুর্বলতা অশ্বিনী ধরিয়া ফেলিয়াছে, 'শালার জ্যোতিষশাস্ত্রে ভারি বিশ্বাস।' অশ্বিনী এবং সৌদামিনী এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিল। কোষ্ঠীতে লেখা আছে, দোসরা বৈশাখ দুপুরবেলা নিজের বাড়ীতে যাদবকে সাপে কামড়াইয়া মারিবে। যাদব মৃত্যু এড়াইবার জন্য মল্লিকপুকুর গিয়া একগলা জলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। তাহা হইলে আর কি করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে সাপে কাটিয়া মারিবে?

পুনর্জন্ম

এদিকে অশ্বিনীর ষড়্‌যন্ত্র পাকাপাকি জমিয়া উঠিয়াছে—নন্দ, জলধর, জীবনকৃষ্ণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি যাদবের বাড়ীতে উপস্থিত, জলধর শুইয়া পড়িল, অন্যান্য সকলে তাহাকে ঘিরিয়া বসিল এবং অশ্বিনী জলধরের উপর চাদর বিছাইয়া দিল। সকলকে খুব দুঃখ প্রকাশ করিতে বলিয়া অশ্বিনী প্রস্থান করিল। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, যাদব মহানন্দে বাড়ী ফিরিয়াছে, কোষ্ঠীও তাহা হইলে মিথ্যা হয়। দুপুর যখন বাজিয়া গিয়াছে, তখন যাদব আর মরিবে না, কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াইয়াছে। এদিকে বাড়ীতে যাদব চক্রবর্তীর মৃত্যু হইয়াছে। শ্মশানে তাহাকে সৎকার করিতে লইয়া যাওয়া হইল। যাদব যতই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে যে, সে মরে নাই, ততই কেহ সে কথা বিশ্বাস করিতেছে না। জীবন, জ্যোতিষ, নন্দ প্রভৃতি মিলিয়া যাদবকে বলিতেছে যে, সে নকল যাদব সাজিয়া আসিয়াছে, কিন্তু সাজ পুরাপুরি ঠিক হয় নাই, অন্ততঃ নাকটা ঠিক হয় নাই। যাদব চক্রবর্তী মারা গিয়াছে শুনিয়া খাতকেরা আসিয়া আনন্দ করিতেছে, যাদব নালিশ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার ভয় দেখাইতেছে, কিন্তু খাতকেরা উলটিয়া যাদবকে নকল যাদব প্রমাণ করাইয়া পুলিশে ধরাইয়া দিবে বলিতেছে। জ্যোতিষাদি যখন জলধরকে খাটিয়া শুদ্ধ উঠাইয়া হরিবোল বলিতে বলিতে শ্মশানে লইয়া গেল, তখন যাদবের সন্দেহ হইল, "এরা কাকে শ্মশানঘাটে নিয়ে গেল! যাদব চক্রবর্তীকে? তবে আমি কে?" দ্বিতীয় খাতক বলিল, 'ধাপ্পাবাজ!" কেহ তাহাকে বলিতেছে 'সং', কেহ বলিতেছে "মারো

বেটাকে !” যাদব যতই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছে যে, সে-ই প্রকৃত যাদব, ততই খাতকেরা অস্বীকার করিতেছে। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলিয়া তাহাকে প্রহার আরম্ভ করিল। যাদব অনুপায় হইয়া পাহারাওয়ালাকে ডাকিতে লাগিল, এমন সময়ে অশ্বিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। যাদব ভাবিল, এইবার গণ্ডগোল মিটিবে। কিন্তু অশ্বিনী আসিয়া গণ্ডগোল আরও পাকাইয়া তুলিল। কোষ্ঠীতে যখন লেখা আছে, ডাক্তার যখন সার্টিফিকেট দিয়াছে এবং খবরের কাগজেও যখন ছাপা হইয়া গিয়াছে, তখন যাদব চক্রবর্তী আর কি করিয়া বাঁচিয়া থাকে ? সুতরাং অশ্বিনী উকিল বলিল, “আপনি যে যাদব চক্রবর্তী, তা খুব সন্তোষকর ভাবে প্রমাণ করতে পারবেন না।”

মৃত্যুর পরে তাহার কি অবস্থা হইবে, যাদব তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিল। ভগিনীপতি অশ্বিনী যাদবের estate-এর administration লইবার যোগাড় করিতে লাগিল। স্ত্রী সোদামিনী অশ্বিনীকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল। যাদব চক্রবর্তী মরিয়াছে বলিয়া প্রতিবেশীরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, তাহার শ্যালকেরা আসিয়া জিনিষপত্র টানিয়া বাহির করিতেছে, সেগুলি তাহারা নিজেদের বাড়ী লইয়া যাইবে। পুত্রগণ সম্পত্তির ভাগাভাগি লইয়া এখনই ঝগড়া বাধাইয়া দিয়াছে। যাদব নিজের সম্পত্তির এই শোচনীয় পরিণতি দেখিতেছে আর ছট্‌ফট করিতেছে, সে কাহারও নিকট কিছুতেই প্রমাণ করিতে পারিতেছে না যে, সে বাঁচিয়া আছে। এমন কি, তাহার স্ত্রীও তাহাকে দেখিয়া চিনিতে না পারিয়া ভয়ে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। এই সকল অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া যাদব প্রায় পাগল হইয়া উঠিল, তাহার নিজের অস্তিত্বেই তাহার সংশয় জন্মিল। নিজের গায়ে চিম্‌টি কাটিয়া, মাথা ঘুরাইয়া সে পরীক্ষা করিয়া দেখিল সে বাঁচিয়া আছে কি না। মরিয়াছে, ইহাও সে ভাবিতে পারিতেছে না, আবার বাঁচিয়া আছে, ইহাও সে প্রমাণ করিতে পারিতেছে না, সুতরাং এটা বাঁচাও নয়, মরাও নয়, এ বাঁচা ও মরার একটা খিচুড়ী। ক্রমে চৈতন্যোদয় হইতেছে, সে বুঝিতে পারিতেছে যে “কৃপণেরা নিজে না খেয়ে আর অন্যজনকে বঞ্চিত করে টাকা রেখে যায় শুধু ছেলেদের ওড়াবার জন্য।” সুতরাং যাদব ঠেকিয়া শিখিল, আর সে কৃপণতা করিবে না। কিন্তু কে এখন প্রমাণ করিবে যে, সে যাদব চক্রবর্তী আর সত্য সত্যই সে মরে নাই ? দুশ্চিন্তার অস্থিরতায় যাদব এতই অভিভূত হইয়াছে যে, সে আত্মবিস্মৃত হইবার জন্য মদ্যপান করিতেও আপত্তি করিতেছে না—‘দুত্তর হোক দাও।’ এই মদ্যপান যখন স্বীকার করিতেছে যে, সে যাদব

চক্রবর্তী, যাদব যেন অনেকখানি আশ্বস্ত হইল। সে পুনরায় মদ্যপান করিবার পূর্বে উহাদিগকে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করাইয়া লইতেছে, "আমি কিন্তু যাদব।" কিন্তু এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে তাহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে যে যাদব চক্রবর্তীর নিজের অন্তরেও সংশয় দৃঢ় হইয়াছে, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিলাম। মদ্যপান করিয়া যাদব চক্রবর্তী যখন নেশায় অভিভূত হইয়া মূর্ছিত হইল, তখনও সে আত্মসমর্থন করিতেছে, "আ—মি—যাদব—চক্কর্বর্তি"—। কিন্তু তাহার অবচেতন-মন হইতে সংশয়াকুল জিজ্ঞাসা বাহির হইয়া আসিল, "না তাত নই, তবে—আমি কে?" শুধু সংশয় নয়, তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সে যাদব নয়, অন্য কেহ, তাই সে বলিয়া উঠিল—"কে ভাই যাদব এলি?" এইবার যাদব সত্য সত্যই মরিল, অশ্বিনী ও সৌদামিনীর চক্রান্ত সফল হইল। এই মূর্ছা যাদব চক্রবর্তীর মানসিক মৃত্যুর প্রতীক, সুতরাং মূর্ছাভঙ্গের পর যাদব নূতন রূপ লইয়া বাঁচিয়া উঠিল।

দুঃখের কঠোর আঘাতে মানুষের যখন চৈতন্য ঘটে, তখন তাহার মনের গতি অনেক সময়ে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়। পূর্বে তাহার যাহা করিবার বা ভাবিবার সামর্থ্য ছিল না, এখন সে তাহা অবাধে ভাবিতে ও করিতে পারে, আর সেই চিন্তা ও কর্ম তাহার পূর্বজীবনের চিন্তা ও কর্মের সম্পূর্ণ বিপরীতও হয়—যাদবের মনোরাজ্যে এমন ধরনের একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন হইয়াছে। পরিবেশ এতক্ষণ যাদবকে লইয়া হাসিয়াছে, কিন্তু যাদব এখন পরিবেশকে লইয়া বিজ্ঞের মতো হাসিতেছে। ঘটনা ও চরিত্রের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিবার মতো। দারোগা আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, যাদবই যাদব চক্রবর্তী কিনা, প্রথমে সে স্বীকার করিল। বলিল, "আজ্ঞে আমি।" কিন্তু দারোগা যখন তাহাকে বাঁধিতে আদেশ করিয়া, আবার জিজ্ঞাসা করিল তুমি "যাদব চক্কত্তি", যাদব তখন তামাসা করিয়া বলিল, "কোন পুরুষে নই বাবা!" দারোগাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, "দারোগা সাহেব! আপনারা সর্বশক্তিমান্ তা জান্তাম, কিন্তু তার উপর যে সর্বজ্ঞ তা জান্তাম না।"

যাদব এইবার বুঝিয়াছে যে, সে এতদিন ভুল করিয়া আসিয়াছে। সে বুঝিল, এবার সত্য সত্যই তাহার "পুনর্জন্ম" হইল। মৃত্যুর পরে যাহা যাহা ঘটিবে, সে তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইল। সে এখন থেকে গরীব-দুঃখীকে আর নিজেকে বঞ্চিত করিবে না। না খাইয়া পরের অপব্যয়ের জন্য টাকা রাখিয়া যাইবে না। যদি সে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণ না করিতে

পারে, তবে বনে যাইবে। এমন সময়ে সৌদামিনী ও অশ্বিনী প্রবেশ করিল। যাদব ইহাদের ব্যবহারে মনে মনে বিরক্ত হইয়াছে, তাই অশ্বিনীকে দেখিবা-মাত্র করজোড়ে প্রণাম করিয়া বলিল, "মহাশয় প্রণাম।" সৌদামিনীকেও প্রণাম করিয়া বলিল, "কি আজ্ঞা হয়?" এই দুইজন ষড়্‌যন্ত্রকারীকে ইহা হইতে সংক্ষেপে অথচ তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করা সম্ভবপর নয়। অশ্বিনী ও সৌদামিনী যখন যাদবকে 'যাদব চক্রবর্তী' বলিয়া স্বীকার করিতেছে, তখন যাদব কিন্তু তাহাতে আর প্রসন্ন হইতেছে না, বরং সে তপস্বী হইয়া বনে যাইবে বলিয়া ঠিক করিয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহাকে বনে যাইতে হইল না, এই হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়া কৃপণ যাদব চক্রবর্তীর শিক্ষা হইল, সে 'পুনর্জন্ম' লাভ করিল।

নাটকের কাহিনীটি খুব যে একটা কিছু গুরু-গম্ভীর, তাহা নহে। কাহিনীর জটিলতাও তেমন কিছু নয়। প্রহসনে গুরু-গম্ভীর জটিল কাহিনীর প্রয়োজন নাই। ব্যক্তিচরিত্রের কয়েকটি দুর্বলতার সুযোগ লইয়া নাট্যকার এই শিক্ষামূলক প্রহসনখানি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রহসনের লক্ষ্যই এই যে তাহাতে ব্যক্তিচরিত্র রূপায়িত হইলেও ঐ ব্যক্তিটি হইবে সমাজের অন্তর্গত একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাহা হইলে তাহার ঐ সাধারণীকৃত চরিত্র সাহিত্যে হাস্যের উপাদান হইবে। যাদব চক্রবর্তীকে দ্বিজেন্দ্রলাল কৃপণ-সমাজের প্রতিনিধি করিয়া সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। এই প্রহসনখানির সৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার শক্তিমত্তার চরম পরিচয় দিয়াছেন। কি হাস্যকর পরিস্থিতি ও পরিবেশ-সৃষ্টিতে, কি চরিত্র-রূপায়ণে, কি সংলাপ- ও সঙ্গীত-পরিবেশনে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার প্রহসনখানিতে যে উৎকৃষ্ট নাট্য-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্বে ও পরে বাংলার অনেক নাট্যকারই দেখাইতে পারেন নাই।

এই নাটকের চরিত্রগুলি যেমন ঘটনা সৃষ্টি করিতেছে, তেমনি ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে চরিত্রেরও সৃষ্টি হইতেছে, সংলাপ তাই চরিত্র-নিরপেক্ষ বক্তৃতায় পর্যবসিত হয় নাই। নাটকটি একটি সার্থক একাঙ্কিকা। একাঙ্কিকা রচনা করা সার্থক গীতিকবিতা-রচনার মতোই কঠিন। পঞ্চাঙ্ক বা একাঙ্ক নাটকের মধ্যে যেমন ঘটনার উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও উপসংহারের স্তরগুলি সুস্পষ্টভাবে দেখাইতে হয়, একাঙ্কিকায়ও একই অঙ্কের মধ্যে কাহিনীর উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং উপসংহার ঠিক তেমনি করিয়া সৃষ্টি করিতে হয়। 'পুনর্জন্মে' একটি দৃশ্যেই নাট্যকার ঘটনা-বিন্যাসের ও চরিত্র-সৃষ্টির সেই

অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। নাটকের আরম্ভেই আমাদের কৌতূহল জাগরিত হয়। অশ্বিনী ও সৌদামিনীর আলাপের সূচনায়ই আমরা বুঝিতে পারি, যাদব চক্রবর্তী-সম্বন্ধে তাহারা একটি ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছে। কিন্তু এই ষড়্‌যন্ত্র হীন নয়, ইহার উদ্দেশ্য মহৎ, যাদব চক্রবর্তীকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিয়া তাহার স্ত্রী ও ভগিনীপতি কিছু উপকারই করিবে।

বুদ্ধিমান্ লোককে ঠকানো সহজ নহে। তাহাকে লইয়া তামাসা করিতে গেলে সে পাল্‌টা তামাসা করিয়া জব্দ করিবে। তাই যাহাকে লইয়া তামাসা করিতে হইবে, তাহার চরিত্রের এমন কোনো দুর্বলতা বাহির করিতে হইবে যে, সেই দুর্বলতা পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে নিতান্ত অসঙ্গত ও হাস্যোদ্দীপক হইলেও উহা ঐ ব্যক্তির চরিত্রের মূলে বাসা বাঁধিয়াছে। উহার অসঙ্গতি ও অকিঞ্চিৎকরত্ব সে কিছুতেই উপলব্ধি করিতে পারিবে না। তাই নিজের চরিত্রের অসঙ্গতিকে জীবনীয় মহদ্‌গুণ বলিয়া ধরিয়া লইয়া সে এমন সব অসঙ্গত কর্ম করিবে যাহা পরিস্থিতিকে আরো হাস্যোদ্দীপক করিয়া তুলিবে। কিন্তু এই অসঙ্গতি তাহার বা পরিবেশের কোনো গুরুতর অনর্থ সৃষ্টি করিতে পারিবে না। পারিপার্শ্বিক অন্তরে অন্তরে হাসিয়া বাহিরে গুরুগম্ভীর আচরণ করিবে এবং কথনো বা ভয়ানক পরিস্থিতি-সৃষ্টির অভিনয় করিবে। ব্যঙ্গের পাত্র সেই কৃতক গাম্ভীর্যের মর্মভেদ করিতে না পারিয়া যতই নিজের বিপন্ন সত্তাকে রক্ষা করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠিবে, প্রহসনের হাস্যরস ততই জমিয়া উঠিবে। কিন্তু যদি সে একবার তাহার ভুল বুঝিয়া সতর্ক হয়, তাহা হইলে তাহাকে লইয়া আর হাসা যাইবে না, অথবা সে যদি অসঙ্গতির চরমে গিয়া এমন কিছু করিয়া বসে যাহাতে সত্য সত্যই শোচনীয় পরিণামের সূচনা হয়, তাহা হইলে হাসিতে হাসিতে আমরা কান্নার সৃষ্টি করিব। প্রহসনকার সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করিতে পারেন না, কান্নার সম্ভাবনা দেখা দিলে তাঁহাকে সুকৌশলে থামিতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জন্ম'-প্রহসনে আমরা দেখিতে পাই যে নাট্যকার ঠিক জায়গায় থামিতে জানেন। নাটকখানি লঘুনাট্যের ভঙ্গী ত্যাগ করিয়া গুরুগম্ভীর ট্র্যাজেডীতে পরিণত হইতে পারিত; কিন্তু নাট্যকার কিছুতেই তাহা হইতে দেন নাই। প্রহসনের ভঙ্গী তিনি আদ্যন্ত বজায় রাখিয়াছেন।

কোষ্ঠীতে বিশ্বাস করা যাদব চক্রবর্তীর চরিত্রের একটি প্রধান দুর্বলতা। তাহার স্ত্রী ও ভগিনীপতি এই দুর্বলতার সুযোগ লইয়াছে, কিন্তু তাহারাও যে যাদবকে লইয়া শুধু হাসিবে, কোনো গভীর ষড়্‌যন্ত্র করিবে না, তাহা বুঝা

যায় তাহাদের চপল আলাপ ও আচরণে। সৌদামিনী যখন ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে, তখনও সে গান করে। গানগুলির বক্তব্যই পরিস্থিতির গাম্ভীর্যকে বারে বারে লঘু করিয়া দিয়া ঘটনাকে হাল্‌কা পাখায় উড়িতে দিতেছে। যাদব যখন তাহার মতে অবধারিত মৃত্যুকে এড়াইবার জন্ম মল্লিকপুকুরে গলাজলে গিয়া বসিয়া রহিয়াছে, তখন সৌদামিনী গান গাহিতেছে, "বঁধু হে, আর কোরো না রাত, শুকিয়ে যাচ্ছে তোমার বাড়া ভাত।" বিরহিণী স্ত্রী স্বামীর প্রতীক্ষায় রাত্রি জাগিয়া কাটাইতেছে। কিন্তু ইহা কি সত্যই বিরহ না বিরহ-কৌতুক? এখানে কোকিলের কুহুরব শুনিয়া মূর্ছা যাইবার প্রসঙ্গ নাই; "মত্ত দাদুরী" ও "ডাহুকী" ডাকিয়া ছাতি ফাটাইয়া দিতেছে না; "ঘরের মধ্যে বিষম মশা, অসাধ্য এখানে বসা" এবং তাহা হইতেই বিরহিণীর দশমী দশার উদ্ভব হইয়াছে। বিরহ-পরিবেশের ঠিক বিপরীত পরিবেশ সৃষ্টি করে. বলিয়া এই গানখানি নাটকের হাস্যরস পুষ্ট করে। হাস্যরস-সৃষ্টিতে সৌদামিনীর আর একখানি গানও কতখানি সহায়ক হইয়াছে, আমরা তাহা লক্ষ্য করিব। যাদবের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর সৌদামিনী একখানি গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিতেছে। কিন্তু ইহা কি সত্য সত্য শোক?

শোক পূর্বস্মৃতির রোমন্থন। দয়িতের অভাবে তাহার স্মৃতিগুলি কেমন করিয়া দয়িতাকে পীড়িত করিবে, শোক-ক্রন্দনের উপকরণ তাহাই হয়, তাহার গুণগুলি তখন স্মরণের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। তাহার সঙ্গে দয়িতার ব্যক্তিগত জীবনের ভোগের যে সম্পর্ক ছিল, শোকের কান্নায় সেগুলির স্থান মোটেই হয় না। যদিও বা হয়, তবে তাহা আরো গুরুতর প্রসঙ্গান্তর বুঝাইবার জন্ম সংহতভাবে, ইঙ্গিতে বা ব্যঞ্জনায়। বিরহিণী নায়িকা তখন বিয়োগ-বেদনায় ব্যক্তিগত জীবনের ভোগের দিক্‌টা ভুলিয়া যায়, বরং কি করিয়া তাহার এই অসহ্য জীবনের অবসান হইবে, অনেক সময়ে সেই চিন্তা করিতে থাকে বা সেই চেষ্টাও করে। কিন্তু সৌদামিনীর ক্রন্দন ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। "রেঁধেছি ইলিশ মৎস্য, থিচুড়ি ও ছাগবৎস। একা আমারই খেতে হবে (ও গো) তুমি নাহি খেলে গো॥" যাদবের কানাকড়ির বুদ্ধি থাকিলে এই তামাসা বুঝিতে পারিত, কিন্তু তাহা না পারিয়া সে এই কপট কান্নাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইল। পরিস্থিতির এই বৈপরীত্য, যাদবের এই অজ্ঞতাই হাস্যোৎপত্তির কারণ হইয়াছে, পারিপার্শ্বিক যাদবকে উত্তেজিত করিয়া, ক্ষেপাইয়া, মজা করিতেছে। এই মজার অর্থভেদ করিতে না পারিয়া যাদব

যখন সত্য সত্যই বিভ্রান্ত হইয়া উঠিয়া উন্মত্তের ন্যায় আচরণ করিতে লাগিল, নাট্যকার তখন পরিস্থিতির মোড় ফিরাইয়া দিলেন।

মদ্যপান করিয়া যাদব যেখানে মূর্ছিত হইল, নাট্যকাহিনীর সেখানেই চরমোত্থান। তারপর ঘটনা অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিল। নাটকের সমাপ্তিতেও আমরা নাট্যকারের দক্ষতার পরিচয় পাই। নিজের চোখের সামনে নিজের সঞ্চিত অর্থের ভবিষ্যৎ পরিণামের অভিনয় দেখিয়া যাদবের যখন চৈতন্য হইয়াছে, তখন কিন্তু আর সে কোষ্ঠীতে বিশ্বাসী, অর্থপিশাচ, বোকা যাদব নয়, এখন সে পুনর্জন্মপ্রাপ্ত পরিবর্তিত বুদ্ধিমান্ যাদব চক্রবর্তী। নাট্যকার যদি বিরক্ত, মর্মাহত, দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত যাদবকে বনে পাঠাইতেন, তাহা অস্বাভাবিক না হইলেও আকস্মিক হইত এবং নাটকের আদ্যন্ত যে হাস্যরসের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা বাধা পাইত। তাই তিনি যাদবকে বনে পাঠান নাই সত্য, কিন্তু সন্ন্যাসী করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। যাদবের মন হইতে কৃপণোচিত ধনাসক্তি দূর হইয়াছে, ইহাই তাহার সন্ন্যাস। যাদব বুঝিতে পারিয়াছে যে ইহা তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য তাহার স্ত্রী ও ভগিনীপতির ষড়্যন্ত্র মাত্র। তবুও সে যতখানি ব্যথিত ও মর্মাহত হইয়াছে, তাহার জ্বালা সে ভুলিতে পারিতেছে না। নাটকের সমাপ্তিতে যাদবের উক্তিগুলি নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে, অপমানিত ও অভিমানাহত মন তাহাকে বেশী কথা বলিতে দিতেছে না। তাই অশ্বিনী যখন বলে, "এখন যাদববাবু—কিছু শিক্ষা হোল?" তখন যাদব অতি অল্প কথায় উত্তর করিল, "অনেক—এ আমার পুনর্জন্ম।' এখানেই নাটকের সমাপ্তি হইলে খুবই ভাল হইত। অমৃতলালের অনুসরণে উপসংহারে যাদবের মুখে একখানি গান না দিলেই চলিত। কারণ, যাদবের মনের যাহা অবস্থা, তাহাতে তাহার মুখে গান আসিতে পারে না। গম্ভীর হইয়া মুখ বুঁজিয়া থাকাই তাহার উচিত ছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসন-সম্বন্ধে মোটামুটি এই বলিয়া আমরা শেষ করিতে পারি যে এক 'পুনর্জন্ম' ভিন্ন দ্বিজেন্দ্রলালের কোনো রচনাই সার্থক হয় নাই। পুনর্জন্মের গৌরবও তাহার বিষয়বস্তুর জন্য নয়, শিল্পোৎকর্ষের জন্য। দ্বিজেন্দ্রলালের এই শিল্প-প্রতিভা যদি নির্লিপ্তভাবে সামাজিক প্রহসন-রচনায় নিয়োজিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার দানে বাংলা নাট্যসাহিত্য আরও অনেকখানি সমৃদ্ধ হইত। কিন্তু 'পুনর্জন্মে'র মধ্যে যে প্রতিভার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা গেল, 'আনন্দবিদায়'-এ তাহার সন্ধানও মিলিল না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

[রাজকৃষ্ণ রায়, উপেন্দ্রনাথ দাস ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ]

রসরাজ অমৃতলাল বসু বাংলা নাট্য-সাহিত্যে কমেডী-প্রহসনের যে বিশেষ ধারা পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন, দ্বিজেন্দ্রলাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রমথনাথ বিশী পর্যন্ত অনেকেই মোটামুটি সেই একই ধারার বিবর্তনে সহায়ক হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ কথা মনে রাখিতে হইবে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যখন বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করেন নাই, অমৃতলাল যখন কমেডী-প্রহসন-রচয়িতা-হিসাবে তাঁহার প্রতিভার মধ্যগগনে বিরাজমান, দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বাংলা নাট্য-সাহিত্যে প্রবেশ করেন, তখন প্রহসন-রচয়িতা-রূপে রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'গোড়ায় গলদ' এবং ১৯০৪ খৃস্টাব্দে তাঁহার 'চিরকুমার সভা' প্রকাশিত হয়। 'গোড়ায় গলদ'-এ না হউক, 'চিরকুমার সভা'য় রবীন্দ্রনাথের লঘুনাট্য-রচনার প্রতিভার চরমবিকাশ ও মৌলিকতার পরিচয় আমরা পাইলাম। 'গোড়ায় গলদ'-এর পরে এবং 'চিরকুমার সভা'র আগে সবেমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালের 'কল্কিঅবতার' নামক প্রহসন রচিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভার মতো নাট্য-প্রতিভাও এতখানি স্বাতন্ত্র্যের দাবি রাখে যে, তাঁহার নাট্য-রচনাকে এক নূতন যুগের সৃষ্টিরূপে গণ্য করিয়া স্বতন্ত্রভাবে উহার বিচার করিতে হয়। রবীন্দ্রযুগ হইতে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে মনস্তত্ত্বের যে বিশ্লেষণ আরম্ভ হইল, চরিত্রের ভাবে ও ভাষায় মননশীলতা যেমন প্রাধান্য পাইল, তাহার জন্য রবীন্দ্রনাথের রচনা দিয়াই বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আধুনিক যুগের সূচনা হয় বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ডাক্তার আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতো নিঃসঙ্কোচে এমন উক্তি করিব না যে 'বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন যোগ নাই।"* তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিব যে "নাট্য-রচনায় রবীন্দ্রনাথের যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আধুনিক যুগের লক্ষণ।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রযুগে বা রবীন্দ্রনাথের পরেই প্রহসন-সাহিত্যে আবির্ভূত হইলেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গী ও শিল্প-প্রতিভার সহিত তাঁহার যোগ বিশেষ কিছুই নাই, সেদিক্ দিয়া বরং অমৃতলালের সঙ্গেই তাঁহার যোগ বেশী। তাই

---

* বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস, ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা ৪৩১।

দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনগুলির আলোচনা করিতেছি। মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ নট ও নাট্যকার-রূপে বাংলা সাহিত্যে অমর আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কিন্তু প্রহসন বা লঘুনাট্য-রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বের দাবী করিতে পারেন না। বাংলা নাটকে হাস্যরস-পরিবেশনে তিনি অন্য দিকে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট 'পাগল-পাগলিনী', 'বিদূষক', 'কঞ্চুকী' প্রভৃতি চরিত্র অনবদ্য মৌলিক সৃষ্টি। ঐগুলির আলোচনা না করিলে বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা অনুসরণের একটি বিশেষ দিক্ বাদ থাকিবে। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের ঐ ধরনের চরিত্রগুলির আলোচনা দিয়া বর্তমান গ্রন্থ শেষ করিব।

বাংলা কমেডী-প্রহসনের ক্রমবিকাশের ধারা-নির্ণয়ে অমৃতলালের পরই রবীন্দ্রনাথের নাম করিতে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আলোচনা করিতে হইলে বাংলা নাট্য সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারার আলোচনা অনিবার্য হইয়া উঠে, উহা বাংলা সাহিত্যে গীতিনাট্যের ধারা। বাংলা যাত্রা-সাহিত্যের প্রভাবজাত অপেরা বা গীতাভিনয়ের বিবর্তনের ফলে বাংলা সাহিত্যে গীতিনাট্য গড়িয়া উঠিয়াছে। সেই যাত্রার প্রভাব ও তাহার অনেকখানি বৈশিষ্ট্যকে আপন প্রতিভার বলে আত্মীকৃত করিয়া লইয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ঋতুনাট্য, নৃত্যনাট্য এবং গীতিনাট্যগুলি পুষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার প্রহসনগুলিও এই প্রভাব হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ-সম্বন্ধে একটি পৃথক্ গ্রন্থে স্বয়ং-সম্পূর্ণ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। অমৃতলালের কিঞ্চিৎ পূর্বে বা পরে অনেক নাট্যকার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। প্রহসন-রচনায় তাঁহারা অনেকেই অমৃতলালের সমকক্ষ হন নাই। তবুও অনেকেই সামসময়িক কালে জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কয়েকজনের সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

রাজকৃষ্ণ রায় অনেকগুলি নাটক এবং প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার রচনায় সংখ্যার প্রাচুর্য থাকিলেও উৎকর্ষ তেমন কিছুই নাই। তাই বাংলা নাট্য-প্রহসন-সাহিত্যের ক্রমবিকাশে রাজকৃষ্ণ রায়ের দান উল্লেখযোগ্য নয়।

রাজকৃষ্ণ রায়

ডাক্তার সুকুমার সেন মহাশয় রাজকৃষ্ণ রায়-সম্বন্ধে বলিয়াছেন "রাজকৃষ্ণের প্রহসনে হাস্যরসের উৎকট কৃত্রিমতা অথবা গ্রাম্যতার আতিশয্য নাই।" রাজকৃষ্ণের প্রহসন সম্বন্ধে উহা হইতে বেশি কিছু বলিবার নাই বলিয়াই মনে করি। রাজকৃষ্ণ কাহিনীর রূপায়ণে এবং চরিত্রচিত্রণে তাঁহার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নাট্যকারদের অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু ঐ অনুকরণ তাঁহার ঋণকেই প্রকট করিয়া তোলে। অন্যের নিকট হইতে উপাদান গ্রহণ

করিয়া তাহাকে আরো সুন্দর করিয়া নূতন কিছু গড়িয়া তুলিবার মতো প্রতিভা তাঁহার ছিল না। 'টাটকা টোটকা' প্রহসনে রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব বর্তমান। বইখানি রামনারায়ণের 'চক্ষুদান' ও 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী' প্রভৃতি রচনা স্মরণ করাইয়া দেয়। রাজকৃষ্ণের 'আগমনী বিজয়া' ও 'দ্বাদশ গোপাল' প্রহসন অমৃতলালের প্রথম প্রহসন 'তিলতর্পণে'র আগেই রচিত হয়। কিন্তু উহার ভিতর মৌলিকত্ব কিছুই নাই। তাঁহার 'লোভেন্দ্র গবেন্দ্র', 'বেলুনে বাঙ্গালী বিবি', 'জুজু' প্রভৃতি প্রহসনে অমৃতলালের প্রভাব পড়িয়াছে। 'লোভেন্দ্র গবেন্দ্র' যে অমৃতলালের 'বিবাহবিভ্রাট' নাটকের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রচিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে এতটুকুও বিলম্ব হয় না। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে সর্বস্বান্ত করিয়া বরের লোভী পিতার অর্থলাভ করিবার প্রচেষ্টা এবং তথাকথিত শিক্ষিত পুত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অর্থের অপচয় করার বিষয় উভয় প্রহসনের অবলম্বন।

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় অভিনেতা-হিসাবে প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ছিলেন বলিয়া তাঁহার অনেক নাটক ও প্রহসন মুদ্রিত এবং অভিনীত হইয়াছিল। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় ঠিকই বলিয়াছেন—'এগুলির রচনায় কোনো বৈশিষ্ট্য নাই।' 'নাদাপেটা হাঁদারাম'-ছদ্মনামে রচিত তাঁহার প্রহসন 'আচাভুয়ার বোম্বাচাক' রচনা-হিসাবে মোটেই উন্নত নয়। রামনারায়ণ দীনবন্ধুর অনুসরণে ইহার মধ্যে সংলাপের ক্ষেত্রে কোথাও বা সংক্ষিপ্ত ছড়া, কোথাও বা দীর্ঘ অসার্থক অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ আছে। হরিমোহন রায় (কর্মকার) যে গীতিকার প্রবর্তন করিলেন, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে নাটক-রাসক সৃষ্টি করিলেন, তাহার আদর্শে গানের প্রাধান্য গ্রহণ করিয়া বিহারীলাল তাঁহার 'আচাভুয়ার বোম্বাচাক' নাটক রচনা করিলেন, কিন্তু উপকরণগুলি সামঞ্জস্য লাভ করিয়া সার্থক নাট্যসৃষ্টি হইতে পারে নাই। নাট্য-প্রহসনের মধ্যে গীতি ও ছড়ার প্রবেশে যে এক অভিনব ধরনের লঘুনাট্য-সৃষ্টির আয়োজন চলিতেছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'য় এই নূতন রীতির সার্থক রূপায়ণ হইয়াছে। বিহারীলালের নাটক-প্রহসনে বৈশিষ্ট্য বিশেষ কিছুই নাই, তবে তাঁহার 'নবরাহা' বা 'যুগমাহাত্ম্য' প্রহসনখানি-সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিবার আছে। প্রহসনখানির আরম্ভ অনেকখানি ব্যঙ্গনাট্য বা Parodyর মতো। তৃতীয় দৃশ্যে শান্তিপুরের রাজপথে ব্যাঘ্রচর্মের ফতুয়া গায়ে পাঞ্জাবী পাগড়ি মাথায় মহাদেবের, বেনারসী গাউন ও ব্রাহ্মিকা-ক্যাপ-পরিহিতা,

বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়

ইয়ারিং-কানে ভগবতীর এবং তল্পী-স্কন্ধে নন্দীর প্রবেশে বেশভূষার অসঙ্গতি উৎকট হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছে। নাটকের কাহিনী খুব জটিল নয়, কিন্তু সংলাপ স্বচ্ছ, সহজ ও তীক্ষ্ণ। নাটকটিতে অমৃতলালের প্রভাব সুস্পষ্ট। অমৃতলালের মতো বিহারীলালও মিউনিসিপ্যালিটির দোষত্রুটীর সমালোচনা করিয়াছেন। সংলাপে কোথাও কোথাও আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশ পাইলেও উহার ঋজুতা প্রশংসনীয়। কথ্যভাষার অনুসরণ মাঝে মাঝে এত স্বাভাবিক হইয়াছে যে উহাতে একেবারে পাত্রপাত্রীর মুখের কথার রঙ লাগিয়া গিয়াছে, সাহিত্যিকতার খাতিরে এতটুকুও কৃত্রিমতা প্রবেশ করে নাই, অথচ উহা একেবারে ঝরঝরে। অল্পকথায় চরিত্রগুলির স্বরূপ কেমন বিশ্লেষিত হইয়াছে তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি—'নবরাহা'র ষষ্ঠ দৃশ্যে দ্বিতীয় স্ত্রীলোকটি বলিতেছে, "যতক্ষণ আমরা অন্দরে থাকি ততক্ষণই আমাদের আবরু, একবার বাইরে বেরুলে, আমাদের আর পায় কে? ষাঁড়িনীর মতন ধাক্কা দিয়ে পুরুষগুলোকে গুঁতিয়ে ঠেলে দিয়ে বেড়িয়ে বেড়াই।" ধর্মের নামে, দেবতার নামে, পাণ্ডা পুরোহিতেরাই যে চাউল-কলা লুটিতেছে, অল্প-কথায় বিহারীলাল তাহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। অষ্টম দৃশ্যে ভগবতী বলিতেছেন, "ঠাকুরপো, আজ ভাই তুমি যে আমায় বড় লজ্জা দিলে! এত রাত্রে এখন কোথায় কি পাই বল দেখি? ঘরে যা আমদানী আসে, হালদার পূজোরীতে আমায় চোখেও দেখ্‌তে দেয় না, টেনে নিয়ে ঘরে পোরে। এ স্থানটি আমার অনেক দিনের প্রিয় বলে, মায়ার দায়ে কখন কখন এসে থাকি, কিন্তু এখানকার অত্যাচারে তিষ্ঠুতে না পেরে, আবার পালিয়ে যাই। আমাকে শুকিয়ে রেখে পাথুরে গাই করে তুলেছে। ক্রমাগত দুয়ে দুয়ে বাঁট দিয়ে রক্ত বার করে দেয়, কখনও ভক্তিভরে এক আঁজলা গঙ্গাজল কি একমুটো বেলপাতাও দেয় না।" বিহারীলাল বাঙ্গালীর ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও স্বার্থসিদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নাই।

অমৃতলালের সামসময়িক কালের অন্যতম নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস। উপেন্দ্রনাথের 'দাদা ও আমি' প্রহসনখানি সাহিত্যিক সৃষ্টি-হিসাবে খুব উৎকৃষ্ট নয়, তবুও একদিক দিয়া প্রহসনখানির মূল্য আছে। রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার-সভার অনেকখানি পূর্বাভাস নাটকটির মধ্যে আছে। 'চিরকুমার-সভা'র সভ্যগণ কোনোদিন বিবাহ করিবেন না বলিয়া নারীর সম্পর্ক একেবারে এড়াইয়া চলিতেন। শেষ পর্যন্ত দুইজন নারীর সাহচর্যে ও তাহাদের কৌশলে ইহারা বিবাহ করিতে বাধ্য হন। রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন,

উপেন্দ্রনাথ দাস

চিরকুমার-সভার এই সভ্য দুইটি যে নারী-সংস্পর্শ এড়াইয়া চলিতেন, তাহার কারণ নারী-সম্বন্ধে একটি বাসনা-সংস্কার উহাদের অন্তরে সুপ্ত ছিল। নারীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিলে সেই সুপ্ত বাসনা সক্রিয় হইয়া উঠিল। নারী-ভীত পুরুষদ্বয়ের মন সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া ফেলিল রমণীর ধ্যান ও ধারণা। রবীন্দ্রনাথের এই নাটকের দ্বন্দ্ব মনের বাহিরের ঘটনার নহে, তাই ঘটনার জটিলতা অপেক্ষা মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ নাটকে প্রাধান্য পাইয়াছে। সংলাপে লাগিয়াছে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার স্পর্শ। উপেন্দ্রনাথের 'দাদা ও আমি' প্রহসনেও ধীরেন্দ্র ও অনন্ত দুই ভাই কল্যাণী ঘটকীর প্রচেষ্টায় তরঙ্গিণী ও চারুহাসিনীর সঙ্গে প্রেমাসক্ত হইল এবং চারুহাসিনী ছোট ভাই অনন্তকে এবং তরঙ্গিণী বড় ভাই ধীরেন্দ্রকে বিবাহ করিল। চিরকুমার-সভার মতো এখানেও দুইজন নারী ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া দুইটি পুরুষের মনে নারী-বাসনা জাগাইতেছে। পুরুষ দুইটি স্মরণ-মনন-অনুধ্যানের মাধ্যমে নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া শেষ পর্যন্ত প্রেমে ডুবিয়া যাইতেছে। 'দাদা ও আমি' নাটকেও ঘটনার বহিরঙ্গ সংঘাত গৌণ; কাহিনীর গতি মন্থর। জটিলতার সবটুকুই মনস্তাত্ত্বিক। সুতরাং 'দাদা ও আমি' প্রহসনখানি 'চিরকুমার-সভার' অগ্রদূত। তাই বাংলা প্রহসন-সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় 'দাদা ও আমি' প্রহসনের মূল্য আছে।

বাংলার সর্বাধিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ নট ও নাট্যকার মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁহাকে বাদ দিয়া বাংলা নাট্যসাহিত্যের আলোচনা করিতে গেলে শিবহীন যজ্ঞ করার মতোই হইবে। 'বাংলাসাহিত্যে নাটকের ধারা' গ্রন্থে গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা-সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। বর্তমান গ্রন্থের আলোচ্য মুখ্যতঃ প্রহসন। প্রহসন-রচনায় গিরিশচন্দ্র বিশেষ মৌলিকত্ব দেখাইতে পারেন নাই। অবশ্য ইহাতে গিরিশচন্দ্রের অগৌরবের কিছুই নাই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কেন বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার হন নাই এই প্রশ্ন নিশ্চয়ই কেহ করিবেন না। কারণ, একই সাহিত্যিকের সাহিত্যের সমস্ত শাখায় প্রতিভার সমান প্রকাশ নাও হইতে পারে। 'জনা', 'প্রফুল্ল', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি নাটক-রচনার জন্য গিরিশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া আছেন এবং থাকিবেনও। তাই প্রহসন-রচনায় গিরিশচন্দ্র দক্ষতা বা মৌলিকতার পরিচয় না দিতে পারিলেও আপত্তির কিছুই নাই।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

গিরিশচন্দ্র কয়েকখানি প্রহসন ও পঞ্চরং বা রঙ্গনাট্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে 'আবু হোসেন', 'আলাদিন' প্রভৃতি জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল। তবে অনেক সময়ে জনপ্রিয়তা দিয়া সাহিত্যের চিরন্তন মূল্য বিচার করা যায় না।

গিরিশচন্দ্রের রচনার তালিকা প্রণয়ন করা আমার উদ্দেশ্য নয়, সুতরাং তাঁহার রচিত প্রহসন, পঞ্চরঙ প্রভৃতির নামোল্লেখে বিরত রহিলাম।

গিরিশচন্দ্র শ্রেষ্ঠ প্রহসন রচনা করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু হাস্যরস-সৃষ্টিতে তাঁহার দক্ষতা খুব কম ছিল না। তাঁহার সৃষ্ট 'বিদূষক', 'কঞ্চুকী' প্রভৃতি চরিত্র বেশ আকর্ষণীয়ই হইয়াছে। নিম্নস্তরের চরিত্রের মাধ্যমে হাস্যরস-পরিবেশনের ক্ষমতাও তাঁহার অসাধারণ ছিল। 'জনা' ও 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকের বিদূষক, কঞ্চুকী প্রভৃতি চরিত্রের আলোচনা করিয়া গিরিশচন্দ্রের হাস্যরস-পরিবেশন-ক্ষমতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

জনার বিদূষক চরিত্র

'জনা' নাটকের বিদূষক-চরিত্র বাংলা সাহিত্যের অমূল্য রত্ন। বিদূষক-চরিত্র অবশ্য বাংলা নাটকে মৌলিক সৃষ্টি নয়। এই চরিত্রটি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের হাতে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে অনেকখানি। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক প্রায়শঃ মূর্খ উদর-পরায়ণ ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ-বংশের 'ভুণ্ডভ'। তাহার রসিকতা প্রধানতঃ ভোজনবিষয়ক। বড় জোর এই ব্রাহ্মণটি দাসী-চাকরাণীদের সঙ্গে রহস্য করিয়া প্রাকৃতজনোচিতভাবে প্রাকৃত ভাষায় দুই-একটি গালাগালি করিয়াছে। 'কর্পূরমঞ্জরী' প্রভৃতি নাটকে ইহার নিদর্শন মিলিবে। কোন কোন নাটকে ভুলের মধ্য দিয়া গোপন রহস্য প্রকাশ করিয়া এই মূর্খটি নাট্যকাহিনী জটিল করিয়া ফেলিয়াছে। তবে বিদূষক চরিত্রের মহৎ গুণ আমরা দেখিয়াছি। কৃতজ্ঞতা, বন্ধুপ্রীতি এবং আশ্রয়দাতার উপকার করিবার বাসনা বিদূষকের সহজাত ধর্ম। রাজার উৎসবে, ব্যসনে বিশ্বস্ত বন্ধু সে; রাজাকে আনন্দিত রাখিবার, তাঁহার অন্তরের বিষণ্ণতা দূর করিবার, সমস্ত চেষ্টা সে করে। বিদূষক-চরিত্রের এই গুণের চরম বিকাশ হইয়াছে 'মৃচ্ছকটিক'-নাটকে।

মৃচ্ছকটিকের বিদূষক-চরিত্র সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে অভিনব। এই চরিত্রটি বাস্তবতা ও মানবিক আবেদনের দিক্ দিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের গতানুগতিকতা

[illegible]কে'র বিদূষক-চরিত্র

ভঙ্গ করিয়াছে। বিদূষক এখানে হাস্যরসের অবতারণা করে না, নায়ক চারুদত্তের বন্ধু সে, 'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ।' চারুদত্তের বিপদের দিনে সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া যায় না, অন্যের বাড়ীতে ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেও তাহার আপত্তি। কেহ কিছু না বলিলেও সে মনে মনে জানে প্রভুর গৃহে অন্ন নাই বলিয়াই সে আজ অন্যের অন্নে ক্ষুন্নিবারণ করিতে চলিয়াছে।

রদনিকার অপমানকে সে প্রভুর অপমান বলিয়াই গণ্য করে। সংস্কৃত নাটকের নায়কগণ বিদূষককে প্রায়ই 'সখা' বলিয়া সম্বোধন করেন। প্রায় ক্ষেত্রেই ঐ সম্বোধন নিতান্ত দয়াপ্রসূত। মৃচ্ছকটিকের বিদূষক কিন্তু চারুদত্তের সত্যকারের 'সখা'—'সমপ্রাণঃ সখা মতঃ।' চারুদত্তের প্রাণের সহিত এই ব্রাহ্মণের প্রাণের সম্বন্ধ, তাই চারুদত্তের বিপদের দিনে সে হাসিতে পারে না। বিভিন্ন ভোজ্যবস্তু-সম্বন্ধে সঙ্গত-অসঙ্গত কল্পনা করিয়া বাক্য, কার্য ও চিন্তা দূষিত অর্থাৎ বিকৃত করিয়া সে অসঙ্গতিজনিত হাস্যরস সৃষ্টি করে না। সুতরাং 'মৈত্রেয়' নামে বিদূষক, কিন্তু কার্যে মৈত্রেয় বা মিত্র-বংশসম্ভূত। নাটকে সে তাই একটি গৌণ পার্শ্বচরিত্র নহে, তাহাকে বাদ দিয়া চারুদত্তের কল্পনা অসম্ভব। এই নিত্যসঙ্গী সমপ্রাণ, কারুণ্যপূর্ণ, দৃঢ়চরিত্র, প্রভুভক্ত, আত্মমর্যাদা-সচেতন ব্রাহ্মণটি আদৌ মহাব্রাহ্মণ নহেন, মহান্ ব্রাহ্মণ। বিদূষক-চরিত্রের বিবর্তনে 'মৃচ্ছকটিক'-রচয়িতা যে উচ্চ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই।

গিরিশচন্দ্র মৃচ্ছকটিকের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন কিনা জানি না। হয়তো হন নাই, কারণ, কোনো শক্তিমান্ সাহিত্যিকই অন্যের রচনাকে আদর্শরূপে সম্মুখে উপস্থাপিত রাখিয়া অবিকল তাহার অনুকরণ করেন না। তবে গিরিশচন্দ্রের 'জনা'-নাটকের বিদূষক মৃচ্ছকটিকের এই মৈত্রেয়-জাতীয় চরিত্র। জনার বিদূষকচরিত্র-রূপায়ণে গিরিশচন্দ্র নিজের ধারণা, ভাবনা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আরও অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার দীক্ষাগুরু পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনাদর্শ শুধু যে গিরিশচন্দ্রের অশান্ত জীবনে শান্তির মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত করিয়াছিল, তাহাই নহে, গিরিশচন্দ্রের সাহিত্যের উপরও অমোঘ প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি নাটক তাহার ফল। জনার বিদূষক-চরিত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের প্রভাব পড়িয়াছে।

চরিত্রটির বিস্তৃত আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য পরিষ্কার করিতেছি—

নাটকের প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কেই আমরা বিদূষকের সাক্ষাৎ পাইতেছি। মাহিষ্মতীপুরী আজ আনন্দে পরিপূর্ণ, অগ্নিদেব প্রসন্ন হইয়া রাজা, রাণী, রাজপুত্র সকলকেই মনোমত বরদান করিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতে সকলের অভীষ্ট পূর্ণ হইবে। তাই বর পাইয়া সকলেই আনন্দে প্রস্থান করিল, কিন্তু বিদূষক নড়িল না। কারণ, মুনির মতো দূরদর্শী এই ব্রাহ্মণ। রাজপুরীতে 'হরি নিয়ে ছড়াছড়ি' তাহার মোটেই ভাল লাগে নাই। হরি কল্পতরু।

তিনি ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী, তাঁহার শরণ লইলে মানুষ সর্বপ্রকার বিপদ্-আপদ্ হইতে ত্রাণ পায়। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ হরিকে অন্যভাবে চিনিয়াছে, 'হরি' প্রকৃতভাবে 'হরণকারী'। তিনি ভক্তের জীবন-মান-ধন সমস্তই হরণ করেন, সর্বনাশ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। পুরাণ-ইতিহাসে ইহার উদাহরণের অভাব নাই। "পাথর চাপালেন মা-বাপের বুকে, তারপর বৃন্দাবনে ঝুঁকে গোপ-গোপিনীর হাড়ির হাল, যশোদা মাগী নাকাল, অবোধ রাখাল কেঁদে সারা, নন্দ মিন্‌সে দিশেহারা! আর রাধা? তাঁর কাঁদা সার, একশ' বছর দেখলেন আঁধার, এদিকে দয়াময় হরি যমুনাপার, কান দেন না কথায় কার, যেন কারুর কখনও ধারেন না ধার" হরি শুধু সর্বনাশই করেন না, তিনি নির্মম নিষ্ঠুর, বিপদের সময়ে তাঁহাকে খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না।

জনার বিদূষক-চরিত্র

বিদূষকের চরিত্রে হাস্যরসের উপাদান কোথায়? যখন পরিস্থিতিও পরিবেশের মধ্যে অমঙ্গল বা বিপদ্-আপদের কোনো লক্ষণই দেখা যাইতেছে না, তখন এই ব্রাহ্মণটি অকারণ একটা ভীতির কল্পনা করিতেছে। সুতরাং তাহার এই অসঙ্গত কল্পনার জন্য আমরা না হাসিয়া পারি না। যাঁহার পবিত্র নাম স্মরণ-মাত্র মহাবিপদ্ দূরীভূত হয়, সেই শ্রীহরির নামমাত্রেই বিদূষক সর্বনাশ কল্পনা করিতেছে। কিন্তু বিদূষক মূর্খ নয়, দূরদ্রষ্টা মনীষী। শ্রীমধুসূদনের চরম কৃপার ফলপ্রাপ্তির পূর্বে যেটুকু দুঃখ-কষ্ট-বেদনাযন্ত্রণা উপভোগ করিতে হয়, সেটুকু তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 'যে হয় তোমার অনুগত, তারে কাঁদাও অবিরত।' শ্রীহরি-সম্বন্ধে এই উক্তি যে বর্ণে বর্ণে সত্য। তাই বিদূষকের হাস্যকর অসঙ্গত উক্তির পশ্চাতে গভীর গম্ভীর জীবনবোধ বিরাজমান। তাহার উক্তিগুলি humourএর উদাহরণ; তরল হাসির নয়। চরিত্রটিই humour-এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অসঙ্গতি বিদূষকের বাক্যে নয়। অন্যকে ভুলাইবার জন্য বুদ্ধি করিয়া সে এই অসঙ্গত বাক্যগুলি উচ্চারণ করিতেছে না। সে যাহা বলে, তাহা বিশ্বাস করে। তাই নিজে সে ভুলক্রমে শ্রীহরির নাম মুখে আনে না। কারণ, তাহার বিশ্বাস, ডাকিলে শ্রীকৃষ্ণ মুক্তিদান করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইবেন। 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ' বাক্যটি এই বিদূষকের চরিত্রে প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া গিরিশচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে মহামানবগণ 'normally abnormal এবং abnormally normal,' সাধারণ মানুষের সঙ্গে আচারে-ব্যবহারে, কথায় বার্তায়, চালচলনে তাঁহাদের এতটুকুও মিল নাই। কিন্তু সাধারণ সংসারী মানুষ বুদ্ধিমান্ সাজিতে গিয়া

জগৎ ও জীবনের ব্যাপারে প্রায়ই ভুল করিয়া বসে, সে যাহা চায়, তাহা ভুল করিয়া চায়, বিধাতার স্বতঃস্ফূর্ত করুণার দান-হিসাবে সে যাহা পায়, তাহা চায় না। মহাকবি শেলীর কথায় বলিতে গেলে "We look before and after and pine for what is not"—মহামানবগণ এইরূপ বুদ্ধিমান্-বোকা সাজেন না। সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁহাদের চলা-বলার মিল না থাকিলেও চরমে কিন্তু তাঁহারাই পরম সত্যের অধিকারী হন। দক্ষিণেশ্বরের যে পূজারী ব্রাহ্মণকে লোকে পাগল বলিয়া উপহাস করিয়াছে, যিনি শিশুর মত সরল, সাধারণের চক্ষে চলন যাঁহার বোকার মতো, গিরিশচন্দ্র তাঁহার মধ্যে ভগবানের আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান-দর্শন অবিশ্বাস ও সন্দেহ আনিয়া একদিকে যেমন তরুণ বাঙ্গালী যুবকদের মনে সত্যকারের জিজ্ঞাসা জাগাইয়াছে এবং তাহাদিগকে কুসংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া জ্ঞানের সন্ধানে অভিযাত্রী করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি তাহাদিগকে জ্ঞানান্বেষণের অসমাহিত অন্ধকারে গোলক ধাঁধার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়া অশান্ত, বিভ্রান্ত ও বিক্ষিপ্তচিত্ত করিয়াছে অনেকখানি। এই জিজ্ঞাসা জ্ঞানের পিপাসা বাড়াইয়া তুলিয়াছে, কিন্তু পূর্ণপ্রাপ্তি বা তৃপ্তির সুধা পান করাইতে পারে নাই এতটুকুও। এই সর্বেন্দ্রিয়দাহকর অশান্ত জ্ঞান-পিপাসা এবং সত্যানুসন্ধানের উদগ্র কামনা মূর্ত দেখি ঊনবিংশ শতকের একটি যুবকের মধ্যে, তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত। হনুমানকে দেখিবার জন্য তিনি বাল্যে সারারাত্রি জাগিয়া কলাবাগানে ঘুরিয়া মরিয়াছেন। যৌবনে তীব্র জ্ঞানপিপাসা তাঁহাকে উন্মাদ করিয়াছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য-দর্শনের সমুদ্র মন্থন করিয়াও তিনি ব্রহ্মের 'ব' পর্যন্ত খুঁজিয়া পাইলেন না। তারপর একদিন শীতের গভীর রাত্রে গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গঙ্গার উপর ভাসমান নৌকাবক্ষে ধ্যানমগ্ন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে চমকিত করিলেন। মহর্ষি তরুণ যুবকের চক্ষে জ্ঞান-পিপাসার চরম তীব্রতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইবার উপদেশ দিলেন। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানানুশীলনের মূর্ত প্রতিবাদ, অথচ তাঁহার মত জ্ঞানী বিজ্ঞানী কে? মহামতি ক্যাণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া পাশ্চাত্ত্য-দর্শনে একটা কথা বড় হইয়া উঠিয়াছিল, কোন কিছুকে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করিও না। যুক্তিতর্ক জ্ঞানের দ্বারা বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিও। এমন কি, ভগবানকেও সরল বিশ্বাসে মানিয়া লইও না। যদি সারাজীবনে তাঁহাকে জানিতে না পার, তাহা হইলে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের মতো বলিও,—"I believe in God if there be God for the salvation of my soul

if there be soul. "যদি আত্মা থাকে, তবে তাহার মুক্তির জন্ম যদি ভগবান্ থাকেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করি।" সন্দেহ কতখানি তীব্র হইলে মনীষী মানব মৃত্যুমুহূর্তে এই ধরনের উক্তি করিতে পারেন। বাঙালী যখন গীতা-ভাগবত ছাড়িয়া মিল্-বেন্থাম পড়িতেছে, সেই সময়ে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ একটি ক্ষ্যাপাটে ব্রাহ্মণ পূজার নৈবেদ্য লইয়া মাকে নিজহাতে খাওয়াইতেছেন, মাটীর দেবতাকে জীবন্ত জ্ঞান করিয়া তাঁহার সহিত মান-অভিমান করিতেছেন। অসীম নিরাকার বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরকে মানুষের মতো সাকার-রূপে দর্শন করিতেছেন এবং দেখাইতে চাহিতেছেন। এই ব্যক্তিটি উনবিংশ শতকের বাংলার তীব্র প্রতিবাদ নন কি? ইনিই তো normally abnormal. পাশ্চাত্ত্য দর্শনের পরিপূর্ণ জ্ঞান লইয়া পণ্ডিত নরেন্দ্রনাথ যখন তাঁহার সামনে দাঁড়াইলেন, তখন রামকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন 'বিশ্বাস কর', এই অলৌকিক সরল বিশ্বাসই তাঁহার বিশ্ববিজয়-মন্ত্র, সুতরাং তিনি 'abnormally normal'। 'আঁধারে আবৃত ঘন সংশয়' যখন বিশ্বগ্রাস করে, তখন 'তারি মাঝখানে সংশয়াতীত প্রত্যয়' বাস করে, 'তর্কের ঝড় বাক্যের ধূলি' তাহাকে এতটুকুও ম্লান করিতে পারে না। গিরিশচন্দ্র রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে এই সরল দিব্য বিশ্বাসের যে মূর্তি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহাই তিনি বিদূষক-জাতীয় চরিত্রে আরোপ করিয়াছেন। বিদূষকের সরল বিশ্বাস রামকৃষ্ণদেবের বিশ্বাস, ইহাকে যুক্তি দিয়া বিশ্লেষণ করা যাইবে না।

বিদূষকের চরিত্রে হাস্যরসের যোগানও যথেষ্টই আছে। জনার বিদূষক এতটুকুও বোকা বা মূর্খ নয়, তাহার প্রত্যেকটি কথা পরম বুদ্ধিমানের উক্তি, বোকা সে শুধু তাহার সরল বিশ্বাসে। যুক্তিহীন ভগবদ্‌বিশ্বাস আমাদের ব্যাবহারিক বুদ্ধিতে যদি বোকামির পরিচায়ক হয়, তবেই এই বিদূষক বোকা। নহিলে তাহার মতো বুদ্ধিমান্ কে? অগ্নিদেবের আশীর্বাদরূপ অভিশাপের ভয়াবহ পরিণাম সে বুঝিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সে অকৃতজ্ঞ নয়, রাজার কল্যাণকামনা সে করে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই ব্রাহ্মণ মুক্তি চায় না। তবে কি সে দেহাত্মবাদী? সে কি চার্বাকপন্থী? তাহাও নয়। তাহার সরল বিশ্বাস, ভগবান্‌কে একবার ডাকিলেই তিনি দয়া করিয়া আসিবেন। সুতরাং মুক্তি তো তাহার করায়ত্ত, তাই যতদিন পারা যায়, জীবনটাকে ভোগ করিয়া লওয়া যাক্। রাজা নীলধ্বজও যাহাতে সপরিবার কিছুদিন মর্ত্য-ভূমিতে বাস করিয়া ঐহিক সুখ ভোগ করিতে পারেন, বিদূষক তাহাই চায়, কিন্তু জামাতা অগ্নিদেব বর দান করিয়া রাজপরিবারের ভবলীলা সাঙ্গ করিবার

ব্যবস্থা করিতেছেন, ইহা বিদূষক সহ্য করিতে পারে না। ভক্ত রামপ্রসাদ যখন মায়ের প্রতি অভিমান-বশে তাহাকে গালাগালি করেন, তখনও অভিমানের রূঢ় বাক্যগুলির মধ্য দিয়া ভক্তহৃদয়ের অসীম শ্রদ্ধা উৎসারিত হয়, তাই কটূক্তিগুলিও ব্যাজস্তুতির মতো শুনায়, বিদূষকের উক্তিগুলিও তদ্রূপ। বিদূষক যখন বলে 'যে ফেরে তাঁর আশে, দয়াময় হরি তার নাকে আগে ঝামা ঘষে'—তখন মনে হয়, কোন ব্যক্তি নিতান্ত আপনজনের প্রতি অভিমান করিয়া তাহার ভালবাসা আরো বেশী পাইবার জন্য আঘাত করিতেছে। আবার ব্যঙ্গোক্তিতে, শ্লেষ-বাক্য-প্রয়োগে বিদূষক অদ্বিতীয়। অগ্নিদেবকে বিদূষক বলিতেছে—"তোমার সাতগুষ্টি তো স্থান পাক, তোমার দেবলোক উদ্ধার হ'য়ে যাক্। হুতাশন! নির্বাণ হ'য়ে পরম শান্তি লাভ কর,—আমাদের উপর জুলুম কেন?" কয়েকটি দিক্ দিয়া এই উক্তিটির গুরুত্ব বিচার করিতে হইবে। প্রথম কথা ইহা ব্যঙ্গোক্তি। স্বর্গলাভের বাসনা দেবতার নয়, মানবের, দেবতাকে উদ্ধার পাইতে বলা আর না বলা একই কথা। হুতাশন অগ্নির 'জ্বলন'ই ধর্ম বা অস্তিত্ব, তাঁহাকে নির্বাণ লাভ করিতে বলার অর্থ তীব্র ব্যঙ্গ করা। কিন্তু উক্তিটিকে সাধারণ ব্যঙ্গ-হিসাবে গ্রহণ করিলে চলিবে না, ইহার ভিতর একটা গভীর হিউমার প্রচ্ছন্ন আছে। এই উক্তিটির মধ্যে ধূলির ধরণীর সন্তান মানুষ বিদূষকের মর্ত্যপ্রীতির গভীর অভিব্যক্তি হইয়াছে। পৃথিবীর মমতা এমন যে, স্বর্গের লোভে মুক্তির লোভেও মানুষ ইহাকে ত্যাগ করিতে চায় না, যাহারা চায় তাহারা দেবতা, মর্ত্যমানবের সঙ্গে তাহাদের অন্তরের যোগাযোগ নাই। তাই দেবলোক উদ্ধার পায় পাক, মর্ত্যের মানব বিদূষক উদ্ধার পাইতে চায় না। 'নির্বাণ'-শব্দের মধ্যেও তাই শ্লেষ রহিয়াছে মনে হয়। নির্বাণ-অর্থে এখানে শুধু নিবিয়া যাওয়া নয়। বাসনা-বিনির্মুক্ত কৈবল্য-অবস্থার প্রতি শ্লেষ করিয়া বলা হইয়াছে। সাধারণ মানবের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা নির্বাণ নয়, সাধারণ মানুষের উপর জুলুম করিয়া উহা চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে।

আবার নিছক হাল্কা তামাসার ভাষাও এই বিদূষকের আছে। অগ্নিকে সে বলিতেছে, "আমি বামুনের ছেলে, হোম করতে তোমায় আবাহন করতে ঘিয়ের বদলে জল ঢেলে দেবো।"

বিদূষক বোকা নয়, বরং অনেকের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান্। প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক। প্রবীর মায়ের নিকট আসিয়াছে যাহাতে মাতা পাণ্ডবের যজ্ঞাশ্ব ফিরাইয়া দিতে না বলেন। বিদূষক রাজাকে সতর্ক করিতেছে, "এই যে মায়ে-

পোয়ে একত্র' হ'য়েছেন। নিশ্চয় দামোদর আসছেন, সন্দেহ নাই ; অগ্নি-দেবতার বর কি আর বিফল হয় ? মনে করছ রাজা, রাণী-ঠাকরুণ বোঝাবেন ; উনি না ঢাল-খাড়া ধরে রণাঙ্গনা হয়ে দাঁড়ান।" কিন্তু রাণীর সামনে রাজাকে নিষেধ করিলে আরো বেশী অনর্থ হইবে মনে করিয়া বুদ্ধিমান্ বিদূষক ভাবিতেছে, "থাকি চেপে বরং নিস্তার আছে রাজার কোপে।" কিন্তু রাজার কল্যাণকামী বিদূষক যথাসময়ে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। জনা ও প্রবীর চলিয়া গেলে রাজাকে একাকী পাইয়া বিদূষক বলিল, "আর কি মন্ত্রণা ? যদি ভালই চাও, ঘোড়া নিয়ে ফিরিয়ে দাও।"

রাজা নীলধ্বজ দুর্বলচিত্ত। শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যেমন তাঁহার ইচ্ছা নাই, তেমনি রাণীর কথা অমান্য করিবার সাহসও তাঁহার নাই। তাই তিনি দুর্বলের সহজ রাস্তাটি বাছিয়া লইলেন,—'বিপদে কাণ্ডারী শ্রীহরির স্মরণ করি।' 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ,' ভগবান্ দুর্বলের লভ্য নহেন, এই কথাটির ধারে-কাছেও বিদূষক গেল না। কিন্তু সে যাহা বলিল, তাহার মর্মার্থ শেষ পর্যন্ত ঐরূপই দাঁড়ায়। "অমন কাজ কদাচ করবেন না, মহারাজ।······ কৃপাময় হরিকে ডেকে ঐহিকের ভাল কারুর কখনো হয়নি।" বিদূষকের এই উক্তি দিয়া কিন্তু একথা বুঝায় না যে, বিদূষক একান্তভাবে ঐহিকতাবাদী। বিদূষকের জীবনদর্শন হইল এই যে—যতদিন পারা যায় ইহজীবনের আনন্দ ভোগ করিয়া লওয়া যাক। মৃত্যু মাথার চুল ধরিয়া বসিয়া আছে মনে করিয়া ধর্মাচরণের উপদেশ যে মহামানবেরা দিয়াছেন, বিদূষক তাঁহাদের মতো হিসাবী বা সাবধানী ভক্তের দলভুক্ত নয়। পরকাল-সম্বন্ধে তাহার ভীতি বা কৌতূহল কোনদিনই নাই, থাকিলে সে পরকাল-সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতে পারিত না, "কি জানি বাবা, কে কখন বৈকুণ্ঠ থেকে রথ আনছে, চতুর্ভুজ হলে পাশ ফিরে শুতে পারব না।" উক্তিটি বিদূষকের সহজ, সমুজ্জ্বল, কৌতুকহাস্যের উদাহরণ।

রাজপুরীর সর্বনাশ রোধ করিবার সক্রিয় চেষ্টাও এই বিদূষক করিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে গঙ্গারক্ষকদের দিয়া ঘোড়া চুরি করানোর প্রচেষ্টা যতই হাস্যোদ্দীপক হউক না কেন, উহাকে মধুর করিয়াছে প্রতিপালকের জন্য বিদূষকের হিতাকাঙ্ক্ষা। এই দৃশ্যে বিদূষকের শ্লেষাত্মক বাক্যগুলি হাস্যরস ভালই জমাইয়াছে।

চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বিদূষককে আমরা যে মূর্তিতে দেখিতে পাই, তাহাতে আমরা শুধু হাসিতে পারি না, ইহার আচরণে আমাদের একটু

গম্ভীরভাবে ভাবাইয়া তোলে। এই ব্রাহ্মণ সত্যই বিশ্বাস করে যে শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ঐহিক অনর্থের মূল। তাই ইতুভাঁড় হইতে আরম্ভ করিয়া শালগ্রাম-শিলা পর্যন্ত সে পুকুরের জলে নিক্ষেপ করিতেছে। পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে বিদূষক চোখে কাপড় বাঁধিয়া বসিয়া আছে, পাছে শ্রীকৃষ্ণ কখনও তাহার সামনে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার এই বিশ্বাসের পুরস্কার-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকাসহ তাহাকে দেখা দিলেন। সরল বিশ্বাসের জয় হইল।

বিদূষক বা বিদূষক-জাতীয় চরিত্র-সম্বন্ধে একটি বড় প্রশ্ন আমাদের রহিয়া যায়। এই চরিত্রগুলির নাট্যোপযোগিতা কতখানি? জনা-নাটকের ঘটনার ক্রমবিকাশে বিদূষক-চরিত্রের অপরিহার্যতা আমরা অবশ্যই স্বীকার করিব। প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে নাটকের পরিণতির আভাস এই চরিত্রটি বহন করিয়া আনে। নাটকের ঘটনার মোড় ঘুরাইবার জন্য ঘোড়া-চুরির চেষ্টা করিয়া চরিত্রটি কাহিনীবিন্যাসে সত্যকারের সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু ইহার পর এই চরিত্রের নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা আর বিশেষ কিছুই নাই। নাট্যকার নাটকে বিদূষক-চরিত্রের যে পরিণতি দেখাইয়াছেন, তাহার সহিত মূল কাহিনীর ক্রমবিকাশের কোন সম্পর্ক নাই। মহাপুরুষ-চরিত্রের একটি বিশেষ আদর্শ-প্রচারের জন্যই যে তিনি নাটকে এই ধরনের চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং এই জাতীয় চরিত্র যতই আকর্ষণীয় হউক না কেন, নাটকীয় চরিত্র-হিসাবে উহারা যে সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই, অর্থাৎ অনেকখানি অসার্থক হইয়াছে ইহা সত্য।

জনার বিদূষক-চরিত্রের বিশ্লেষণ

পাণ্ডবগৌরব নাটকের 'কঞ্চুকী'ও এই ধরনের সরলবিশ্বাসী, সাদাসিধে চলনের মহাপুরুষ-চরিত্র। এই চরিত্রের উপর রামকৃষ্ণদেবের প্রভাব আরো অনেকখানি স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। একটি উদাহরণ দিয়া বক্তব্যটি সমর্থন করিতেছি—'পাণ্ডবগৌরব', তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ গর্ভাঙ্ক, কঞ্চুকীর সঙ্গে সুভদ্রাদেবী ভবানীমন্দিরে পূজা দিবার জন্য অন্ধকার-পথে চলিয়াছেন। তাঁহার মনে সংশয়, ঘোর অন্ধকারে ঠিক পথে যাইতেছেন তো, কিন্তু কঞ্চুকীর কোন সন্দেহ নাই। সে সরলভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা বিশ্বাস করিয়া চলিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন কোনো লোককে দেখিবামাত্র বলিয়া দিতেন ভগবৎপ্রাপ্তির পথে সে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, কঞ্চুকীও সুভদ্রাদেবীকে সেইরূপ কথাই বলিতেছে। "এইবার তোর হয়েছে, নয় আর একটু হ'লেই হবে; এইবার তুই আলো দেখবি।"

পাণ্ডবগৌরব-এর কঞ্চুকী-চরিত্র

কিন্তু উচ্চাঙ্গের হাস্যরস-পরিবেশনের দিক্ দিয়া কঞ্চুকী-চরিত্রের মধ্যে উল্লেখ করিবার কিছুই নাই।

গিরিশচন্দ্রের রচিত নিম্নস্তরের চরিত্রগুলি মাঝে মাঝে বেশ হাসির যোগান দিয়াছে। অবশ্য নিম্নস্তরের চরিত্র-সৃষ্টিতে দীনবন্ধু মিত্র পদে পদে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, গিরিশচন্দ্রের মধ্যে তাহা খুব বেশি একটা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। নীলদর্পণের রায়ৎ-চরিত্রের মুখে উৎকৃষ্ট হিউমার আমরা দেখিয়াছি। 'বসে আছেন যেন গজেন্দ্রগামিনী' প্রভৃতি ধরনের উক্তি গিরিশচন্দ্রের রচনায় বড় একটা পাওয়া যায় না। দীনবন্ধুর সৃষ্ট 'নিমে দত্ত' বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়, কিন্তু গিরিশ-চন্দ্রের সৃষ্ট অঘোর-চরিত্রও * নিতান্ত কম আকর্ষণীয় নহে। এই চরিত্রটি যেমন হাসির উদ্রেক করে, তেমনি আমাদের সমবেদনার অশ্রুও আকর্ষণ করে। যে বাস্তব জীবনধর্ম 'নিমে দত্ত'-চরিত্রকে জীবন্ত করিয়াছে, সেই জীবনধর্মই অঘোর-চরিত্রকে উজ্জ্বলরূপ দান করিয়াছে। সাহিত্যিক সৃষ্টি-মহিমায় দুইটি চরিত্রই সমুজ্জ্বল, তবে দীনবন্ধু এবং গিরিশচন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য এইটুকু যে দীনবন্ধু সমাজের জটিলতম এবং গভীরতম সমস্যা-সম্বন্ধে সচেতন থাকিলেও তিনি অনেকখানি নির্লিপ্তভাবে কৌতুকের দৃষ্টি লইয়া সমাজকে দেখিয়াছেন। (নীলদর্পণ নাটক-সম্বন্ধে অবশ্য একথা বলিতেছি না)। তাই তাঁহার রচনায় শ্লেষ, বিদ্রূপ, হিউমার প্রভৃতি হাস্যরস-সৃষ্টির উৎকৃষ্ট উপকরণগুলি বেশী স্থান পাইয়াছে। নিমে দত্তের জীবনসমস্যা লইয়া দীনবন্ধু আরও বেশি অভিভূত হইলে হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া ফেলিতেন—প্রহসন ট্র্যাজিডিতে পরিণত হইত। নিমে দত্তের চরিত্রে একবারও যে ট্র্যাজিডির আভাস ফুটিয়া উঠে নাই, তাহা নয়। যে আত্মসচেতনতা নিমে দত্তকে নিজের মাতাল-জীবন-সম্বন্ধে দীর্ঘ স্বগতোক্তি করাইয়াছে, সেই আত্মসচেতনতা তাহাকে নিবিড়ভাবে অভিভূত করিলে ঐ অসমাহিত জীবন-সমস্যা তাহাকে পারিপার্শ্বিক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া, বিচ্ছিন্ন করিয়া বিষণ্ণ একাকিত্ব দান করিত। সেই একাকিত্ব নিষ্ঠুর নিয়তির মতো আত্মপ্রকাশের জন্য পারিপার্শ্বিকের সহিত তীব্র সংঘাত তুলিলেই নিমে দত্ত উৎকৃষ্ট ট্র্যাজিক চরিত্র হইত। দীনবন্ধু নিমে দত্তের চরিত্রের এই অসঙ্গতি এবং অপ্রাপ্তির বেদনাকে তীব্র করিয়া উপস্থাপিত করেন নাই বলিয়া 'সধবার একাদশী'

'অঘোর' ও নিমে দত্তের তুলনা

* 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা' গ্রন্থের ২৪৬-২৪৯ পৃষ্ঠায় 'অঘোর'-চরিত্রের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি বলিয়া পুনরাবৃত্তি করিলাম না।

নাটকখানি প্রহসনই রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু 'হারানিধি'-নাটকের অঘোর-চরিত্র-সম্বন্ধে সে কথা বলিবার উপায় নাই। অঘোর-চরিত্রের হাস্যকর অসঙ্গতির দিক্ নাট্যকার যেমন দেখিয়াছেন, তেমনি সেই অসঙ্গতি, প্রতারণা, অমানুষিকতা প্রভৃতির কারণ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া নাট্যকার অঘোরকে একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্র-হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাই তাহার চরিত্রে হাস্যরস যেমন ফুটিয়াছে, ট্র্যাজিডির বেদনাও তেমনি নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। আবার সেই বিয়োগের বেদনা অনুশোচনা, ক্ষমা, তিতিক্ষা ও নয়নজলে অভিষিক্ত হইয়া মধুর মিলনে পর্যবসিত হইয়াছে। এই সমস্ত জীবনবোধের জন্য গিরিশচন্দ্রের কোনো নাটকই আদ্যন্ত হাস্যরসাপ্লুত হইয়া উঠে নাই, অর্থাৎ উহাদের কোনখানিতেই হাস্য ঐকান্তিক বা সর্বগ্রাসী নহে।

এইবার গিরিশচন্দ্রের রচিত দুই একটি নিম্নস্তরের চরিত্রের সমালোচনা করিয়া তাঁহার এই ধরনের চরিত্রসৃষ্টির ক্ষমতার পরিচয় দিব—

পাণ্ডবগৌরব নাটকখানি দিয়া আলোচনা আরম্ভ করা যাক।

আগেই বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্রের রচিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের চরিত্রে দীনবন্ধুর রচনার মতো উৎকৃষ্ট শ্লেষ, বিদ্রূপ এবং হিউমারের পরিচয় নাই, তবে গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট ঐ চরিত্রগুলি, স্বাভাবিক সঙ্গতি রক্ষা করে। তাই ঐ চরিত্রগুলি জীবন্ত হইয়াছে। পাণ্ডবগৌরব, দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক—

গিরিশচন্দ্র-সৃষ্ট নিম্নস্তরের লোকচরিত্র

ঘেসেড়া ও ঘেসেড়ানীর আলাপ। দণ্ডীরাজ উর্বশীকে রাজপুরীতে আনিয়াছে, উর্বশী দিনে অশ্বিনী হয় ও রাত্রিতে নিজমূর্তি ধারণ করে, এত সব কথা ঘেসেড়া বা ঘেসেড়ানী জানে না, এতখানি বিশ্লেষণ করিবার বুদ্ধি ও কৌতূহল উহাদের নাই। অজ্ঞতার সঙ্গে অলৌকিক বা ভৌতিক ব্যাপারে বিশ্বাস অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত, এই বিশ্বাস পুরুষের চেয়ে নারীর আরো বেশী। ঘেসেড়ানী ধরিয়া লইয়াছে যে উর্বশী 'ঘুড়ীভূত'। ভূতের দৌরাত্ম্য রাত্রিকালে, ঘেসেড়ানী তাই ধরিয়া লইয়াছে, উর্বশী দিনের বেলা ঘুড়ী হইয়া আস্তাবলে থাকে এবং রাতের বেলা ভূত হয়। প্রকৃত ব্যাপার-সম্বন্ধে ঘেসেড়ানীর এই অজ্ঞতা আমাদের হাসির উদ্রেক করে। আরো হাসির কারণ এই যে, নারীটি আবার তাহার মত মানিয়া না লইলে তাহার স্বামীকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতে চায়। পৌরাণিক ভারতবর্ষের স্ত্রীই স্বামীর বশবর্তিনী এবং আজ্ঞানুবর্তিনী, সেই যুগেই যদি সে "পাঁচ পোণ ঘেসেড়া বাজার থেকে নিয়ে" আসিতে পারে, তাহা হইলে অসঙ্গতিজনিত হাস্যরসসৃষ্টি হইবে না

কেন? কিন্তু ইহা শুধু অসঙ্গতিজনিত হাস্যরসই সৃষ্টি করে না, ইহার মধ্যে জীবনের স্পর্শও আছে। ঘেসেড়ানীর ব্যক্তিত্ব বা আত্মমর্যাদা এখানে সমর্থন চাহিতেছে। জগতে জ্ঞানেগুণে কেহই কাহারো চেয়ে খাটো হইতে রাজি নয়, ঘেসেড়ানীই বা হইবে কেন? তাই সে দ্বারকার দূতকে সাম্‌নে পাইয়া নিজের মতামতের সমর্থন চাহিতেছে। সুতরাং গিরিশচন্দ্রের সৃষ্ট এই চরিত্রগুলি বৈশিষ্ট্যবর্জিত নয়।

পাণ্ডবগৌরব নাটকে এই গৌণ চরিত্রগুলি নাটকীয় প্রয়োজনের দিক্ দিয়া অবহেলিত নয়। এই ঘেসেড়া-ঘেসেড়ানীর মাধ্যমেই দ্বারকার দূত দণ্ডী-উর্বশীর সন্ধান পায়, নহিলে সন্ধান পাইবার অন্য কোনো উপায় ছিল না। তাই গিরিশচন্দ্র যে এই চরিত্রগুলি দ্বারা গুরুগম্ভীর নাটকের মধ্যে খানিকটা শুধু লঘুহাস্যের অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই নয়, মূল কাহিনীর সঙ্গে ইহাদিগকে অনিবার্য প্রয়োজনের সূত্রে যুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

হাস্যরসের অবতারণার আর একটা বিশেষ দিক্ থাকে। নাট্যকার অনেক সময়ে ব্যঙ্গ, শ্লেষ, তামাসার মধ্য দিয়া সমাজের দোষত্রুটি সমালোচনা করেন। 'জনা' নাটকের গঙ্গারক্ষকদের মাধ্যমে নাট্যকার এই কাজটি করিয়াছেন। খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

১ম রক্ষক। সেদিন মজা হয়েছিল! যেদিন একজন ছাপকাটা তুলসীর মালা আঁটা গঙ্গায় যাচ্ছিলেন মরতে,—চিরকাল পরচর্চা পরনিন্দা করেছেন—এখন সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করবেন! খাটে চড়ে, গলা টিপে, ব্যাটার দফা সারলুম, তেশূন্যে মলো, গো-ভাগাড়ে আম গাছে ভূত হ'য়ে আছে।

২য় রক্ষক। আমিও কাল খুব মজা করেছি! দিনের বেলা যোগী সেজে থাকতেন, রাত্রিতে সেবাদাসীর কোলে শুতেন; মাতব্বর শিষ্যেরা সব জড় হয়ে ঘাড়ে করে গঙ্গায় দিতে চলেছিলেন; ঝড় তুলে পগারে ফেলে, ঘাড় বেকিয়ে ধরলেম;—এখন মালিনীর বাগানে বেলগাছে বেহ্মদত্তি হয়ে আছেন! [জনা, ২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

চরিত্রগত হিউমারের উদাহরণও গিরিশচন্দ্রের রচনায় মাঝে মাঝে বেশ সুন্দর মিলে। প্রফুল্ল নাটকের কাঙালী এই ধরনের একটি চরিত্র। কাঙালী পীতাম্বরকে অর্থের লোভ দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া যে কোনো প্রকারে রমেশের দলে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। এই অশিক্ষিত লোকটি শিক্ষিতের ভাণ করিয়া যতই সাহিত্যিক ভাষায় বা শুদ্ধভাষায় কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছে,

ততই তাহার অজ্ঞতা ধরা পড়িয়া যাইতেছে এবং সঙ্গে-সঙ্গে সে হাসির পাত্র হইয়া উঠিতেছে। কাঙালী-চরিত্রের এই অসঙ্গতিজনিত দুর্বলতা কোন প্রকার বাহিরের বস্তু নয়, এই অসঙ্গতি তাহার চরিত্রের অঙ্গ। অজ্ঞ অশিক্ষিত মানুষ শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আলাপ করিবার সময়ে নিজের দুর্বলতা ঢাকিবার চেষ্টা করে, তাহারাও যে অশিক্ষিত নয়, শিষ্ট আলাপ তাহারাও যে করিতে জানে, এ কথা তাহারা অনেকখানি জোর করিয়া জাহির করিতে চায়, কিন্তু সেই পাণ্ডিত্য-প্রকাশের সময়ে তাহাদের অজ্ঞতা আরও বেশি করিয়া প্রকাশ পায়। তাহারা হয়তো কোনো ব্যক্তিকে 'প্রাজ্ঞ' বলিতে ঠিক উল্টাটি অর্থাৎ 'অজ্ঞ' বলিয়া বসে, তাই তাহাদের কথাগুলি অসঙ্গতি-জনিত হাসির উপাদান হয়, কিন্তু এই অসঙ্গত আচরণের মূল নিহিত রহিয়াছে চরিত্রের মূলে, আত্মমর্যাদা-প্রতিষ্ঠার প্রণোদনায়। তাই এই ধরনের অসঙ্গতি চরিত্রগত উত্তম হিউমারের উদাহরণ। মৎপ্রণীত "বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা" গ্রন্থে কাঙালী-চরিত্রের এই দিকৃটি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি বলিয়া এখানে পুনরালোচনা করিলাম না।

গিরিশচন্দ্রের রচনায় চরিত্রগত হিউমারের উদাহরণ

গিরিশ-নাট্যসাহিত্যের হাস্যরস আলোচনা-প্রসঙ্গে মোটামুটি বক্তব্য এই যে, গিরিশচন্দ্র বাংলা নাট্যসাহিত্যে হাস্যরস-সৃষ্টিতে মধু-দীনবন্ধু-অমৃতলাল প্রভৃতির মতো যুগস্রষ্টা নহেন, কিন্তু তাঁহার পরিবেশিত হাস্যরস বিশুদ্ধ এবং উজ্জ্বল, উহা কোথাও অকারণ ভাঁড়ামির পর্যায়ে নামে নাই।

গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত আলোচনা করিয়া "বাংলা সাহিত্যে লঘুনাট্যের ধারা'র এই পর্যায় শেষ করিলাম। রবীন্দ্রনাথকে দিয়া বাংলা প্রহসন-কমেডীর নূতন ধারার সৃষ্টি হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করিয়া পৃথক্ গ্রন্থ রচনা করিয়া এই ধারার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সপ্তম অধ্যায়

[ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত]

অমৃতলালের অনুকরণে ও অনুসরণে প্রহসন ও কমেডী রচনা করিয়া আর দুই ব্যক্তি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন হইতেছেন ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্য জন হইতেছেন প্রসিদ্ধ অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। ইঁহাদের রচনায় অবশ্য কোনো অভিনব জীবনদৃষ্টির সন্ধান মিলে না। শিল্পের দিক দিয়া কোনো লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যও ইঁহাদের রচনায় দৃষ্ট হয় না। তবে ইঁহারা উভয়েই রসরাজ অমৃতলালের বিশেষ প্রীতিভাজন ছিলেন। অমৃতলালের আদেশে ভূপেন্দ্রনাথ তাঁহার 'যুগমাহাত্ম্য' নাটক রচনা করেন। তেমনি তাঁহার 'বেজায় রগড়' নাটকটি অমরেন্দ্রনাথের কথায় রচিত। নাটকখানির নামকরণও অমরেন্দ্রনাথই করিয়াছিলেন বলিয়া ভূপেন্দ্রনাথ উৎসর্গ-পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যালোচনা

'পেলারামের স্বদেশিতা' নাটকখানি অল্পদিন অভিনীত হইবার পর সরকারী আদেশে উহার অভিনয় বন্ধ হইয়া যায়। ভূপেন্দ্রনাথের এই নাটকখানি সাহিত্যিক উৎকর্ষের জন্য জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছিল বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই। তৎকালীন স্বদেশী আন্দোলনের ভাব-প্রেরণায় ইহা জন্মলাভ করিয়াছিল বলিয়া নাটকটির এই জনপ্রিয়তা। পেলারাম সেকালের স্বদেশী আন্দোলনে উৎসর্গিত-প্রাণ যুবকদের প্রতিনিধি। সে চাকুরীর মোহে আবদ্ধ নয়। উপরি-ওয়ালার শাসন এবং রক্তচক্ষু উপেক্ষা করিয়া সে দেশের জন্য, জনকল্যাণের জন্য, চাঁদা আদায় করে, ট্রেড-ইউনিয়নের নেতৃত্ব স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লয়। চাকুরী বিসর্জন দিয়া সে দেশের কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ে। যে সমস্ত দেশী ধনী-মানী ব্যক্তি ইংরেজের দেওয়া উপাধির মোহে ইংরেজের তোষামোদ করে, অথচ স্বদেশের হিতার্থে একটি পয়সা চাঁদা দিতে ভয় পায়, পেলারাম তাহাদের কঠোর সমালোচনা করে। তাহার নিজের মাতুলও এই দলের একজন। প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস্-এর ভারতাগমন-উপলক্ষে ধুমধামপূর্ণ আয়োজন করিয়া মাতুল রায়বাহাদুর হইতে চায় বলিয়া পেলারাম কৌশলে তাহাকে প্রবঞ্চিত করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে।

'পেলারামের স্বদেশিতা'

সেই সংগৃহীত অর্থে সে দেশের কাজে স্বদেশী বস্ত্রশিল্পের অয়োজন করে। দেশের টাকা সে দেশে রাখিতে চায় এবং দেশের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের চেষ্টা করে।

নাটকের কাহিনী-বিন্যাসে নাটকীয় উৎকর্ষ বিশেষ কিছুই নাই। চরিত্র-চিত্রণে মুন্সিয়ানাও তেমন কিছু মিলে না। স্বদেশী আন্দোলনের ভাবরসে পুষ্ট হইয়া নাটকখানি গুরুগম্ভীর হইয়া উঠা উচিত ছিল। কিন্তু তরল হাস্য-রসাত্মক পরিস্থিতির প্রাধান্যে নাটকে সেই গাম্ভীর্য কোথাও জমিয়া উঠিতে পারে নাই।

ভুপেনবাবুর 'জোরবরাত' নাটকখানি ঠিক প্রহসন নয়। ইহা অনেকখানি গুরুগম্ভীর নাটক। তবে শেষ পর্যন্ত ইহাকে হাস্যরসাশ্রিত কমেডী বলিয়াই অভিহিত করিতে হয়। কোনো প্রকার স্বাদেশিকতার ভাব দ্বারা এই নাটক-খানি অভিসিঞ্চিত নয়। স্বার্থান্বেষী বন্ধুদের অকৃতজ্ঞতা, উপকৃত আত্মীয়ের কৃতজ্ঞতাবোধ, বিষয়ী ধনীর অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান, তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকার স্বাভাবিক প্রেমের সুসঙ্গত পরিণতি প্রভৃতি এই নাটকের ভাববস্তু। নাটকটি আকৃতিতে ক্ষুদ্র। কাহিনীর মধ্যেও জটিলতা বিশেষ কিছুই নাই। তবে চরিত্র-চিত্রণ ও কাহিনী-বিন্যাসের স্বাভাবিকতা নাটকখানিকে আত্যন্ত আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছে। সংলাপ সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দর। এই সকল দিক্ দিয়া বিচার করিলে 'জোর বরাত' ভুপেন্দ্রনাথের সার্থক রচনা।

'জোরবরাত'

নাটকখানির মধ্যে সমসাময়িক যাত্রাভিনয়কে সংক্ষেপে সুন্দর ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। এই ব্যঙ্গ-রচনায় অমৃতলালের প্রভাব সুস্পষ্ট। শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য একদিকে যেমন সুদর্শনা নারীদিগকে যাত্রার আসরে নামাইবার চেষ্টা করা হইত, অন্যদিকে তেমনি কাহিনীর মধ্যে চমৎকারিত্ব-আনয়নের জন্য যে ঘটনা যে যুগে সম্ভব নয়, তাহাও সেই যুগের কাহিনীতে ঘটাইয়া তোলা হইত। আলিবাবার কাহিনীর মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ-চরিত্র আমদানী করিতে ইহাদের আটকাইত না। আর যাত্রার লেখক?—ডোমপাড়ার নিধু কৈবর্ত।

নাটকে কামিনীসেবক ঘটক এবং ঘটকী এলোকেশী বাগ্দিনীর যুদ্ধটি উপভোগ্য হইয়াছে।

'কৃতান্তের বঙ্গদর্শন' ভুপেন্দ্রনাথের অন্যতম ব্যঙ্গ-নাট্য। নাটকখানির মধ্যে কাহিনীর চমৎকারিত্ব বা চরিত্র-চিত্রণের মধুরিমা বিশেষ কিছুই নাই।

গ্রন্থখানির প্রচারাত্মক রূপই উৎকটভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। তবে বাংলাদেশের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র ইহার মধ্যে জলন্ত রেখায় চিত্রিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। চিত্রগুপ্তকে সঙ্গে লইয়া যমরাজ ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিতে আসিয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, ভারতবর্ষের কেহই সত্য কথায় বিশ্বাস করে না; বিশ্বাসীর প্রতি এ-দেশের লোক অকৃতজ্ঞতা দেখায়। জুয়াচুরি, দাগাবাজি, ঠকামি, ব্যভিচার, অনাচার প্রভৃতিতে ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

'কৃতান্তের বঙ্গদর্শন'

কৃতান্ত বাংলাদেশে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, এ-দেশের লোক উপবাস করিয়া মরিতেছে। কর্মের মধ্যে পরের চাকুরী করিয়া বাঙ্গালী কোনো মতে দিন যাপন করে। ম্যালেরিয়ায় বাংলাদেশ উজাড় হইতে চলিয়াছে। দেশে পাট চাষ করিয়া, জলে পাট পচাইয়া বাঙ্গালী দেশটাকে রোগের বীজে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। বাংলার জলবায়ু বিষাক্ত। তারপর নিজেদের মধ্যে মারামারি করিয়া জাতিটা নিঃশেষ হইতে চলিয়াছে।

অন্যদিকে বিদেশী ইংরাজের শাসন ও শোষণ সমানভাবে চলিতেছে। সমুদ্রের নোনা জলের নুন-টুকু খাইতে গেলে পর্যন্ত ট্যাক্স দিতে হয়। বাংলা দেশের জলবায়ুতে যেন আফিমের নেশা ছড়ানো আছে। এদেশের মানুষ তাই অকর্মণ্য, অলস হয়। দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড়, বন্যা ভূমিকম্প বাংলা দেশে তো লাগিয়াই আছে।

ইংরেজ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ঘোষণা করিয়াছেন, মানুষ আসলে বানর-বংশ-সম্ভূত। আচরণেও বাঙ্গালী বানরের জাতিতে পর্যবসিত হইয়াছে। সুরাপান, বিলাস-ব্যসন, কামচর্চা, জুয়াখেলা প্রভৃতিতে বাঙ্গালী মত্ত হইয়া মৃত্যুর সাধনা করিতেছে। লুণ্ঠন, হত্যা, গোপনে মাদকদ্রব্যের ব্যবসায় প্রভৃতিতে বাঙ্গালী আজ রত হইয়াছে।

বাংলার কৃষকের অবস্থা অবর্ণনীয়। বাঙ্গালী কৃষক একে ম্যালেরিয়ায় জর্জরিত হইয়া প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে, অন্যদিকে দাদনদারের শোষণে কৃষকের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠিত হইতেছে। যাহারা ধনী ও জমিদার, তাহারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশায় সহরে গিয়া বাস করিতেছে। বাংলার কৃষককে দেখিবার কেহই নাই। নায়েব-গোমস্তা মিলিয়া কৃষকের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইতেছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বিহার বিহারীর, আসাম আসামীর এবং গুজরাট গুজরাটীর জন্য। কিন্তু বাংলা দেশ বাঙ্গালীর জন্য নয়। বাংলা দেশের

যথাসর্বস্ব অবাঙালীরা লুটিয়া লইতেছে আর সোনার বাংলার বাঙালীরাই অনাহারে মরিতেছে।

ভূপেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের দুরবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়াছেন সত্য। কিন্তু যে প্রতিভার বলে তথ্যগুলি নাট্যগুণমণ্ডিত হইয়া উঠে, ভূপেন্দ্রনাথের মধ্যে সেই প্রতিভার অভাব ছিল।

'যুগ-মাহাত্ম্য' নাটকখানি সম্পূর্ণভাবে অমৃতলালের প্রভাবপুষ্ট। অমৃতলালের 'তাজ্জব ব্যাপারে'র অনুসরণে নাটকখানি লিখিত হইয়াছে। অমৃতলালের মতো ভূপেন্দ্রনাথও তথাকথিত নারী-প্রগতির এবং শিক্ষিত পুরুষগণের পৌরুষহীনতা এবং মেয়েলিপনার সমালোচনা করিয়াছেন এই নাটকে।

'যুগ-মাহাত্ম্য'

রায়-পরিবারের তিনটি পুত্র,— রোহিনীকুমার, রুক্মিণীকুমার এবং কামিনী-কুমার। ইহাদের নামে যেমন নারী-গন্ধ মাখানো, পোষাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, চাল-চলনেও তেমনি নারী-নারী-ভাব। ইহারা ঘরের বাহিরে যায় না। স্ত্রীদের শাসনাধীনে ঘরের মধ্যেই বাস করে। তাহারা মিহি স্বরে, ধীরে ধীরে কথা বলে যাহাতে সাহিত্য-গবেষণার অসুবিধা না হয় এবং ঘরের শান্তি নষ্ট না হয়। তাহাদের মাথায় বাবরি চুল (যথাসম্ভব নারীদের লম্বা চুলের অনুকরণে), গোঁফ-দাড়ি কামানো, চোখে সোনার চশমা, গলায় সরু সোনার হার, পরণে ভিতরে ট্রাউজার, উপরে পাত্‌লা হাওয়ার কাপড়, গরদের হাত-কাটা পাঞ্জাবী, পাত্‌লা সিল্কের চাদর, হাতে সোনার রিষ্ট-ওয়াচ্ এবং উপর হাতে সোনার তারে বাঁধা রক্ষা-কবচ। বর্ণনা পড়িয়াই বুঝা যায়, পুরুষগুলি কেমন মেয়ে সাজিতে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে।

ওদিকের অবস্থাও অনুরূপ। মা-লক্ষ্মীরা নামে, বেশভূষায়, কার্যে ও বাক্যে একেবারে 'বাবা-মেয়ে' হইয়া উঠিয়াছেন। বড় বৌ-এর নাম দর্পবালা, মেজ বৌ তেজোময়ী এবং ছোট বৌ অজিতসুন্দরী। ইহাদের দর্প, তেজ এবং পুরুষালির জন্য ইহারা সত্য সত্যই অজিত হইয়া উঠিয়াছে। নারী-সুলভ কোমলকণ্ঠ ইহাদের নয়। ইহারা সকলেই পৌরুষভাবে কথা বলে। তাহারা পুরুষের অধীনা নয়। পুরুষগুলিই তাহাদের কথায় চাকরের মতো খাটে। ডাম্বেল ইত্যাদি ব্যায়াম করার জিনিস পুরুষবর্জিত, পুরুষের অস্পৃশ্য। রোহিণীবাবুদের মাসতুতো ভাই, তথাকথিত অশিক্ষিত মন্মথলালই ঐগুলির আদর করে। তবে ঐগুলির নারীমহলে যথেষ্ট সমাদর। দর্পবালার আবার ও-গুলিতেও চলে না। সকাল-বিকাল Parrallel Bar-এ exercise না

করিলে তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। নারীরা মহিলামহল ক্লাবের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিবার জন্য পুরুষদিগকে, অর্থাৎ স্বামিগণকে একটা information-মাত্র দিয়া যায়, অনুমতি-গ্রহণের প্রয়োজন মনে করে না। বরং পতিদেবতাগণের হাওয়া-খাওয়ার গাড়ীখানি সেদিন ক্লাবের কাজে লইয়া যায়। তাহাদের জন্য কুড়িটি টাকা অনুমোদন করিয়া ট্যাক্সি করিয়া ঘণ্টাখানেক ঘুরিয়া আসিবার অনুমতি দেয়। এই 'সংসাধ্ব' স্বামিগণকে অবশ্য ইহারা বিশ্বাস করে না। তাই স্বামিগণ হাওয়া খাইতে বাহির হইলে ইহাদিগকে চোখে চোখে রাখিবার জন্য ইহারা গৌরব দাস্তাকে সঙ্গে দেয়। গৌরব দাস্তা পুরুষের বাবা। সে তামাক খায়। দু-আনার আফিমে তাহার কুলায় না। সামান্য বিড়িতে তাহার নেশা জমে না। তেজোময়ী তাহাকে দৈনিক দুই প্যাকেট সিগারেটের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। গৌরব দাস্তার মতো 'বীরপুরুষ' নারী-সমাজে দুর্লভ। গৌরব ড্রাইভারকে জোরে গাড়ী চালাইতে বলে। ড্রাইভার অস্বীকার করিলে গৌরব তাহার বাপ মা তুলিয়া গালাগালি করে। চালক ইহাতে প্রতিবাদ করিলে সে তাহার দাড়ি ধরিয়া মুখে চড় কষাইয়া দেয়।

স্ত্রীগণ ক্লাবে যাইবার সময় স্বামিগণকে বলিয়া যায় যে তাহাদের ফিরিতে অনেক রাত্রি হইবে; এমন কি রাত্রে তাহারা নাও ফিরিতে পারে। যদি ভয় করে, তাহা হইলে পুরুষ স্বামিগণ যেন ঘরে খিল দিয়া থাকে। কামিনীকুমার জিজ্ঞাসা করে, যদি ভয় করে তাহা হইলে তাহারা কি করিবে? গৌরব দাস্তা উত্তর করে যে সে জাগিয়া থাকিবে, সুতরাং ভয়ের কোনো কারণ নাই।

নারীর পুরুষজন এবং পুরুষের মেয়েলিভাবের চিত্র ভূপেন্দ্রনাথ অতি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।

বাংলার নারী পুরুষ-চরিত্রের অন্য দিক্ প্রকাশ পাইয়াছে নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে। নারী-প্রগতি যে অনেক সময়ে অধোগতি এবং বিকৃত চলনা সৃষ্টি করে, দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তাহা দেখিতে পাই। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল্ হলের সম্মুখে পশ্চিমদেশীয় নারীগণ গান করিতেছে। গানের বক্তব্য হইল এই যে বাংলাদেশের নারীগণের যে স্বাধীনতা আছে, এই পশ্চিমা নারীদের সেই স্বাধীনতা নাই। বাংলার নারী-স্বাধীনতার প্রমাণ মিলিতেছে মোহনমালা মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রে। মোহনমালা একটি লেডি কলেজের প্রিন্সিপাল। সে ব্রাহ্মণ কন্যা হইয়াও বিরাজশশী মিত্র নামক একজন

গ্রাজুয়েটের প্রেমে পড়িয়াছে। বিরাজ মিত্র ব্রাহ্মণ-কন্যার সঙ্গে কায়স্থ পুরুষের এই অশাস্ত্রীয় বিবাহে আপত্তি করিলে সর্বসংস্কার-বিমুক্তা শিক্ষিতা ব্রাহ্মণ-কন্যা অদ্ভুত যুক্তি দেখায়। "আমারও পৈতে নেই, আপনারও পৈতে নেই, তবে মিলন-পথে বাধা পড়বে কেন?" এই সকল শিক্ষিতা স্বেচ্ছা-চারিণীগণ সমাজ-সংস্কার মানে না, পুরুষের বরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বের সন্ধানও করে না। মোহকেই ইহারা একমাত্র মানদণ্ড বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে।

পুরুষ-চরিত্রও তথৈব চ। নটবর পাকড়াশী একজন শিক্ষিত যুবক। মোহনমালার প্রেমে পড়িয়া বহুদিন ঘুরিতেছে; নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকেও পরিত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু মোহনমালা কিছুতেই প্রসন্ন হয় না। সে এই শিক্ষিত ব্রাহ্মণ-সন্তানকে অবজ্ঞা করিয়া কায়স্থের প্রেমে মশগুল হইয়াছে।

নটবর পাকড়াশী অবশ্য ঘরে ঠাঁই না পাইয়া বাহিরে আসিয়াছে। দ্বিতীয় অঙ্কে দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা তাহা জানিতে পারি। নটবর পাকড়াশীর স্ত্রী প্রভঞ্জনময়ী ঘোষাল। প্রভঞ্জনময়ীর পিতা কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তান দেখিয়া নটবর পাকড়াশীর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু কন্যা বড় হইয়া এই কুরূপ স্বামীকে পছন্দ করে না। সে এখন কিছু টাকা দিয়া এই বিবাহ-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চায়।

নরনারীর মিলনের ঘটক যেখানে রূপমোহ এবং কাম, দাম্পত্য জীবনের শান্তি সেখানে সুদূর পরাহত। দুদিনের নেশা ছুটিয়া গেলে নরনারী তখন বিবাহ-বিচ্ছেদ কামনা করে। তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রসন্নময়ী ঘোষালের সভানেতৃত্বে দর্পবালা, তেজোময়ী, অজিত সুন্দরী, মোহনমালা, বিষ্ণুপ্রিয়া এবং অন্যান্য নারীগণ ডাইভোর্স্ বিল পাশ করাইবার জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজা ঠাকুরদা একপার্শ্বে টুলে বসিয়া তাহাদের আলোচনায় যোগদান করিতেছেন। এমন সময়ে নটবর পাকড়াশী এবং অঘা আসিয়া লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে সভাকক্ষে প্রবেশ করিল। দর্পবালার দর্প, তেজোময়ীর তেজ, সমস্তই মুহূর্তে মিলাইয়া গেল। সভা ভাঙ্গিয়া গেল।

সবচেয়ে বিসদৃশ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে নাটকের তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্যে। এইটিই নাটকের শেষ দৃশ্য। দ্বিতলে অজিতকুমারীর শয়নকক্ষে চোর প্রবেশ করিয়া অজিতকুমারীর মুখ বাঁধিয়া তাহার গহনা কাড়িয়া লইতেছে। তারপর চোর যখন ছোরা বাহির করিয়া অজিতকুমারীর উপর অত্যাচারের উদ্যোগ করিতে লাগিল, তখন রোহিণীকুমার প্রভৃতি তিন ভাই অজিতকুমারীকে রক্ষা করিবার চেষ্টা না করিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। এমন সময়ে বেগে

মন্মথলাল ছুটিয়া আসিয়া চোরের হাত হইতে ছোরা কাড়িয়া লইয়া তাহার সঙ্গে ধস্তাধস্তি আরম্ভ করিল। কামিনীকুমার, রোহিণীকুমার প্রভৃতি অভিভূতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল; মন্মথলালকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। এই পুরুষগুলি এমনই কাপুরুষ। সেই সময়ে রাজা ঠাকুরদা, পাকড়াশী এবং আখড়ার অন্যান্য লোকজন আসিয়া চোরকে ধরিল এবং বাঁধিয়া ফেলিল। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর বীরত্ব দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে এবং রোহিণীকুমারদের মতো পুরুষ-নামধেয় অপদার্থদের কাপুরুষতা দেখিয়া বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়াছে। সে স্বামীর হাত ধরিয়া গৃহলক্ষ্মীর মতো ঘরে ফিরিয়া গেল।

নাটকের শেষে রাজা ঠাকুরদার মুখে নাট্যকারের বক্তব্য স্বাভাবিক ভাবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। "পুরুষের শক্তিহীনতা এবং নারীর শক্তিবৃদ্ধি যুগ মাহাত্ম্য ব'লে প্রচার ক'রো না। যুগমাহাত্ম্য সগৌরবে প্রচারিত হোক্—নর-নারীদেহে সামঞ্জস্যভাবে শক্তি সঞ্চারিত হ'য়ে।···আর 'যুগমাহাত্ম্যের' প্রভাবে 'পুরুষ' যেন 'প্রকৃতি' হবার—আর 'প্রকৃতি' যেন 'পুরুষ' হবার চেষ্টা করে প্রহসনের সৃষ্টি না করে।"

লেখক যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রনের মাধ্যমে তাহা সুন্দর করিয়া বলিতে পারিয়াছেন। এই নাটকের সংলাপ সংক্ষিপ্ত, চরিত্র পূর্ণ বিকশিত, ঘটনা পরিমাপিত। মানব-চরিত্রের যে অতিমাত্রিকতা এবং অসঙ্গতি হাস্যরস সৃষ্টি করে, নাট্যকার এই নাটকখানিতে তাহা সুনিপুণ ভাবে প্রয়োগ করিতে পারিয়াছেন। যুগমাহাত্ম্য তাই ভূপেন্দ্রনাথের অন্যতম সার্থক প্রহসন।

'বেজায় রগড়' ভূপেন্দ্রনাথের অন্যতম জনপ্রিয় প্রহসন। গ্রন্থখানিকে তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলা যাইতে পারে। তিনি যদি এই একখানিমাত্র প্রহসন রচনা করিতেন, তাহা হইলেও তিনি বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রহসন-রচয়িতা বলিয়া বিবেচিত হইতেন। 'বেজায় রগড়' কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রচনা নয়। স্বদেশপ্রীতির আদর্শে কিংবা সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যে, মানুষকে শিক্ষা দিবার জন্য, উপদেষ্টার আসনে বসিয়া নাট্যকার এই গ্রন্থ রচনা করেন নাই। মানুষের জীবনের সহনযোগ্য কিছু কিছু অসঙ্গতি, বুদ্ধির মার-প্যাঁচ প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি নির্মল হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছেন। জীবনের গভীর, জটিল সমস্যার অবতরণা করিয়া এই হাসিকে তিনি গম্ভীর বা বিষাদময় করিয়া তোলেন নাই। ছয়টি রঙ্গ বা দৃশ্য এবং শুধু একটি সঙ্গীতের একটি ক্রোড়দৃশ্যে নাটকখানি

'বেজায় রগড়'

সমাপ্ত হইয়াছে। অল্পপরিসরে নাট্যকার একটি ছোটখাটো জগতের অবতারণা করিয়াছেন। প্রথম রঙ্গ গঙ্গার ঘাট, চন্দ্রগ্রহণের দৃশ্য। গ্রহণের স্নানকে অবলম্বন করিয়া বালক-বৃদ্ধ যুবক-যুবতী ভীড় জমাইয়াছে। বিরাট জনতায় বিভিন্ন, বিচিত্র ধরণের বহু লোকের আবির্ভাব হইয়াছে। কিন্তু কেহ কি পুণ্য করিতে আসিয়াছে? প্রকৃত পুণ্যার্থীর সংখ্যা নাই বলিলেই চলে। যে যাহার সুযোগের সন্ধানে ঘুরিতেছে। রমণীগণের সঙ্গীতে প্রকাশিত হইল যে চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে। এইটুকু মাত্র ভূমিকা অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন ধরণের জনতার সমাবেশ। মূর্খ ব্রাহ্মণ, মন্ত্রোচ্চারণ করিতে জানে না; সে আসিয়াছে গ্রহণের সময়ে দান গ্রহণ করিয়া দু'পয়সা রোজগার করিতে। অন্ধ, খঞ্জ, ভিক্ষুক, সকলেরই দর্শন মিলিতেছে। ব্রাহ্মণকুলের কুষ্মাণ্ড আজ নবদ্বীপের ন্যায়চঞ্চুর প্রপৌত্র বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া, পিতৃপুরুষের নাম ভাঙাইয়া দুই পয়সা উপার্জন করিতে চাহিতেছে। আসিয়াছে বৈষ্ণব, আসিয়াছে অমুক বাড়ীর ঝি; গ্রহণ-স্নানের পুণ্যটা আজ সারিয়া লইবে। চাটুয্যে মশাই মুখুয্যে মশাইও আসিয়াছেন। তবে বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায়-নন্দন পুণ্য করিতে আসিয়াছেন মনে করিলে ভুল হইবে। তিনি তাঁহার তৃতীয় পক্ষের তরুণীভার্যাকে সামলাইতে এই শীতের মধ্যে বাহির হইতে বাধ্য হইয়াছেন; কারণ, ধর্মপত্নী বায়না ধরিয়াছেন, গ্রহণের গঙ্গাস্নানের পুণ্য তিনি অর্জন করিবেন। বৃদ্ধ মনে মনে সন্দেহ করিতেছেন, এই গঙ্গাস্নানের অজুহাতে তরুণী কি কোনো তরুণের সঙ্গে অভিসারে বাহির হইয়াছেন? দেখাই যাক্ না কেন? আবির্ভূত হইয়াছেন জনৈক গাঁটকাটা। এই পুণ্যার্জনের সুযোগে তিনিও কিছু অর্জন করিতে পারেন কি না। ছুতোরপাড়ার শ্রীমানের দলও বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। কোনো স্নানার্থিনী তরুণীর ইহুদীর বাচ্চার মতো সুন্দর দেহের সিক্তবসনের অন্তরালবর্তী অর্ধনগ্ন সৌন্দর্য উপভোগ করিয়া নিজেদের চতুর্দশ পুরুষের পিণ্ডদানের সৌভাগ্য অর্জন করিতে পারেন কি না। মাতা ভাগীরথী এবং রাহুগ্রস্ত চন্দ্র নীরব সাক্ষী রূপে ধর্মের নামে এত সব অধর্মলীলা উপভোগ করিতেছেন। বাঙ্গাল ষোড়শীকান্ত চৌধুরী তাহার পত্নী-পুত্র লইয়া এই সুযোগে একবার কলিকাতা দর্শন করিতে আসিয়াছে। আর আসিয়াছে ভাগিনেয় পদ্মলালকে লইয়া রামকমল ঘোষাল। বিশাল জনতার পটভূমিকাকে পশ্চাতে রাখিয়া এইবার প্রহসনের মুখ্য কাহিনীর সূচনা হইবে।

রামকমল ঘোষাল গ্রহণের সুযোগে কিছু উপায়ের ব্যবস্থা করিতে আসিয়াছে। লোকটি গাঁজাখোর। রামকমলের পিতা কন্যার বিবাহ দিবার

সময়ে জামাইকে পাঁচশত টাকার হ্যাণ্ডনোট দিয়াছিলেন। সে দেনা আজিও শোধ হয় নাই। পিতার মৃত্যুর পর পদ্মলাল মায়ের সঙ্গে মামাবাড়ী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু তাহার মাতারও মৃত্যু হইয়াছে। নেশায় মামা রামকমল যখন অভিভূত থাকে, পদ্মলাল তখন মামাকে দিয়া হ্যাণ্ডনোট সই করাইয়া লয়। আজ গঙ্গাতীরে বসিয়া রামকমল পদ্মলালের মুখেই সে-কথা জানিতে পারিল। তাই সে এই আপদ-স্বরূপ ভাগিনেয়ের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্ম উপায় উদ্‌ভাবন করিতেছে। তবে গঙ্গাস্নানের পুণ্যটা অর্জন করা চাই। তাই ভাগিনেয়ের হাতে একটি মুখ-বাঁধা হাঁড়ি দিয়া সে বলিয়া যায়, উহার মধ্যে দুইটি বিষধর কেউটে সাপ আছে। "নরাণাং মাতুলক্রমঃ।" পদ্মলাল দেখিল, সারাপথ ধরিয়া মামা এই হাঁড়িটিকে সযত্নে বহিয়া আনিয়াছে। সুতরাং উহার মধ্যে সাপ থাকিতে পারে না। রামকমল দূরে গেলে সে হাঁড়িটির মুখ খুলিয়া উহার মধ্যস্থিত সন্দেশ নিঃশেষে খাইয়া ফেলিল। আবার হাঁড়িটির মুখ পূর্বের মতো বাঁধিয়া রাখিল। রামকমল গঙ্গা-স্নান করিয়া আসিয়া ভাগিনেয়কে স্নান করিতে যাইতে বলিল। উদ্দেশ্য, পদ্মলাল স্নান করিতে গেলে সে একাই সন্দেশগুলি সাবাড় করিবে। কিন্তু উহা যে ভাগিনেয় মহাশয় শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন, মাতুল তাহা বুঝিতে পারেন নাই। পুণ্যার্থী ভাগিনেয়ের গঙ্গাস্নানে রুচি হইল না। সে মামার গামছা-ভিজানো গঙ্গাজল একটু মাথায় দিয়া পুণ্যার্জন করিতে চাহিল। মামা বিপদে পড়িল। কী করা যায়! এবার কিছু দান করিয়া গ্রহণ-স্নানের পুণ্য অর্জন করা যাক্। রামকমল পদ্মলালকে বলিল যে সে তাহাকে একটা আধুলি দান করিবে এবং পদ্মলালও মামাকে ঐ আধুলিটি দান করিয়া পুণ্য-লাভ করিবে। বিনা ব্যয়ে পুণ্যলাভের কী অপূর্ব কৌশল ঘোষাল মহাশয়ের মস্তিষ্ক হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। কিন্তু বুদ্ধিমান ভাগিনেয় আধুলিটি দান-রূপে গ্রহণ করিয়া মাতুলকে উহা আর দান করিল না। ফলে মাতুল ক্রুদ্ধ হইয়া ভাগিনেয়কে 'চোর - জোচ্চোর' বলিয়া গালাগালি করিল। ভাগিনেয় মনের দুঃখে হাঁড়িটি ভাঙিয়া ফেলিয়া সর্পাঘাতে মরিতে উদ্যত হইল। ভাগিনেয় 'সাপ—সাপ' বলিয়া চিৎকার করিতেই লোক-জন জড়ো হইয়া গেল। মাতুল মনের দুঃখে ভাগিনেয়ের মুখ দেখিবেনা বলিয়া প্রস্থান করিল। চতুরে চতুরে চাতুরী জমিয়াছে বেশ। কোথাও এতটুকু আড়ষ্টতা একঘেয়েমি বা কষ্টকল্পনা নাই। ঘটনাগুলি স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সরল গতিতে, মন্দাক্রান্তা তালে ছুটিয়া চলিয়াছে। এ-যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শত শত পরিচিত কাহিনীর এক-একটি। চোরের উপর বাটপাড়ির আনন্দ

উপভোগ করিয়া পাঠক আনন্দে অধীর হইয়া উঠে। পাঠক ভাবিতে থাকে, ইহার পর ইহার চেয়ে কৌতুককর আরো কী আছে!

আছে বৈ কি?

রামকমল বাঙাল যোড়শীকান্তকে ভুলাইয়া তাহার নিকট পদ্মলালকে তিনশত টাকায় বিক্রয় করিয়া গেল। তাহার ধারণা, পদ্মলালকে সে জব্দ করিয়াছে। এই ক্রীতদাসত্ব হইতে ভাগিনেয়টি আর কখনও মুক্তি পাইবে না। পদ্মলাল যোড়শীকান্তের বাড়ীর চাকর ও রাঁধুনী-বামুন। সে যখন মামার কীর্তি জানিতে পারিল, তখন নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিল। সে মাথায় টুপি দিয়া, কাছা খুলিয়া নামাজ পড়িবার ভাণ করিল। যোড়শীকান্ত সপরিবারে এই মুসলমানের হাতের পাক খাইয়াছে। সুতরাং জাতি যাওয়ার ভয়ে সে তিন হাজার টাকা দিয়া পদ্মলালকে বিদায় করিল। আর রামকমল? পদ্মলালকে বিক্রয়-করা টাকা সে হজম করিতে পারে নাই। এক জুয়াচোর পিছনে লাগিয়া তাহার যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে। সহায়-সম্বল-হীন হইয়া পায়ে হাঁটিয়া বাড়ী পৌছাইতে তাহার বিলম্ব হইতেছে। স্ত্রী চিন্তা করিয়া আকুল। ইত্যবসরে অশৌচের বেশ ধারণ করিয়া ভাগিনেয় পদ্মলাল আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিবেদন করিল, মামাকে গঙ্গাস্নানের সময়ে কুমীরে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। পরদিন যথারীতি রামকমল ঘোষালের শ্রাদ্ধের আয়োজন হইল। জীবন্ত মানুষের শ্রাদ্ধ। তামাসা মন্দ নয়! ঘটনার প্রতিটি স্তরে এমনি করিয়া পরিস্থিতিজাত অসঙ্গতি-জনিত হাসির উপাদান নাটকখানিকে গতিমুখর করিয়া রাখে। শ্রাদ্ধটা ভুতের বাপের শ্রাদ্ধই বটে। যেমন জীবন্ত মানুষের শ্রাদ্ধ, তেমনি মন্ত্র পড়াইতেছে মূর্খ ব্রাহ্মণ। তাহার মতে 'অনুস্বারং দিলেং বটেং সংস্কৃতং হয়েং।' পদ্মলাল মাতুল-শ্রাদ্ধের আয়োজন ভালোই করিয়াছে। মন্ত্রপাঠ ভালই চলিতেছে। এমন সময়ে দীনবেশে, একবস্ত্রে রামকমল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার স্ত্রী পর্যন্ত তাহাকে দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। ভট্টাচার্য ভয় পাইয়া 'রাম'-নাম স্মরণ করিতেছে। পাছে সকল রহস্য প্রকাশ পাইয়া যায়, সেইজন্য পদ্মলাল তাহার মামীকে তাড়াতাড়ি গিয়া ঘরে খিল দিতে বলিতেছে। সকলেই ভয় পাইয়া রোজা ডাকিবার কথা বলিতেছে। সবটা মিলিয়া একটা বিরাট হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। যতটুকু হইয়াছে ইহা হইতে আর বেশী কিছু করিলে বাড়াবাড়ি হইত এবং কৌতুক-রস ক্ষুণ্ণ হইত। নাট্যকার তাই

এই পরিস্থিতিকে আর দীর্ঘতর করিলেন না। হর-ঠাকুরদা প্রবেশ করিয়া সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। দেখিয়া শুনিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন যে রামকমল জীবিত আছে। হর-ঠাকুরদা পদ্মলালকে প্রশ্ন করিয়া প্রকৃত ব্যাপারটি জানিতে পারিলেন। যাহা হউক, সমস্ত কিছু মিলিয়া একটা 'বেজায় রগড়' হইয়া গেল।

কাশীরাম দাস-বিরচিত মহাভারতে উল্লিখিত প্রমীলার কাহিনী অবলম্বনে ভূপেন্দ্র নাথ 'নারীরাজ্যে' নামক লঘুনাট্যখানি রচনা করেন। তরল হাস্য বা ব্যঙ্গের প্রাধান্য এই নাটকে নাই। অথচ যুদ্ধ-বিগ্রহ পূর্ণ গুরুগম্ভীর ঘটনাও ইহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে নাই। নাটকটির সুর লঘু। নারী যতই বীরাঙ্গনা হউক না কেন, পুরুষের প্রেমের সংস্পর্শে আসিলেই যে তাহার অন্তর-নিহিত নারীসত্তা জাগ্রত হয়, প্রমীলা ও মুক্তার চরিত্র-মাধ্যমে নাট্যকার তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য-লীলার সঙ্গে সঙ্গে ললিত প্রেমলীলার প্রকাশ হইয়াছে এই নাটকে। মুক্তা শুধু প্রেমিকা নয়, গোপী ভাবে ভাবিতা সাধিকাও বটে।

'নারীরাজ্যে'

'গুরুঠাকুর'কে যেমন হাস্যরসাশ্রিত লঘুনাট্য বলা যায় না, তেমনি ইহা ব্যঙ্গ-রঙ্গ-বহুল প্রহসনও নয়। ইহা ক্ষুদ্র আকারের নাটক। গুরু যেমনই হউক, শিষ্যের ভক্তিতেই গুরুর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই নাটকখানির বক্তব্য। শৈলীর মধ্যে উৎকর্ষ বিশেষ কিছুই নাই। সংলাপ গতানুগতিক এবং কাহিনীও সরল এবং বৈচিত্র্যবিহীন।

'গুরুঠাকুর'

ভূপেন্দ্রনাথের সকল রচনার আলোচনার প্রয়োজন নাই। আলোচ্য নাটকগুলির মধ্য দিয়াই তাঁহার নাট্যপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য বুঝা যাইবে।

* * *

নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত শিল্পের দিক দিয়া সম্পূর্ণভাবে অমৃতলালের অনুগামী। 'হরিরাজ' এবং 'দলিতা ফণিনী' বাদে তাঁহার রচিত সব কয়খানি নাটকই লঘু নাট্য,—প্রহসন অথবা কমেডী। তাহার মধ্যে 'দুটি প্রাণ' বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'ফটিক জল', 'নির্মলা' এবং 'শিবরাত্রি'র অবলম্বন উপকথা। উপকথা-সম্বল নাটকগুলিতে অমরেন্দ্রনাথ অমৃতলালের মতো যাত্রার প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এই নাটকগুলির মধ্যে কাহিনীর ঘনঘটা এবং চরিত্রের জটিলতা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কাহিনী যেমন সহজ-সরল ভাবে চলিয়াছে, চরিত্রগুলিও তেমনি সহজ সারল্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নাট্যালোচনা

মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বা মনুষ্যহৃদয়ের বহুবিচিত্র বৃত্তি-প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘাত এই নাটকগুলির মধ্যে মিলিবে না। তবে শিশুমনের সরল বিশ্বাস এবং ভক্ত-হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রত্যয় লইয়া যদি কেহ আনন্দের আস্বাদ করিতে চায়, তাহা হইলে সে অমরেন্দ্রনাথের নাট্যগুলির মধ্যে তাহা পাইবে। জটিলতা-পরিবর্জিত কাহিনী এবং সহজ-সরল চরিত্রের মধ্যেও যে আনন্দ আছে, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত তাহা দেখাইয়াছেন। অভিজ্ঞ সুদক্ষ অভিনেতা নাট্যকার অমরেন্দ্রনাথ নাটকগুলি কি করিয়া অভিনয়ে জমাইয়া তোলা যায়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। কাহিনীর জটিলতা এবং চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের অভাব দূর করিতে পারে গানে। বাংলা যাত্রায় তাই গানের প্রাধান্য। আদৌ গানই ছিল যাত্রার সর্বস্ব। মনোমোহন বসুই সর্বপ্রথম যাত্রায় গানের সংখ্যা কমাইয়া তাহার সঙ্গে সংলাপের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া গীতাভিনয় রচনা করেন। মনোমোহনের সঙ্গীত প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য অনেকেই অনুসরণ করিয়াছেন। অমৃতলালও মনোমোহনের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন না। হাল্‌কাচালের সংগীতের দ্বারা ব্যক্তি ও সমষ্টির চরিত্রের অভিব্যক্তি এবং পরিস্থিতি ও পরিবেশের পরিচয় কতখানি সুন্দর ভাবে প্রদান করা যায়, অমৃতলাল তাহা সবচেয়ে সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। এখানে তিনি গুরু মনোমোহনকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথও এই বিদ্যাটি শিখিয়াছিলেন অমৃতলালের নিকট হইতে।

সমসাময়িক বাংলা রঙ্গমঞ্চের সমালোচনা করিয়া অমৃতলাল 'তিলতর্পণ' নাটক রচনা করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথও এই বিষয়ে দুইখানি প্রহসন লিখিয়াছেন। একখানির নাম 'থিয়েটার' এবং অন্যখানির নাম 'কাজের খতম'। শৈলীর দিক দিয়া অমরেন্দ্রনাথের এই নাটক দুইখানি অমৃতলালের অনুগামী। কিন্তু বিষয়বস্তুর একটু পার্থক্য আছে। 'থিয়েটার' নাটকের প্রস্তাবনা-সঙ্গীতের মধ্যেই এই নাটকখানির বিষয়বস্তুর মোটামুটি ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে।

'থিয়েটার' খুলনানিবাসী এক ধনীর সন্তান বাঙ্গাল কলিকাতায় আসিয়া থিয়েটার করিতে বলিয়া বাই ধরিয়াছে। এই সুযোগে 'কত নন্দী ভৃঙ্গী বিষম ধিঙ্গী' সখার বেশে আসিয়া তাহার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিবে, এইবার সেই লীলাই সুরু হইল। গুণেন্দ্র নামে নগেনের এক আত্মীয় খুলনা হইতে কলিকাতায় ওকালতী করিতে আসিয়াছে। কিন্তু পসার তাহার কিছুই জমে নাই। তাহার স্ত্রী রসবতীর কথায় জানা যায়, "সকাল বিকেল কতকগুলো 'বাপে খেদান, মায়ে তাড়ান' দালালের দল এসে জোটে বটে, কিন্তু মতলব হচ্ছে—কোন নাবালক ছেলের মাথা

খাবে, কোন্ বিধবার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে, কাকে দু'শো দিয়ে দু'হাজার লিখিয়ে নেবে, কার মাথায় কাঁঠাল ভেঙে, মেয়ে মানুষের বাড়ী গিয়ে ইয়ারকি দেবে—এই তো তোমার কাজ।" উকিল মহাশয় চেষ্টায় আছেন, ধনীর নন্দন গুণেনের পকেট মারিতে পারেন কি না। "খুলনার যোগীন" বাবু না খেয়ে না দেয়ে অনেক পয়সা রেখে গেছে। বাপ মরবার পরই তাঁর দুই ধনুর্ধর ছেলে কল্‌কেতায় এসে বাসা নিয়েছে। ছেলে দুটো ক্ষেপে উঠেছে - থিয়েটার করবে, আর নিজেরা সাজবে। "... গুণেন্দ্র জানে, উহাদের দুই ভাইয়ের উপর তাহার যথেষ্ট প্রভাব আছে। এইবার সেই সর্বেসর্বা হইয়া উঠিবে। সব টাকাকড়ি তাহার হাত দিয়াই খরচ হইবে। সুতরাং কিছু দিনের মধ্যেই সে চক-মেলানো বাড়ী করিতে পারিবে। স্ত্রীর নামে কিছু কোম্পানীর কাগজ এবং তাহার মনের মতো গহনা করিয়া দিবে। নগেন্দ্র স্থির করিয়াছে, সম্পত্তি মর্টগেজ দিয়া টাকা ধার করিয়া সেই টাকায় থিয়েটার করিবে। এই মর্টগেজের সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবে উকিল গুণেন্দ্র।

কয়েকজন ঠক্-জোচ্চোর নগেন্দ্রের ঘাড়ে ইতোমধ্যেই চাপিয়া বসিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে একজনের নাম নটবর এবং অন্তজনের নাম খাঁটিচাঁদ। নটবর থিয়েটারের ম্যানেজার ও নাট্যকার। আর খাঁটিচাঁদ পাকড়াশী হইতেছে 'মরুদ্ব্যোম' কাগজের সম্পাদক। চোর-জোচ্চোর বড় গলায় আত্মপ্রশংসা করিয়া মানুষকে মুগ্ধ করিতে চায়। তাহাদের লম্বা-চওড়া কথায় বিশ্বাস করিয়া লোকে যাহাতে তাহাদের ফাঁদে পড়ে, ইহাই থাকে তাহাদের অভিপ্রায়। নটবর নগেনের নিকট খাঁটিচাঁদের পরিচয় দিয়া বলিতেছে, "এর নাম খাঁটিচাঁদ পাকড়াশী। 'মরুদ্ব্যোম' কাগজের এডিটার, সহরে ভারী নাম-ডাক, এঁর কলমের জোরে লর্ড্ কর্জন পর্যন্ত থরহরি কম্পমান। ইনি মনে করলে রায় বাহাদুর ক'রে দিতে পারেন, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ক'রে দিতে পারেন, কাউন্সিলের মেম্বর ক'রে দিতে পারেন, আমাদের ছোট লাট উডবরণ সাহেব এঁর পার্শনাল ফ্রেণ্ড!"

নগেনের ভাই বরেন। -এই চালাকিটুকু ধরিয়া ফেলিবার মতো বুদ্ধি তাহার আছে। তাই সে প্রশ্ন করে, মরুদ্ব্যোমের মতো বাংলা কাগজ লর্ড কার্জন কি করিয়া পড়েন? জোচ্চোরের যুক্তির অভাব হয় না। খাঁটিচাঁদ বলে, "গভর্ণমেণ্টের মাইনে করা গণ্ডা গণ্ডা ট্রান্‌স্লেটার আছে। প্রতি সোমবার আমার আর্টিকেল ট্রান্‌স্লেট ক'রে লেপ্টনেণ্ট্ গবর্ণর আর গবর্ণর জেনারেলকে এক এক কপি পাঠাবার জন্ত দুটো লোক স্পেশাল মাইনে করা আছে।" সুতরাং

খাঁটিচাঁদ বাবু যে-সে লোক নন। এত বড় লোকের সঙ্গে পরিচিত হইয়া নগেন নিশ্চয়ই লাভবান হইবে। নগেন এই জুয়াচোরের কথায় বিশ্বাস করিলেও তাহার ভাই বরেন কিন্তু লোকটিকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। তাই সে ঠাট্টা করিয়া খাঁটিচাঁদকে বলে, 'দোহাই মহাশয়, আমার একটি উপকার করুন। আমার শিংওলা গরুটি হারিয়েছে, কৃপা করে যদি খুঁজে দেন। আপনি যেরূপ ক্ষমতাবান পুরুষ দেখ্‌ছি—আপনার অসাধ্য কিছুই নেই।"

এই থিয়েটারকে কেন্দ্র করিয়া বিরাট পাগলের আসর বসিয়া গিয়াছে। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে এক-একজন এক-এক ধরণের পাগল। মনুষ্যচরিত্রের অসঙ্গতি লইয়া নাট্যকার খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছেন।

নগেন থিয়েটার করিয়া নাম কিনিবে, অর্থ উপার্জন করিবে, নিজে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিবে। ইহা হইতে পৌরুষ আর কি থাকিতে পারে? তাই সে গুণেন, নটবর এবং খাঁটিচাঁদ, কাহারও চালাকি-জুয়াচুরি বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারে না বলিয়াই সে নাটকে হাস্যাস্পদ চরিত্র হইয়া উঠিয়াছে। বরেন খাঁটিচাঁদের ভণ্ডামি বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু বুঝিয়াও সে দাদাকে সাবধান করে না। কারণ, তাহারও এক ধরণের পাগ্‌লামি আছে। সে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিতে চায়। সত্য সত্যই যদি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। সে তাই সুযোগটি হারাইতে চায় না। ওদিকে সবচেয়ে পাগ্‌লামি আরম্ভ করিয়াছে নগেনের স্ত্রী স্বর্ণলতা। স্বামী মেঘনাদ সাজিবে; সুতরাং সে প্রমীলা সাজার উদ্যোগ করিতেছে। গন্ধতৈলে চিকণ চিকুর মার্জিত করিতেছে, পীঠে ধনুর্বাণ বাঁধিতেছে। সে তাল-ঠুকিয়া বীরাঙ্গনা সাজিতেছে। গৃহলক্ষ্মী বঙ্গকন্যার এ-কোন্ চরম উন্মত্ততা! গুণেনের স্ত্রী রসবতী তাহাকে কিছুতেই বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে পারিতেছে না। তাহার, অর্থাৎ গুণেনের অন্তঃপুরে বসিয়া স্বামী ও স্ত্রী, নগেন ও স্বর্ণলতা অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিল। নগেন হনুমানের ভূমিকায় খানিকটা অভিনয় করিতেই স্বর্ণলতা তাহাকে আক্রমণ করিল। ইহাদের ক্ষ্যাপামিতে অন্তঃপুরও রঙ্গমঞ্চ হইয়া উঠিল। গুণেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া এই অবস্থা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "এ কি ব্যাপার! বাড়ীর ভেতর বৌমাষ্টারের দল যাত্রা করছে না কি?"

গুণেন্দ্রের স্ত্রী রসবতী একটি অদ্ভুত চরিত্রের নারী। একদিকে সে ভীষণা ভৈরবী। অন্যদিকে সে বুদ্ধিমতী গৃহস্থবধূ। উগ্র আধুনিকতা তাহার পছন্দ হয় না। প্রয়োজন-বোধ করিলে স্বামীকে সে শতমুখী-প্রহারে জর্জরিত করে

কিন্তু আধুনিকতার নাম করিয়া মেয়েদের বেহায়াপনা সে পছন্দ করে না। তাই সে বলে, "হ্যাঁ নগেন, এ করেছ কি ? বৌটাকে শুদ্ধ ক্ষেপিয়ে তুলেছ, নিজে থিয়েটার করবে, কর, উচ্ছন্ন যাবে, যাও। কুলের কুলবধূ, তার শুদ্ধ মাথা খাবার যোগাড় করেছে !"

নগেনের চরিত্র-সম্বন্ধেও রসবতীর ধারণা স্পষ্ট। লেখকের নিজের ধারণাই যেন রসবতীর উক্তিতে অভিব্যক্ত হয়। "বাঙ্গাল এক অদ্ভুত জানোয়ার বটে, কলকাতার সহরে এসে সর্বস্ব বন্ধক দিয়ে—মান-সম্ভ্রম ডুবিয়ে, থিয়েটার করা হচ্ছে ! এমন শালার মড়া পেয়েছে, দলকে দল শকুনি এসে ঠোক্‌রাচ্ছে।"

রসবতী অনেক সহ্য করিয়াছে। কিন্তু এইবার তাহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিল। বরেন আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, গুপেন্দ্র পটলসুন্দরী নাম্নী এক বারবণিতাকে রক্ষিতা রাখিয়াছে ; ঐ রক্ষিতাটি আগে বরেণেরই ছিল। দারিদ্র্যের মধ্যে সংসার চালাইয়াও রসবতী বিরক্ত হয় নাই। সে স্বামীকে দুই একটা রূঢ় কথা শুনাইয়াছে ; বড়জোর দুই-একখানি গহনার বায়না ধরিয়াছে। এবার সে হাড়ে হাড়ে জলিয়া উঠিল। নাম্নী-বেশী বরেনের সঙ্গে সে পাল্‌কি চড়িয়া পটলসুন্দরীর গৃহে উপনীত হইল। স্বামীকে ঝাঁটা-পেটা করিয়া টানিয়া আনিল এবং তাহার রক্ষিতাকেও দুই-ঘা বসাইয়া দিল। রসবতী চরিত্রটি নাটকখানিকে রসপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, সন্দেহ নাই।

অমরেন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন, নাট্যপ্রতিষ্ঠান এবং রঙ্গমঞ্চকে একশ্রেণীর ভবঘুরে, দুশ্চরিত্র, ঠকবাজ ব্যক্তি কেমন কলুষিত করিয়া তুলিয়াছে। কতকগুলি অকর্মণ্য ধনীর দুলাল পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক সম্পত্তি হাতে পাইয়া হুজুগের বশে থিয়েটার খুলিতেছে অথবা সখের অভিনয়ের আয়োজন করিতেছে। কতকগুলি গেঁয়ো লোক শহরে আসিয়া হঠাৎ বাবু হইয়া বসিতেছে। তাহারাও চায় থিয়েটার খোলার বাতিকে যোগ দিতে। নেশায় মাতিয়া তাহারা পৈতৃক ভিটা বন্ধক দিতেও ইতস্ততঃ করে না। থিয়েটার খুলিয়া বিরাট অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভের আশায় তাহারা ঋণের পর ঋণ করিয়া থিয়েটারের খরচ চালাইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত দেনার দায়ে জেলে যায়। এই উদ্ভট নেশার জন্ত তাহারা একেবারে সর্বস্বান্ত হয়।

এই সমস্ত হুজুগপ্রিয় লোকগুলিকে ঘিরিয়া যাহারা মধু লুটিতে আসে, তাহাদের চারিত্রিক দৃঢ়তা বলিয়া কিছুই নাই। নাট্যকার নটবর এবং এডিটর খাঁটিচাঁদ উভয়েই মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত নরাধম। ইহাদের দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না।

সখের অভিনয় করিতে গিয়াও এই দুশ্চরিত্র, মাতালের দল ঐকান্তিকতা রাখিয়া কাজ করিতে পারে না।

শেষ দৃশ্যে অভিনয়ে ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। কেহই নিজের অংশ মুখস্থ করে নাই। যেটুকু মুখস্থ করিয়াছে, তাহারও প্রাসঙ্গিক প্রয়োগ করিতে পারে না। একটা ভূতের বাপের শ্রাদ্ধের মধ্য দিয়া অভিনয় শেষ হইল।

অমরেন্দ্রনাথের সংলাপের ভাষা সহজ ও সরল। অকারণ আলঙ্কারিকতা এ ভাষায় নাই। সাধারণ মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, নাট্যকার সংলাপে ঠিক সেই ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। নগেন্দ্রের স্ত্রী স্বর্ণলতার পূর্ববঙ্গীয় ভাষা হাস্যরস-সৃষ্টিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। বেশ্যালয়ের চিত্রও জীবন্ত।

থিয়েটারের অন্যদিক সম্বন্ধে অমরেন্দ্রনাথ আলোকপাত করিয়াছেন 'কাজের খতম' নাটকে। বাংলাদেশে ছাতুবাবু প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্র সন্তানগণ সখের থিয়েটার খুলিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ রঙ্গমঞ্চ যখন স্থাপিত হয়, তখন অভিনয় করার দিকে শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের দৃষ্টি বিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। সাধারণতঃ পাড়ায় বকাটে ছেলের দল থিয়েটারে মাতিয়া উঠিত। ভদ্রঘরের ছেলেরা অভিনয় করিতে আসিলেও তখন ভদ্রঘরের কোনো কন্যা অভিনেত্রীর কাজ করিত না। যাঁহারা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ কেহ পুরুষদিগের দ্বারা নারী-ভূমিকা অভিনয় করাইতেন। কিন্তু তাঁহাদের পসার জমে নাই। রঙ্গমঞ্চের পরিচালকগণ তাই বাধ্য হইয়া বারনারীদের দ্বারা স্ত্রীভূমিকা অভিনয় করাইতে মন দিলেন। কিন্তু ইহার ফলে সমাজের তথাকথিত নীতিবাগীশগণ থিয়েটারের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের এই ভুয়া নীতিবাগীশতার নিন্দা করিয়াছেন তাহার 'কাজের খতম' নাটকে।

'কাজের খতম'

'কাজের খতম' সাতটি দৃশ্যে লিখিত একখানি একাঙ্ক নাটক। আঙ্গিকের দিক দিয়া ইহাকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর একখানি প্রহসন বলা যায় না। প্রহসনের মধ্যে শ্লেষ-বিদ্রূপের আধিক্য থাকে। এই নাটকখানির মধ্যেও শ্লেষ, বিদ্রূপ, সমাজসংস্কারের প্রচেষ্টা বিদ্যমান। কিন্তু তীব্র, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মাধ্যমে তাহা মুখর হইয়া উঠে নাই। হাল্‌কা হাসির পরিবর্তে অনেকখানি গাম্ভীর্য, বিচার-বুদ্ধির জাগরণের প্রয়াস, স্থিরবুদ্ধির প্রয়োগের প্রতি আবেদন বিশেষভাবে মূর্ত হইয়াছে এই নাটকে। কিন্তু পরিণতিতে ইহার প্রহসনাত্মক রূপটিই ফুটিয়া

পরিণতিতে ইহার প্রহসনাত্মক রূপটিই ফুটিয়া উঠে। সমাজের নানাস্তরের মানুষকে একত্র টানিয়া আনিয়া তাহাদের চরিত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ধরাইয়া দিয়া নাট্যকার শুচিশুভ্র হাসির ঝলকে নাটকের উপসংহৃতিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করিয়াছেন, কিন্তু অকারণ ভাঁড়ামি বা অশ্লীলতার সৃষ্টি করেন নাই। এই সংযত শুভ্র শুচিতা অমরেন্দ্রনাথের রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রমাকান্ত গোঁড়া হিন্দু। তিনি ধনশালী ব্যক্তি। সস্ত্রীক ধর্মাচরণের অজুহাতে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিয়াছেন কন্যার বয়সী একটি তরুণীকে। থিয়েটারের অভিনেতা মতিলালের মতে এই দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করা এবং ভদ্রভাবে বেশ্যাসক্তি একই ব্যাপার। অথচ রমাকান্তের ধর্মবোধটুকু অতি জীবন্ত! তিনি নিত্য হরিণামের মালা জপ করেন। থিয়েটারের নাম শুনিতে পারেন না, কারণ, থিয়েটারে বেশ্যাগণ অভিনয় করে। ওখানে গেলে অধর্ম হয়। রমাকান্তের পুত্র যতীন, ওরফে মিষ্টার ভোস, বিলাত-ফেরত কৌমুলী। তিনি নেটিভ্ থিয়েটার দেখেন না, কারণ, নেটিভ্ থিয়েটার বড় ন্যাষ্টী। রমাকান্তের শ্যালক কুলচন্দ্র কাগজের এডিটর। থিয়েটারের প্রতি তাহারও বিরাগ, কারণ, ওখানে গেলে মর‍্যালিটি নষ্ট হয়। বিলাত-ফেরত ডাক্তার গণেশ-গোবিন্দেরও ঐ একই কথা। মোটকথা, একটা নৈতিকতার ধূয়া তুলিয়া সমাজের তথাকথিত গণ্যমান্য, প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি সকলেই থিয়েটারের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে। থিয়েটারের অভিনেতা মতিলাল তাই একবার এক কৌশল করিল। এই তথাকথিত নীতিবাগীশ বাবুদিগকে সে জানাইল যে থিয়েটারের অভিনেত্রীদিগকে সে একদিন বাগানবাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিবে। তাহাদের অভিনয়ে ইঁহারা মুগ্ধ হন কি না দেখা যাইবে।

যথাযোগ্য আয়োজন হইল। মহাশয় ব্যক্তিরা নীতি-ধর্ম, মান-মর্যাদা সমস্ত ভুলিয়া এই অভিনেত্রীদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। অভিনেত্রী বারনারীর আকর্ষণ যাহারা অতিক্রম করিতে পারে না, অভিনয়ের নিন্দা করা তাহাদের সাজে না। অভিনয়কে একটা ললিতকলা-রূপে গ্রহণ করিবার সৎসাহস ইঁহাদের নাই। অভিনয়ের নিন্দা না করিয়া ইঁহাদের নিজ নিজ চারিত্রিক দুর্বলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা উচিত, ইহাই নাট্যকারের বক্তব্য।

'চাবুক' নামক প্রহসনখানির উপর অমৃতলালের প্রভাব সুস্পষ্ট। অমৃত-লালের প্রভাবের মধ্য দিয়াই এই গ্রন্থখানিতে মলিয়ারীয় ভঙ্গী জয়যুক্ত হইয়াছে। সমাজের কিছু কিছু লোকের যোগ্যতা না থাকিলেও 'হঠাৎ নবাব' হইবার

বাসনা থাকে। উকিল মটুকমোহন তাঁহাদের একজন। মটুকমোহন সামান্ত আইনজীবী। নিজের ব্যবসায়ের সামান্তম যোগ্যতাও তাহার নাই। অথচ সে মনে মনে আশা পোষণ করিতেছে যে সে জজ হইবে।

'চাবুক'

প্যালারাম নামক সহরের একজন চালাক লোক তাহাকে জজ করিয়া দিবে বলিয়া নাচাইয়া তুলিতেছে। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের কল্পনায় অসঙ্গতি কম নয়। প্রথম কথা, একজন ব্যবহারজীব নিজের মূল্য-সম্বন্ধে এতটুকু সজাগ না হইয়া পারে কি করিয়া? মটুকমোহন তো মলিয়ারের 'Cit that turned gentleman' নাটকের জুর্ডনের মতো একজন অশিক্ষিত, সাধারণ লোক নয় যে সহুরে আদব-কায়দার নামে তাহাকে যে-কোনো প্রকারে মাতাইয়া তোলা যাইবে। একজন উকিলের বোঝা উচিত যে সরকার যাহাকে-তাহাকে ডাকিয়া জজ করিয়া দেয় না। তাহার জন্ত একটা যোগ্যতার পরীক্ষা প্রয়োজন। যে প্যালারাম জজ করিয়া দিবে বলিয়া মটুকমোহনকে লোভ দেখাইতেছে, তাহার বিত্তাবুদ্ধি এবং যোগ্যতাও বিবেচনা করিয়া দেখিবার উপযুক্ত। অবশ্য কোনো কিছুর অভিভূতিতে যাহারা ক্ষেপিয়া উঠে, তাহাদিগের বিচারবুদ্ধি কিছুই থাকে না। কিন্তু উকিল এত বোকা বা ক্ষ্যাপা হয়, তাহা ভাবিতেও একটু কষ্ট হয়। বুদ্ধি ও যুক্তির কৌশলে যাহারা ব্যবসায় চালায়, তাহারা এত বোকা কি করিয়া হয়? জুর্দনের মতো সামান্ত দর্জির পক্ষে যে নিবুদ্ধিতা এবং সরলতা সম্ভব, মটুকমোহনের মতো উকিলের পক্ষে তাহা সম্ভব নয়। চরিত্রটির কল্পনায় এইখানেই অসঙ্গতি। তারপর ভূতবেশী ভ্যাবাকান্ত ও গবাকান্তকে দেখিয়াই মটুকমোহনের মতো উকিল তাহাদিগকে ভূত বলিয়া ধরিয়া লইল। সবটা মিলিয়া কল্পনার দীনতা এবং অতি সহজে তাক লাগাইয়া দিবার বাসনা প্রকাশ পায়। সুতরাং এই চরিত্র-কল্পনায় নাট্যকার খুব উচ্চাঙ্গের মুন্সীয়ানা দেখাইতে পারেন নাই। তবে অন্তান্ত কয়েকটি চরিত্র-পরিকল্পনায় তিনি মোটামুটি সার্থকতা দেখাইয়াছেন। মটুকমোহনের পুত্র ময়ূরচাঁদের গবেষণা-বিষয়ক ক্ষ্যাপামি যেমন উপভোগ্য হইয়াছে, তেমনি কর্মবিহীন উদ্ভট চিন্তার নায়ক বাঙালীর চরিত্রও এখানে সুন্দর ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। মাতাল ভ্যাবাকান্ত এবং তাহার পুত্র গবাকান্তের চরিত্রও পরিস্থিতি এবং পরিবেশের সঙ্গে বেশ সঙ্গতি রাখিয়া চলে। তাহাদের পাগলামি যেমন হাস্যোদ্দীপক, তেমনি পিতাপুত্রে ভূত সাজিয়া তাহারা যখন মটুকমোহনকে প্রতারণা করে, তখনও অসঙ্গতি-জনিত হাস্যরসের অবতারণা হয়। মোল্লাচাঁদ চাপরাশী যখন মটুকমোহনকে জজীয়তী আদব-কায়দা শিক্ষা দেয়, তখনও দর্শক হাসিয়া আকুল

হয়। তরঙ্গিণী ও মদনমোহিনীর চরিত্রে দীনবন্ধুর বগী-বিন্দীর প্রভাব সুস্পষ্ট। এমনি ধরণের পাগলদের ঔষধই হইতেছে চাবুক। প্রহসনখানির চাবুক নামটি সার্থক।

বড়োর অনুকরণ করা ও বড়ো হওয়ার বাসনা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির অন্যতম। এই দুর্বলতা মানুষের চরিত্রের মর্মমূলে নিহিত। সুতরাং মটুক-মোহনের চরিত্রে উৎকৃষ্ট হিউমারের সম্ভাবনা ছিল। নাট্যকার যদি তাহার চরিত্রে কিছুটা সদ্‌গুণের আরোপ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে দোষে-গুণে চরিত্রটি সার্থক হইয়া উঠিতে পারিত এবং দর্শকের সমবেদনা অর্জন করিত। কিন্তু তিনি তাহা পারেন নাই বলিয়া চরিত্রটি শুধু ব্যঙ্গের উপকরণ-রূপেই নাটকে উপস্থাপিত হইয়াছে। তবে হাস্যরসের গভীরে প্রবেশ করিয়া যে দর্শকগণ মানবচরিত্রের মর্মস্থিত অসঙ্গতির সন্ধান করিতে যায় না, তাহাদের পক্ষে প্রহসনখানি উপভোগ্য হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

'প্রেমের জেপ্‌লিন' গ্রন্থখানিকে নাট্যকার রঙ্গনাট্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। রঙ্গ বা তামাসাই গ্রন্থখানির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভবানী এবং অবনী দুই জ্ঞাতিভ্রাতা। এক মেসে দুইজনেই বাস করে। হরিমিত্রের কন্যা সুভাষিনীকে বিবাহ করিবার ব্যাপারে দুইজনের মধ্যে মনোমালিন্যের একটা প্রচণ্ড অবকাশ সৃষ্টি হইতে পারিত। ঠিক তেমনি প্রচণ্ড উদ্বেগ এবং অন্তরজ্বালা দেখা দিতে পারিত সুভাষিনীর মধ্যে। কিন্তু নাট্যকার পরিস্থিতিকে কোথাও গুরুগম্ভীর হইয়া উঠিতে দেন নাই। দুই বন্ধুর প্রেম-ঘটিত দ্বন্দ্বের মধ্যে এতটুকুও জটিলতা বা গাম্ভীর্য নাই। পরস্পরের সহিত ঝগ্‌ড়া হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে নিতান্ত ছেলেমি ভিন্ন কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। উহা যেন মনোমালিন্যের খেলা মাত্র। উভয়েই উভয়কে লুকাইয়া হরিমিত্রের কন্যার সহিত বিবাহের ব্যাপারে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে চায়। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে তাহা হইয়া উঠে না। ভৈরব চাকর এবং বিন্দি-ঝির সাক্ষাৎ ঘটে ভবানী-অবনীর বাসা-বাটিতে একই সময়ে। বিন্দি-ঝির পুরুষোচিত বীরত্ব প্রচুর হাসির খোরাক জোগায়।

'প্রেমের জেপ্‌লিন'

হরিমিত্র কন্যা সুভাষিণীর বিবাহ দিতে চায় ভবানীর সঙ্গে, কারণ, ভবানী ধনীর সন্তান। সে শ্বশুরকে অনেক বড় বড় মক্কেল জোটাইয়া দিতে পারিবে। হরিমিত্র অমানুষ। ভবানীকে মাতাল জানিয়াও সে তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিতে চায়, কারণ, এই বিবাহের দ্বারা সে প্রচুর পসার লাভ করিবে। কিন্তু তাহার স্ত্রী ও ভাগিনেয়ী সুভাষিণীকে এমনি করিয়া বলি হইতে দিতে

চায় না। অবনী সচ্চরিত্র, ভালো ছেলে; সে বি-এ পড়ে; শিক্ষিত ছেলে। সুভাষিণীও তাহার প্রতি অনুরক্ত। সুতরাং হরিমিত্রের ভাগিনেয়ী প্রমদার প্রচেষ্টায় অবনীর সহিতই সুভাষিণীর বিবাহ হয়। নাটকের কাহিনীটি মোটামুটি এই। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হইল এই যে, অবনী যে সচ্চরিত্র এবং গুণবান্ এমন পরিচয় নাটকের মধ্যে কোথাও পাওয়া যায় না। নারীর রূপমোহে মুগ্ধ যুবক গাছে চড়িয়া একেবারে নায়িকার শয়নকক্ষে উপনীত হয়। ইহা সৌন্দর্য, সুরুচি এবং সচ্চরিত্রতার পরিচয় নয়। নিজের হৃদয়ে যে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছে, সে বিষয়ে সুভাষিণী সজাগ। কিন্তু তাহার প্রেম-প্রকাশক স্বগতোক্তির মধ্যে বিরহের আর্তি ফুটিয়া উঠে নাই। উহা আমাদের মনে বেদনাবোধ না জাগাইয়া বরং হাসির উদ্রেক করে। যেখানে যেখানে চরিত্র ও পরিস্থিতির অভিব্যক্তি গুরু-গম্ভীর হইয়া উঠিতে পারিত, নাট্যকার ইচ্ছা করিয়া সেই সেই স্থানে তরল হাস্যরস সৃষ্টি করিয়াছেন। হরিমিত্র ও তাহার স্ত্রীর বাক্য ও কার্য হাসির উদ্রেক করিলেও রঙ্গনাট্যের উপযোগী করিয়াই নাট্যকার চরিত্র দুইটি অঙ্কন করিতে পারিয়াছেন। পরিস্থিতি ও পরিবেশে উহারা সার্থক হইয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু হরিমিত্রের সহিত তাহার ভাগিনেয়ী প্রমদার আলাপ শোভনতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। ইহা মামা-ভাগিনেয়ীর আলাপ না হইয়া শ্যালী-ভগিনীপতির আলাপ হইলেই শোভা পাইত। নাটকখানি রঙ্গনাট্য; ইহাকে উচ্চস্তরের প্রহসন বা কমেডী বলা যায় না।

'দলিতা ফণিনী' নাটকখানিকে রঙ্গনাট্য বা প্রহসন বলা যায় না। ইহা হাস্যরসাত্মক কমেডীও নয়। ইহার মধ্যে ট্রাজেডীর গাম্ভীর্য, জটিলতা এবং বিষন্নতা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ইহাকে একখানি গুরুগম্ভীর নাটক বলা যাইতে পারে। বিশ্বনাথ রাও-এর বন্ধুপ্রীতি এবং অতিথি-বাৎসল্য এই নাটকের বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়। মোহন-মোহিনী এবং সোরাবজীর চরিত্র ও সংলাপ এই গুরুগম্ভীর নাটকখানির মধ্যে প্রচুর হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছে। বিশ্বনাথ রাও-এর সুন্দরী এবং সাধ্বী স্ত্রী রমাবাঈ-এর প্রতি যুবক নরেন্দ্রনাথের রূপমোহ হইতে নাট্যকাহিনীর উৎপত্তি। বিষে বিষক্ষয়ের মত রমাবাঈ-এর নিরন্তর, নিবিড় সাহচর্যের মধ্য দিয়া নরেন্দ্রনাথের রূপমোহকে দূরীভূত করায় নাট্যকারের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নরেন্দ্র মুগ্ধ হইলেও চারিত্রিক দৃঢ়তা, মনুষ্যত্ব, কর্তব্য এবং কৃতজ্ঞতাবোধ বিসর্জন দেয় নাই। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্বে নরেন্দ্রনাথ

দলিতা ফণিনী

বিজয়ী হইয়া দেবতার আসনে উপবিষ্ট হয়। প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুনারীর সতীত্ব, অপূর্ব বুদ্ধিমত্তা এবং তেজস্বিতার সঙ্গে আধুনিকা নারীর স্বাধীন গতিবিধির সুসংহত মিলন হইয়াছে রমাবাঈ-এর চরিত্রে। নায়ক নরেন্দ্রনাথ এবং তাহার প্রতি একান্তভাবে আসক্তা বিলাসবতীর চরিত্র দুইটিও সু-অঙ্কিত। নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিলাসবতীর আকর্ষণ যেমন আকস্মিক, তেমনি তাহার প্রেম-প্রকাশের ভাষায়ও প্রগল্‌ভতা এবং নির্লজ্জতা অত্যধিক। বিলাসবতী সংস্কারমুক্তা ব্রাহ্মবালিকা হইলেও এতখানি গায়ে পড়িয়া প্রেম নিবেদন করা নারীজাতির প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। দুনিবার প্রেমপ্রকাশের সময়েও নারী কিছুটা লজ্জা, কিছুটা দ্বিধা এবং অনেকখানি সঙ্কোচের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে স্পষ্ট প্রকাশের পথ পরিত্যাগ করিয়া সে আভাস-ইঙ্গিত এবং ছলা-কলার আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই স্পষ্টতা এবং অস্পষ্টতার মাধ্যমে তাহার চরিত্রের অভিব্যক্তি যে রহস্যময়তা লাভ করে, তাহাই নারী-চরিত্রকে মধুরিমামণ্ডিত করিয়া তোলে। আশ্চর্যের বিষয়, এই নারীজনোচিত চারিত্রিক রহস্য পুরুষ নরেন্দ্রনাথের মধ্যেও যতখানি দেখা যায়, নারী বিলাসবতীর মধ্যে তাহাও দৃষ্ট হয় না। নরেন্দ্রনাথ প্রবৃত্তি ও বিবেকের সঙ্গে যতখানি যুদ্ধ করিয়াছে, তাহার এক কণা যুদ্ধও বিলাসবতী করে নাই। সে প্রবৃত্তির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া দিশাহারা হইয়া অদৃষ্টের অনির্দেশ্য ইঙ্গিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই চরিত্রের সংযমহারা গতিবেগ উহার সংলাপকেও প্রবল আবেগে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। এই একখানি মাত্র নাটকে অমরেন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা ও কবি-প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটিয়াছে।

যে প্রেম সংযম, সাধনা, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মত্যাগের দ্বারা বিশোধিত নয়, শুধুমাত্র একটা বাঁধনহারা প্রবৃত্তির ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করিয়া যে প্রেম সমস্ত পরিবেশকে লণ্ডভণ্ড করিয়া তোলে, তাহা কখনও মধুর মিলনে সার্থকতা লাভ করে না। বিলাসবতীর মোহও তাই প্রেমে সার্থক হইয়া উঠে নাই। এই সার্থকতার পথে অন্য দিক দিয়াও বাধা ছিল। নরেন্দ্রনাথ রূপমুগ্ধ যুবক। নিজের অসংযত হৃদয়কে সংযত করাই তাহার জীবনে তখনকার মতো প্রধান উদ্দেশ্য। বিলাসবতীর মোহজালে মুগ্ধ হইলে নরেন্দ্রনাথের এই আত্মনিয়ন্ত্রণের সাধনায় বাধা পড়িত। তাহা হইলে নাটকখানি আদর্শবোধের অভাবে উচ্ছৃঙ্খল-চরিত্রের কদর্যলীলায় ক্লেদাক্ত হইয়া উঠিত। ব্রাহ্মণ বিশ্বনাথ রাও নরনারীর নিবিড় সান্নিধ্যের মধ্যে যে সংযত-সৌন্দর্য দেখাইবার জন্য নিজের স্ত্রীকে দিয়া যে ঘটনাপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাও সার্থকতা লাভ করিত

না। বিলাসবতীর বাধাহত কাম ক্রোধের সঞ্চার করিয়াছে। তাহার যত রোষ গিয়া পড়িয়াছে রমাবাঈ-এর উপর। সে হইয়া উঠিয়াছে প্রতিহিংসাময়ী 'দলিতা ফণিনী'। বিশ্বনাথ রাও-এর সৌজন্যপূর্ণ মধুর ব্যবহারও তাহাকে শান্ত করিতে পারিল না। নাটকখানি তাই শুভ-পরিণামী হইয়াও সম্পূর্ণ মিলনাত্মক হইয়া উঠিতে পারে নাই।

'ফটিক জল' নাটকখানি উপকথা-সম্বল রোমান্টিক কমেডী। পাহাড়ী সর্দারের কন্যা জুমেলীর সঙ্গে রাজপুত্র রাজপুত্র প্রভাতের প্রণয় এই নাটকের অবলম্বিত বিষয়। চাতক যেমন ফটিক জলের আশায় উৎসুকনেত্রে আকাশের দিকে তাকাইয়া ভাবে, কখন আকাশের করুণাধারা তাহার মুখে বারিবিন্দু-রূপে ঝরিয়া পড়িবে, রাজপুত্র প্রভাতও তেমনি জুমেলীর প্রেমের জন্য ব্যাকুল আগ্রহভরে অপেক্ষা করিতেছে। শেষ পর্যন্ত এই নাটক মিলনে সার্থক হইয়াছে। প্রতিনায়ক লাল্লুর চরিত্র নাট্যকাহিনীকে জটিল, 'সংক্ষুব্ধ এবং দ্বন্দ্বীভূত করিয়া তুলিয়াছে। অরণ্যচারী, অসংস্কৃত মানবের হিংস্রতা এবং প্রতিহিংসার বাসনার সঙ্গে দুর্দমনীয় লালসা মিশ্রিত হওয়ার ফলে লাল্লু-চরিত্র অতিমাত্র জীবন্ত এবং বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে। জুমেলী অরণ্যসর্দারের কন্যা, অশিক্ষিতা, তাহার মুখে অরণ্যচারিণী বালিকার স্বভাবসিদ্ধ বাগ্‌ভঙ্গী, কিন্তু মনটি তাহার কী করিয়া যেন অনেকখানি সংস্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাকৃত রমণীর উদ্দামতা তাহার মধ্যে এতটুকুও নাই। তাহার স্বাভাবিক চাঞ্চল্যের মধ্যেও একটা শান্ত, সংযত ভাব আসিয়া জুটিয়া গিয়াছে। প্রভাতকে সে ভালবাসিলেও সহজ ভাবে, মুখে সে তাহা স্বীকার করে না। নাগরিকার মতো খানিকটা চতুরতামাখা আত্মগোপনার আশ্রয় সে করে। তাহার হাব-ভাব-আচার আচরণে মনে হয়, রাজপুত্রবধূ হইবার অযোগ্য সে আদৌ নয়।

'ফটিক জল'

রাজপুত্র প্রভাত এবং রাজকন্যা সন্ধ্যার চরিত্র স্বাভাবিকতায় মণ্ডিত হইয়াছে। অরণ্য-নির্বাসিত রাজকুমার ইনবাসী সর্দারের কন্যার প্রেমে আবদ্ধ। কিন্তু সে ভুলিয়া যায় নাই যে, সে রাজপুত্র মরণের সম্মুখীন হইয়াও সে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছে; প্রেম ও কর্তব্যনিষ্ঠাকে সবার উপরে স্থান দিয়াছে।

রাণী শরৎসুন্দরী সপত্নীর ষড়যন্ত্রে স্বামিকর্তৃক নির্বাসিতা হইয়া পুত্রকন্যাসহ বনবাসে দুঃখিনী-জীবন যাপন করিলেও স্বামীর প্রতি অচলা ভক্তি, নিজের চরিত্রের প্রতি অটুট বিশ্বাস এবং স্বামীর মঙ্গল-কামনা সব সময়েই বজায়

রাখিয়াছেন। ইহাই এই চরিত্রের মাধুর্য। এই চরিত্রটি সমস্ত পরিবেশের দুঃখ-দৈন্য-হিংসা-বর্বরতা প্রভৃতির উপর সৌন্দর্য ও শান্তির আশীর্বাদ বর্ষণ করিয়াছে। শরৎসুন্দরীর অধীর প্রতীক্ষাই শেষপর্যন্ত রাজপরিবারে শান্তির সুধাধারা বর্ষণ করিয়াছে।

রাণী শরৎসুন্দরী এবং রাজকন্যা সন্ধ্যার মনোবেদনা-প্রকাশের ক্ষেত্রে নাট্যকার গৈরিশ ছন্দের সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন।

'নির্মলা'

নির্মলা' অমরেন্দ্রনাথের অন্যতম উপকথা-সম্বল নাটিকা। বিধবার পুত্র জটিলের প্রতি 'মধুসূদন দাদা'র অপার করুণার সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই এই নাটিকাটি রচিত হইয়াছে। কিন্তু নাটকখানি বিশেষত্ব-বর্জিত। আলোচনার তেমন কিছু ইহার মধ্যে নাই।

শিবরাত্রি

'শিবরাত্রি' নটিকায় শিবচতুর্দশীর মাহাত্ম্য-বর্ণিত হইয়াছে। সাধন-ভজনহীন অস্পৃশ্য ব্যাধও শিবচতুর্দশীর রাত্রে নিজের অজ্ঞাতে শিবের মাথায় বিল্বপত্র প্রদান করিলে সর্বপাপমুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই শিবরাত্রি নাটিকাটি লিখিত। এই নাটকে হরপার্বতীর যে চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাংলাদেশের প্রচলিত হরপার্বতী-কাহিনী প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। শিব দরিদ্র, নেশাখোর, ভিখারী ব্রাহ্মণ। নেশার ঘোরে কুচুনীপাড়ায় ভ্রমণবিলাসটুকু তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহার জন্য পার্বতীর দুশ্চিন্তার অন্ত নাই। দরিদ্রের সংসারের ঝগ্‌ড়া এবং অশান্তিটুকু এই নাটিকায় সুন্দরভাবে দেখানো হইয়াছে। যেমন হরপার্বতীর সংসারচিত্র-অঙ্কনে তেমনি সুস্বরব্যাধ ও কাকলির সংসারচিত্র-নির্মাণে ঐ একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। সিদ্ধির লোটা লইয়া হরপার্বতীর দাম্পত্য-কলহটুকু মোটামুটি উপভোগ্য। দরিদ্রের সংসারের ঝগ্‌ড়াঝাটি এবং অশান্তি যে মুখ্যতঃ অন্নসংস্থানের ব্যাপার লইয়া, নাট্যকার তাহা ব্যাধ সুস্বর ও তাহার স্ত্রী কাকলির জীবনে সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অন্যদিকে হরপার্বতীর দাম্পত্য-জীবনের মাহাত্ম্য এবং সুস্বর-কাকলির দাম্পত্য জীবনের মাধুর্যটুকুও তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। যমদূত এবং শিবদূতের কোন্দলটুকুও উপভোগ্য। নাটিকাটির মধ্যে উচ্চাঙ্গের কোন ভাব-কল্পনা বা চরিত্রচিত্রণে কোন অভিনব মাহাত্ম্যপ্রকাশ না পাইলেও গ্রন্থটি মোটামুটি উপভোগ্য হইয়াছে।

'কেয়া মজাদার' রচনাটিকে নাট্যকার প্রমোদরঙ্গনাট্য নাম দিয়াছেন। একান্ত করিয়া উপকথাসম্বল এই নাটকটিতে প্রমোদ এবং রঙ্গ আছে, কিন্তু নাট্যগুণ কিছুই নাই। সংলাপের পরিবর্তে বর্ণনামূলক বিবৃতি-ই ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে বেশী। ফলে, চরিত্রের জটিলতা এবং ঘটনার চমৎকারিত্বের কিছুই সৃষ্টি হয় নাই। ইহা একান্ত করিয়া বালকভুলানো উপকথায় পর্যবসিত হইয়াছে।

'কেয়া মজাদার'

'ছুটিপ্রাণ' নাটকখানি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনী-অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। নাটকখানির মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ আদ্যন্ত একটা হাস্যরসের পরিবেশ রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু কাহিনীর জটিলতা, চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত সৃষ্টি করিতে নাট্যকার সক্ষম হন নাই। গোপাল-উড়ের বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে যতটুকু কাব্যগুণ আছে, এই নাটকটিতে তাহার সন্ধান মিলে না। তবে, নাটকটি অভিনয়ের ক্ষেত্রে মোটামুটি উপযোগী হইয়াছে।

'ছুটি প্রাণ'

পরিশিষ্ট

(১) গ্রন্থ ও গ্রন্থকার-পঞ্জী

[নামের পাশে পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হইল।]

(২) সংক্ষিপ্ত প্রমাণপঞ্জী

বর্তমান গ্রন্থ-প্রণয়নে যে সকল গ্রন্থ ও মাসিক পত্রিকাদির আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মাত্র প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও পত্রিকাবলীর উল্লেখ এখানে করা গেল।

ইংরাজী গ্রন্থ ও পত্রিকাদি :—

The Art of Bernard Shaw—Dr. S. C. Sengupta.

Asiatic Society Journal, 1953.

British Drama—A. Nicoll.

Comedy—Meredith.

Comic Characters of Shakespeare—John Palmer.

The Forntiers of Drama—U. Ellis Fermar.

George Bernard Shaw—G. K. Chesterton.

The History of Sanskrit Literature—De & Dasgupta.

The Jacobean Drama—Una Ellis Fermar.

Keats and Shakespeare—J. M. Murray.

Laughter—Henri Bergson—translated by Breton & Rothwell.

Moliere Comedies (2 vols.)—translated by Baker & Miller.

Our Heritage, Volume III, Part II, Sanskrit College, Calcutta.

Psychology—S. C. Dutta.

Shakespearean Comedy—Charlton.

Shakespearean Comedy—Dr. S. C. Sengupta.

Shakespeare and his predecessors—F. S. Boas.

Shakespeare : A critical study of his Mind and Art —Dowden.

Shakespearean Tragedy—A. C. Bradley.

Shakespearean Tragedy—Charlton.

Sanskrit Drama—A. B. Keith.

The Types of Sanskrit Drama—D. R. Mankar.
Sanskrit Comic Characters—J. T. Parikh.
Viswanatha's Sahitya Darpana—Kumudranjan Roy.
Works of Shakespeare—Everyman's Library Edition 3 volumes.
World Drama—A. Nicoll.

সংস্কৃত গ্রন্থমালা :—

অভিজ্ঞান-শাকুন্তলম্—রঘুভট্ট সম্পাদিত, এন্, পাণ্ডুরঙ্গ, বোম্বাই, ১৯৪৭।
উত্তরামচরিতম্—ভবভূতি প্রণীতম্, নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ।
উত্তরচরিত—Oriental Book Supplying Agency, Poona.
উত্তরচরিত—Belvelkar, Harvard University Press, 1915.
ঋগ্বেদ-সংহিতা, 5 vols. Published by N. S. Sontakke, Poona.
দশরূপকম্ (ধনঞ্জয়বিরচিতম্)—নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ।
ধূর্তসমাগমম্ (জ্যোতিরীশ্বর-প্রণীতম্) নির্ণয় সাগর প্রেস সংস্করণ।
মত্তবিলাসম্ (মহেন্দ্রবিক্রমবর্মা-বিরচিতম্)—Ed. by T. G. Sastri.
মালবিকাগ্নিমিত্রম্—গুরুনাথ বিদ্যানিধি সম্পাদিত।
মৃচ্ছকটিকম্—M. R. Kale.
রত্নাবলী (শ্রীহর্ষপ্রণীতম্)—Kale, Gopal Narayan & Co.,
লটকমলেকম্ প্রহসনম্—শ্রীশঙ্খধরকবি-বিরচিরতম্, নির্ণয়সাগর প্রেস।
শৃঙ্গারহাটঃ (চতুর্ভাণী)—মোতীলাল অগ্রবাল, বোম্বাই, ১৯৫৯।
হাস্যার্ণব—নির্ণয়সাগর প্রেস সংস্করণ।
স্বপ্নবাসবদত্তম্ (ভাসবিরচিতম্)—Ed. by A. Sastri & M. Das Sarma.

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও সমালোচনা-গ্রন্থাদি :—

বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিত কুমার ঘোষ।
বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।
বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা—ডঃ বৈদ্যনাথ শীল।
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ২য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন।
দীনবন্ধু—ডঃ সুশীল কুমার দে।

আলোচিত দুষ্প্রাপ্য বাংলা নাটকাবলী :—

কিছু কিছু বুঝি—ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক—বঙ্গবাসী কার্যালয়।

বুঝলে কি না,—যতীন্দ্রমোহন বসু।

যেমন কর্ম তেমনি ফল—রামনারায়ণ।